শ্রীকান্তে শরৎচন্দ্র

মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়

মৌসুমী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রকাশকাল :
জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৭

প্রকাশক :
দেবকুমার বসু
মৌসুমী প্রকাশনী
১৫/২এ কলেজ রো
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
শ্রীযুগলকিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
৫২এ, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট
কলকাতা-৬

শরৎচন্দ্রের প্রতি যাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি, যিনি তাঁর সাহিত্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি মোটেই সহ্য করতে পারেননা, সেই আমার সহধর্মিনীকে আমার প্রথম লেখা গ্রন্থটি অর্পণ করলাম।

—গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

উপোদ্ঘাত

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঘটনা ও উপন্যাস (শরৎচন্দ্র ও শ্রীকান্ত)

তৃতীয় অধ্যায়

ঘটনা ও চরিত্র

কথারম্ভের কথা

শরৎ-জন্ম-শতবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির সামান্য অর্ঘ হিসাবে এই গ্রন্থ রচিত হল। শরৎচন্দ্রকে ঘিরে গবেষণার অন্ত নেই, তাঁর জীবন ছিল রহস্যে পূর্ণ। তাই তাঁর রহস্যময় জীবনকে অনেকেই সরস ও কৌতূহলোদ্দীপক করে তোলবার প্রয়াস করেছেন। সকলের কথা অভ্রান্ত নয়। শরৎচন্দ্রের জীবিতকালেও তাঁর জীবন সম্পর্কে অনেক মিথ্যা ধারণা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ প্রশ্রয় পেয়েছে, অথচ তিনি নিজে কখনো সেগুলির প্রতিবাদও করেন নি।

বর্তমান গ্রন্থে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে শরৎচন্দ্রকে অবিকৃত রেখে, নির্ভরযোগ্য তথ্য ও জীবনী গ্রন্থের সাহায্যে তাঁর রহস্যাচ্ছন্ন ও চমকপ্রদ জীবনকে বিচার-বিশ্লেষণ করে তবেই 'শ্রীকান্ত'-এর সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাবার চেষ্টা করেছি। কতটুকু সফল হয়েছি তার সঠিক-বেঠিক নির্ণয়ের ভার পাঠকের।

সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে স্রষ্টা কেমন করে প্রবেশ করেন, তাঁর মনোভাব কেমনভাবে ব্যক্ত হয়, তা জানার কৌতূহল সব দেশে সব কালেই থাকে। সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে Somerset Maugham এবং Leslie Stephen-এর উক্তি বিশেষ করে মনে পড়ছে। সমারসেট লিখেছেন, "All the characters that we creat are but copies of ourselves." অপরজন লিখেছেন, "Every writer consciously or unconsciously puts himself into his novels and exhibits his own character even more distinctly than that of his heroes." আমি এখানে কেবলমাত্র শ্রীকান্তকে কেন্দ্র করেই মোটামুটিভাবে শরৎচন্দ্রকে জানাবার এবং বোঝাবার চেষ্টা করেছি। 'শ্রীকান্ত'তে শরৎচন্দ্র কৌশলে নিজেকে কতটা প্রকাশ করেছেন তা দেখাতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের প্রায় সমগ্র জীবনকথাই বলা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত এ-ও একধরণের শরৎ-জীবনী গ্রন্থই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উপন্যাসটিকে আমি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলেছি, এবং এই প্রকারের উপন্যাসেও যে শিল্পীর শিল্পকৃতি অবশ্যই থাকে, তা-ও বলেছি। শরৎ-

জীবনের সঙ্গে শ্রীকান্তের সাদৃশ্য অবশ্যই দেখিয়েছি, কিন্তু শরৎচন্দ্রের শিল্পী-সুলভ চাতুরী এবং ক্ষমতাকে অস্বীকার করে নয়। শ্রীকান্ত তাই স্রষ্টার প্রতিভূ হয়েই দেখা দিয়েছে। নচেৎ শ্রীকান্তকে অবিকল শরৎচন্দ্র হিসাবে দেখলে লেখকের শৈল্পিক রূপটি ধরা পড়বে না এবং একজন মহৎ শিল্পীকে ছোট করাই হবে।

আধুনিককালের সাহিত্যকর্মের প্রধান ও শক্তিশালী শাখা হল উপন্যাস। পাঠকরা সাহিত্যের সব কটি শাখার মধ্যে চূড়ান্তভাবে উপন্যাসেরই ভক্ত। তাই, 'বউ ঠাকুরাণীর হাট'-এ কার কত দর তা জানার জন্য এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে, শরৎচন্দ্র এখনও সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। শরৎচন্দ্রের এই নবতম মূল্যায়ণে আবার এ-ও প্রমাণ পেয়েছে যে তাঁর সকল উপন্যাসগুলির মধ্যে 'শ্রীকান্ত'ই জনপ্রিয়তায় শীর্ষস্থানে পড়ে।

'শ্রীকান্ত' তাঁর বহুবিতর্কিত উপন্যাস, এমন ধরণের বাংলা উপন্যাস তাঁর পূর্বে কেউ অন্ততঃ লেখেননি। এমন কি, আত্ম-জীবনীমূলক উপন্যাস হিসাবেও বাংলা সাহিত্যে 'শ্রীকান্ত' নতুন। 'শ্রীকান্ত' যখন লেখা হয়, লেখক-জীবন তখন পাঠকের কাছে অপরিচিত ছিল। আজ সে জীবন অনেকটাই উদ্ঘাটিত বলে উপন্যাসটি বিচারে সুবিধে হয়েছে। সুতরাং শরৎ-মানসটি যে উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে তাতে আমি নিশ্চিত। তাঁর জীবনের বহু অসংলগ্ন ঘটনাবলী জড়িয়ে শ্রীকান্তের মাধ্যমে ছদ্ম আত্মচরিত হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা দেশে শরৎচন্দ্রই একমাত্র মানুষ, যাঁর সাহিত্য ও জীবন একসাথে একাকার হয়ে মিলে মিশে গেছে। কারণ তাঁর জীবনটাই যে 'আগাগোড়া একটা মস্ত উপন্যাস।'

বর্তমান গ্রন্থটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে, শরৎ-জীবন ও সাহিত্য বিচার এবং উপন্যাসটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, শরৎ-জীবনের যা কিছু গুণাগুণ বা স্বভাব বৈশিষ্ট্য উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে তা দেখানো হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে, উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে বাস্তব থেকে সংগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে এবং দেখানোর চেষ্টা হয়েছে শরৎচন্দ্র কল্পনার আশ্রয়ে তাঁর শক্তির মুন্সিয়ানার কতটুকু পরিচয় রেখেছেন।

এই উপন্যাসের সকল অংশই পাঠকের কত সুপরিচিত তা জানি, তবু প্রয়োজনে অখণ্ড 'শ্রীকান্ত' (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাব্লিশিং কোং প্রাঃ লিঃ) থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি। গ্রন্থটি পরিকল্পনায় আমার বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে সমস্ত গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি 'গ্রন্থঋণ'-এ সেগুলির নাম তো দিয়েছি-ই,

এ-ছাড়াও, বহুক্ষেত্রে 'উৎস-নির্দেশ' হিসাবেও কতকগুলি গ্রন্থের নাম দিয়েছি। তাতে আমার কারও প্রতি ঋণ স্বীকারে নিশ্চয়ই কার্পণ্য করা হয়নি।

গ্রন্থটি পরিকল্পনায় কবি-সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শরৎ-জীবনীকার গোপালচন্দ্র রায়-এর উপদেশ বিশেষভাবে স্মর্তব্য। গোপালচন্দ্র রায় ও দীনবন্ধু ঘোষ মহাশয় আমাকে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। এছাড়া, বন্ধুবর পীযূষ ঘোষের কথাও উল্লেখ্য। এঁদের সাহায্য এই গ্রন্থ রচনায় বহু বিঘ্ন থেকে উদ্ধার করেছে, তাই এঁরা প্রত্যেকেই আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তা সত্ত্বেও অক্ষমতার তিরস্কার ও গুণীজনের পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করে পরবর্তী সংস্করণে ত্রুটি সংশোধনের বাসনা রইল।

ইতি—

নৈহাটী, কাঁঠালপাড়া
২৪ পরগণা

বিনীত নিবেদক
মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

উপোদ্‌ঘাত

পূর্বসূরী, শরৎচন্দ্র ও উত্তরসূরী

'নিজের সুখ-দুঃখের দ্বারাই হ'ক আর অন্যের সুখ-দুঃখের দ্বারাই হ'ক, প্রকৃতির বর্ণনা করেই হ'ক আর মনুষ্য চরিত্র গঠিত করেই হ'ক, মানুষকে প্রকাশ করতে হ'বে। সাহিত্যে আর সমস্ত উপলক্ষ্য।' —রবীন্দ্রনাথ।

শরতের এক পুণ্যদিনে শরৎচন্দ্রের প্রকাশ হয়েছিল। আজ শরৎচন্দ্রের মতই শরতের অমলিন আলোকে নিখিলবঙ্গ সাহিত্যাকাশ উদ্ভাসিত। শারদচন্দ্রের বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব অতি আকস্মিক ব্যাপার। তিনি দিগ্বিজয়ী বীরের মত ভিনি ভিডি ভিসি ('Vini, Vidi, Vici; I came, I saw, I conquered !') বলে সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন; অন্য সকলের মত তিলে তিলে খ্যাতি ও যশের দুর্গম দুরারোহ পথে তাঁকে আমরা অগ্রসর হতে দেখিনি। তাঁর সেই প্রথমদিনের খ্যাতি শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁর আবির্ভাবের আকস্মিকতা ও তাঁর প্রবর্তিত রীতির অভিনবত্ব, উভয়ই চমকপ্রদ। 'Love is best'—এইটাই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে মহিমা দান করেছে। তাঁর মত নারীর বেদনার বন্ধু বাংলা সাহিত্যে সত্যই কম। বিদ্যাসাগরের পর এত আবেগের সঙ্গে বাঙালী নারীর বেদনাময় কাহিনী আর কেই-বা লিখেছেন? জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি বাঙালীর তিনি পরমাত্মীয়।

সমালোচনার কষ্টিপাথরে বিচার করলে শরৎ-সাহিত্যের অনেক ত্রুটি হয়ত বেরিয়ে পড়বে। কারণ, তাঁর বহু উপন্যাসে আখ্যানভাগ গঠনের শিথিলতা, চারিত্রিক অসঙ্গতি, বৃহৎ জীবনাদর্শের অভাব প্রভৃতি ত্রুটি আমরা লক্ষ্য

করে থাকি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর উপন্যাসগুলি বাঙালীর বড় প্রিয় এই জন্য যে, তাতে বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনধারা সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

বর্তমানে শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে সপ্রশংস বক্তব্য আধুনিক বুদ্ধিজীবী মহলে উপহসিত হলেও বিস্মিত হওয়ার কারণ নেই। বর্তমানে অনেকেই প্রাক্তনের প্রতি প্রায়শঃই উন্নাসিক ঔদাসীন্য অবলম্বন করে থাকেন। ত্রুটিযুক্ত মধ্যবিত্ত সমাজ ও করুণ রসের আবেগকে তাঁরা উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য বলে মানেন না। কিন্তু তাঁর যথার্থ মূল্যটুকু উপহাস করবার মত নয়। শরৎ-সাহিত্যে ভাবালুতা আছে এবং তা বুদ্ধিমান পাঠককে সকল সময় আনন্দ দিতে পারে না, ঠিকই। তিনি তাঁর সমগ্র সাহিত্যে এমন কোন জীবন-চিত্র তুলে ধরেননি, যে-জীবন বৃহৎ মহৎ বিশাল। যথার্থ দুঃখ-বেদনার কথা মহৎ বৃহৎ না হলেও পাঠকের অন্তর তা আকর্ষণ করে। আর, মানুষের ছোটখাট সুখ-দুঃখ বেদনাময় জীবনকথাই শরৎ-সাহিত্যের মূল কথা। তাই পণ্ডিতজনের অনেক বিরূপ মন্তব্য সত্ত্বেও হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাংলাভাষী সমাজের ব্যাপক অংশ শরৎ-সাহিত্য একান্ত সমাদর ও আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। কুলবধূর নিভৃত কুলুঙ্গী থেকে মহাবিদ্যালয়ের পড়ুয়ার বইয়ের তাক ও সাহিত্যব্রতীর লেখার টেবিল পর্যন্ত যেমন প্রসারিত হয়েছে তাঁর আসন, তেমনি শিশির ভাদুড়ী মঞ্চে এবং প্রমথেশ বড়ুয়া পর্দায় তুলে ধরেছেন তাঁর কাহিনীগুলি সর্বজনের জন্যে।

তাই শরৎচন্দ্র অসাধারণ জনপ্রিয় সাহিত্যিক। তিনিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম Common man সাহিত্যিক। তাঁর জনপ্রিয়তা রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তাকেও কিছুটা খর্ব করেছিল। কেননা, রবীন্দ্রনাথের অসমসাহসিক নিরীক্ষা এবং সৎসাহসিক সার্থকতা অধিকাংশ বাঙালী পাঠক-মণ্ডলীর আত্মীয় ছিল না। তাঁর জনপ্রিয়তার আর একটি কারণ বোধ করি, সমাজের যারা শিকার, সেই বিধবা, পতিতা বা নিচুতলার মানুষ যে-ই হোক, তাদের প্রতি অতি প্রবল সহানুভূতি। বিধবার সমস্যা বঙ্কিমচন্দ্র এনেছেন, রবীন্দ্রনাথও এনেছেন। বঙ্কিম ভালবাসার জন্য বিধবাকে শাস্তি দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ বিধবার ভালবাসা বিচার করেছেন শিল্পীর নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে, আর শরৎচন্দ্রের প্রবল ও প্রকাশ্য সমর্থন তাদের জীবনকে পাঠকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে।

বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন পেয়েছেন মানুষের কাছে সম্মান, রবীন্দ্রনাথ যেমন পেয়েছেন শ্রদ্ধা, শরৎচন্দ্র তেমন পেয়েছেন ভালবাসা। ভালবাসা দিয়েই তিনি মানুষের ভালবাসা পেয়েছেন। তাইতো 'দরদী'

বিশেষণটি তাঁর ললাটে এঁকে দিয়েছে রাজতিলক আর 'অপরাজেয়' অভিধা দিয়েছে তাঁকে এক দুর্লভ গৌরবের আসন। এই 'দরদী' ও 'অপরাজেয়' শব্দ দুটি তাঁর নামের পূর্বে যাঁরা ব্যবহার করেছেন তাঁরা কিন্তু জগৎসিংহ-চন্দ্রশেখর-নগেন্দ্র-গোবিন্দলাল-তিলোত্তমা-আয়েষা-শৈবলিনী-কুন্দনন্দিনী-ভ্রমর নয়, এমন কি ঠাকুরবাড়ির এক উত্তুঙ্গ মানস-পরিমণ্ডলে লালিত-পালিত গোরা-অমিত-নিখিলেশ-কুমুদিনী-এলাও নয়; এরা গোবিন্দ গাঙ্গুলী-ধর্মদাস-দীনু ভট্টাচার্য-নীলাম্বর-গফুর মিয়ার দল, বিন্দু-বিরাজ-অভয়া-অচলার দল। এমন করে এদের কথা যে পূর্বে কেউ বললেন না। আকারে-প্রকারে যাঁরা বিশাল, তাঁদের দুঃখ বেদনাও তেমনই বিশাল। তাই বোধ করি আমাদের মত ভূমিচারী মানুষ তাঁদের দেখে বিস্মিত হয়, কিন্তু অন্তরঙ্গ আশ্লেষে কাছে টানতে পারে না। এঁদের আমরা সচরাচর পথেঘাটে দেখতেও পাই না। কিন্তু শরৎচন্দ্রের নারী ও পুরুষ চরিত্রগুলি শহরে ও গ্রামে এখনো দুর্লভ দর্শন হয়ে পড়েনি। কিন্তু রমা-রমেশ-বিশ্বেশ্বরী বা সব্যসাচী-বিপ্রদাস আজ গোরা-চন্দ্রশেখর-জগৎসিংহের মত দুর্লভ দর্শন হয়ে পড়েছে। তবে এঁদের সংখ্যা সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে নগণ্য, শতজনের মধ্যে দশজন মাত্র, আর নব্বইজন সাধারণ—কেউ মাতাল, গেঁজেল, চরিত্রভ্রষ্টা—অতি সাধারণ। কেউ সামান্য পুরুষ বা নারী—যাদের কোন মহিমাই নেই। এই নব্বইজনের কাছেই তিনি দরদী। দরদসাগর! শরৎ-কথাতেই আছে, 'আমার অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য-সেবার পুরস্কার দেশের কাছে আমি অনেক দিক দিয়ে অনেক পেলাম,—আমার প্রাপ্যেরও অনেক বেশী।'

অথচ শরৎচন্দ্র যে মাটি থেকে জীবনরস গ্রহণ করেছিলেন তা তখনকার গ্রাম বাংলার নরম মাটি। শরৎ-সাহিত্যের বাঙালী-জীবন প্রধানতঃ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিককার গ্রাম বাংলার সামাজিক জীবন। স্নেহ-ভালবাসা, লোভ, হিংসা-দ্বেষ ও জীবনের ছোট ছোট সুখ-দুঃখের কথাতেই অধিকাংশ কাহিনী রচিত হয়েছে। মাঝে মধ্যে এই গণ্ডি ছাড়িয়েও তাঁর সাহিত্য বিচিত্র পথে পা বাড়িয়েছে বটে কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই বাঙালী জীবনের ঘরোয়া পরিমণ্ডল অতিক্রম করেছে। এই ছোট ছোট সুখ-দুঃখে ভরা কাহিনীই পাঠক এক মুহূর্তে মেনে নিলেন—তাঁরা ভাবলেন এই তো মানুষ, আমাদের মত মানুষ, হাসি-কান্না, সবলতা-দুর্বলতা, সত্য-মিথ্যা, সব নিয়ে আমাদের বন্ধু, 'জায়া পুত্র পরিবার',—তারাই সকলে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থের পাতা থেকে কথা বলে উঠল।

কিন্তু 'মানুষের অধিকার' তিনিও ঘোষণা করলেন, 'ব্যক্তি-সত্তা'র স্বপক্ষে

একদিন তিনিও বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। কারণ তিনি হৃদয় দিয়ে মানুষকে চিনেছিলেন, বুঝেছিলেন তার মানুষ হিসাবে মহিমা, অনুভব করেছিলেন তার মানুষ হিসাবে বেদনা। তিনি নিজের স্বাভাবিক প্রেমের বলে মানবতা-বোধের বিকাশেই মানুষের এই রূপ উপলব্ধি করেছিলেন। বলতে চেয়েছিলেন—এই পতিতা আর চরিত্রহীন সাহিত্যক্ষেত্রে অস্পৃশ্য হবে কেন? এরা সমাজের মানুষ, জীবন-সংগ্রামে আহত, রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মানুষ। সত্য-মিথ্যা, ভুল-ভ্রান্তি, বেদনা-আনন্দে ভরা মানুষ। শরৎচন্দ্রের জীবনের মূলকেন্দ্র ছিল মানুষ, মূল লক্ষ্য ছিল মানুষ, মূল আকর্ষণ ছিল মানুষ—যেমন ছিল চার্লস ডিকেন্স-এর। তাই বাঙালীর অন্তর্লোক থেকে তিনি উত্থিত হলেও মানুষের প্রতি এই অসীম প্রীতির জন্যই সারা ভারতের অন্তর্লোকে তিনি প্রবিষ্ট হতে পেরেছেন, বাঙালী হিসাবে এ আমাদের পরম গৌরব।

নর্তকী বিজলী কি আর বদলাবে না? চন্দ্রমুখী কি পতিতাই থেকে যাবে? পিয়ারী বাইজীর কি রাজলক্ষ্মী হবার অধিকার নেই? সাবিত্রী মেসের ঝি বলে কি তার বুকে ভালবাসা দানা বাঁধতে পারে না? অভয়ার কি আর ঘর-সংসার পাতার অধিকার নেই? —এ সমস্তই এল ঐ শরৎচন্দ্রের মানবপ্রেম থেকে। শরৎচন্দ্র যদি সমাজ-বিদ্রোহী হয়ে থাকেন তবে তা এখানেই।

নরনারীর স্বাভাবিক সম্পর্কের সঙ্গে প্রচলিত সমাজ-নীতির দ্বন্দ্ব এই যুগের চিন্তাধারায় যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, শরৎচন্দ্র তাকে পরিচ্ছন্নভাবে রূপ দিয়েছেন। গতানুগতিক সমাজ-ব্যবস্থা এবং সমাজ-নীতি যে নিপীড়নমূলক এবং অবাস্তব, শরৎচন্দ্র অনেক ক্ষেত্রে তা খুব জোরালো ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তবে শরৎচন্দ্রের মধ্যে সংস্কার প্রবণতা এবং স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের উপর গুরুত্ব যতখানি আকস্মিক এবং অভিনব বলে মনে হয় আসলে তা ততখানি আকস্মিক এবং অভিনব নয়। বঙ্কিমের মধ্যে তার সূত্রপাত লক্ষ্য করা গেছে।

শরৎচন্দ্রের কালের অধিকাংশ সামাজিক সমস্যা তাঁর কোন না কোন উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। বহু বিবাহ, পণপ্রথা, কৌলিন্য প্রথা, স্খলিতা নারীর সমস্যা, ভৈরবী-প্রথা, অস্পৃশ্যতা, কৃষকের সমস্যা, পল্লীগ্রামের সামাজিক অনুশাসন—প্রভৃতি অধিকাংশ অনভিপ্রেত বিষয় তাঁর নজর এড়ায়নি। কিন্তু স্বাধিকার, সমানাধিকার, বাক্-স্বাধীনতা প্রভৃতি একালের গণতান্ত্রিক তত্ত্বগুলি তেমনভাবে তাঁর বিচারের মাপকাঠি নয়। ঐ যে, পূর্বেই বলেছি, 'Love is best'—এইটাই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মহিমা; চরিত্রের ভাল-মন্দ

নির্ধারণের মাপকাঠি হল, সে ভালবাসে কিনা—এতেই শরৎচন্দ্র দরদী কথাশিল্পী।

মনে হয়, শরৎচন্দ্র একখানি মাত্র মহাকাব্য রচনা করেছেন যার বিষয় বা মূলভাব (Theme) হল বাংলা দেশ। বাংলা দেশের খাঁটি এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনীকার হিসাবে তাই তিনি অমর হয়ে আছেন। একটি বাঙালিয়ানা ভাব তাঁর সাহিত্যে ধরা পড়েছে। দেশের নাড়ির সঙ্গে নিবিড় আত্মিক অন্তরঙ্গতা না থাকলে যা সম্ভবপর নয়। কিন্তু আজ সে-রসের উৎস কিঞ্চিৎ পরিমাণে শুকিয়ে গেছে। অর্থাৎ তখনকার সমাজ-জীবনধারা বর্তমানে বহুল পরিমাণে পরিবর্তন লাভ করেছে। গফুরের মত অনেক গ্রামের মানুষ শহরের ইঁট-কাঠ-পাথরের জঙ্গলে প্রবেশ করেছে। চারিদিকে উত্তেজনা, বিক্ষোভ, হাহাকার, উন্মাদনা। এরই মধ্যে হচ্ছে বর্ণভেদ লুপ্ত, হচ্ছে সামাজিক প্রথা ও নীতির আমূল পরিবর্তন। পাশ্চাত্য পদ্ধতির মত বিবাহ-বিচ্ছেদ, একান্নবর্তী প্রথার ভাঙন এখন সতীত্বের সেই পুরানো ধারাকে ভেঙে দিচ্ছে, সামাজিক আদর্শের ধারণাকে বদলে দিচ্ছে। নারী আজ গৃহকোণে আবদ্ধ নেই, পুরুষের মত সমঅধিকারে সোচ্চার; নারী-পুরুষের অবাধ মিলনে তারা সচেতন। সুতরাং শরৎ-সাহিত্যের ভিত্তি যার উপর প্রতিষ্ঠিত তার মূলে পড়েছে নাড়া।

শরৎচন্দ্র সমগ্র জীবনে যে ব্যথা ও বেদনা নিয়ে বিধবা নারীর করুণ চিত্র দরদী চিন্তায় সাহিত্যের দরবারে এনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আজ বিবাহ বিচ্ছেদের এবং নারীর পুনর্বিবাহের যুগে তা মূল্যহীন বলে মনে হতে পারে। একান্নবর্তী পারিবারিক জীবনের স্নেহ-প্রীতি ও কর্তব্যবোধ আজ অনেক দূরের চিত্র বলে মনে হয়। শরৎচন্দ্রের সেই ভাবাবেগের প্রাবল্য আজ অনেকের কাছেই উপহসিত। তবে শরৎচন্দ্রও তা জানতেন, 'সংসারে অনেক কিছুর মতো মানব-মনেরও পরিবর্তন আছে; সুতরাং আজ যা বড়, আর একদিন তাই যদি তুচ্ছ হয়ে যায় তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।'

শরৎচন্দ্র যে চোখের জলের অতখানি মূল্য দিয়েছিলেন, আজ তা উত্তপ্ত চোখ থেকে একেবারে শুকিয়ে গেছে। শরৎ-সাহিত্যের সেই স্নেহ-প্রীতির লীলা আজ ভাবাবেগের প্রাবল্য। বঙ্কিম-রবীন্দ্রের মত কল্পনার উৎসার তাঁর অনায়ত্ত। গল্প-কাহিনীর প্লট গঠনেও চিক্কণতার অভাব, চরিত্রগুলিও নিতান্ত সহজ মানুষ। বালবিধবা বা কুলত্যাগিনীর অশ্রুসজল প্রতিবাদ, পল্লী বাংলার পাঁচালী, ভবঘুরে অথবা স্ত্রীলোকের অঞ্চলস্থ কয়েকটি পুরুষ চরিত্র, এই নিয়েই তিনি সাহিত্যাসর পেতেছিলেন। সুতরাং যে-সাহিত্য সমকাল সর্বকালের

গলায় মালা পরাতে পারেনি তা মোটেই কালজয়ী নয়, ফুটে ঝরে পড়াই তার কাজ। সাহিত্যে এই দুটির একত্রীকরণ ঘটানো অত্যন্ত উঁচুদরের প্রতিভার প্রয়োজন। যে সমাজের, যে সময়ের অনবদ্য ছবি আমরা শরৎ-সাহিত্যে পাই, তার বহু পরিবর্তন—ভাঙচুর হয়েছে। কিন্তু তবু আজও শরৎ-সাহিত্য আমাদের ভাল লাগে কেন? আজও তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি সজীব, ভোরের অনাহত আলোক শিখাটির মত লাগে কেন?

ভালবাসা এবং মানুষের ছোটখাট সুখ-দুঃখ আর বেদনাময় জীবনকথা—এইটুকুই কি সত্য! তাই-ই। ছোটখাট জীবনের বিবর্ণ পাতায় এত অশ্রু-লবণাক্ত আবেগ লুকিয়ে থাকতে পারে তা কি কেউ পূর্বে জান্‌ত? যে আবেগের ভিত্তি তীব্র বেদনা ও কষ্টের উপর প্রতিষ্ঠিত, তা পাঠকের অন্তরে ঘা দেবেই। যথার্থ দুঃখ বেদনার কথা পাঠকের অন্তর আকর্ষণ করবেই। তাঁর বহু চরিত্র সমাজের গণ্ডিকে যেমন স্বীকার করে নিয়েছে তেমনি আবার গণ্ডিকে অতিক্রমও করেছে। এখনও শরৎ-সাহিত্যে যে ডুব দেয় সে যেন হারানো কৈশোরকেই ফিরে পায়, তার সজাগ বুদ্ধির বাঁধনকে খুলে ফেলে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়। পাঠক নিজেকে নতুন করে তাঁর গল্পের মধ্যে আবিষ্কার করে—এইখানেই তিনি শিল্পী। এইখানেই তিনি বাঙালীর কাছে এত প্রিয়। তাই রবি যদি প্রয়োজন, শরৎ তবে প্রিয়জন।

আর একাল (১৯৭৬) সেকাল নিয়েও কিছু প্রশ্ন আজও থেকে যায়। এখনও আমরা বাইরে প্রগতিবাদী আর অন্তরে সেই সনাতন রক্ষণশীলতাকে আঁকড়ে ধরে নেই কী? আজও কালো মেয়ে সমাজের সমস্যা। পণপ্রথা এখনও মৌরসী পাট্টা গেড়ে বসে রয়েছে। আজও জীবন ব্যর্থ হয়ে গেলেও নারী সতীত্বে শিরোমণি হবার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারে না। কষ্ট পেতে আমরা ভালবাসি—বিদ্রোহকে ভয় করি। তাই হয়ত আজও আমাদের পায়ে বেড়ীর দাগ জুতো-মোজাতেও ঢাকা পড়ে না। আর্থিক সংহতি বা চাকুরিজীবী মেয়েরাই কি আজ সমাজে সম্পূর্ণ স্বাধীন, না—বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্রের বশীভূত?

মনে হয়, আমরা শরৎচন্দ্রের হাত থেকে বড় একটি উপহার পেয়েছি—বিদ্যা-বিত্ত-নারী-পুরুষ-ধর্ম-সংস্কার নিরপেক্ষ ভাবে সাধারণ, সামান্য মানুষের প্রতিদিনের জীবনের পাথেয়রূপে মানুষকে ভালবাসার অসামান্য আদর্শ, যে আদর্শ তিনি পুনরাবিষ্কার করেছিলেন। সেই আবিষ্কৃতিই তাঁর সাহিত্যের চমৎকৃতি। তাই, শরৎচন্দ্রের আবেদন সরল এবং ব্যাপক। গল্প জমাবার এমন সুচতুর কৌশল,

বহুল পরিচিত জীবনকে বিচিত্র ভাবে দেখাবার নিপুণতা ও সাধারণ আবেগকে পাঠক-অন্তরে প্রবেশ ঘটানো শরৎচন্দ্রের শিল্পোচিত গুণ। আসলে মানুষের অন্তরের গোপন কথাটি তিনি ধরতে পেরেছিলেন। তার উপর ছিল লেখকের অকুণ্ঠ সহানুভূতির প্রলেপ। তাই চোখের জলের সাহিত্য হলেও এখনও ভারতের নানা প্রাদেশিক ভাষায় শরৎ-গ্রন্থ 'বেস্ট সেলার'। হৃদয়-সম্পদে এমন ধনী লেখক সত্যই বাংলা দেশে কম জন্মেছেন। এবং তাঁর এই হৃদয়ৈশ্বর্যই তাঁর দোষ এবং গুণের কারণ। পাঁকাল মাছের মত কী এক দুর্জ্ঞেয় ক্ষমতায় নিজের দেহ থেকে পরিব্রাজক জীবনের সকল প্রকারের বিরূপ অভিজ্ঞতার মলিন পাঁক মুছে ফেলে পুনরায় সংসারাঙ্গণে ফিরে এসেছেন সকলের প্রতি প্রাণ-ঢালা ভালবাসার আবেগ নিয়ে। নিজেও কাঁদলেন, পাঠকসাধারণকেও কাঁদালেন ; শুধু যে নিজেই মানুষকে প্রাণভরে ভালবাসলেন তা-ই নয়, অপরকেও ভালবাসিয়ে তবে ছাড়লেন। তাই তাঁর কাহিনী একান্তভাবে বাঙালী-জীবন কেন্দ্রিক হলেও তার মধ্যে বহুস্থলেই ভূগোল-ইতিহাসের সীমা মুছে গিয়ে চিরকালের মানুষের শোভাযাত্রাই ফুটে উঠেছে।[১] এর আর একটি প্রধান কারণ ছিল নারীজাতির প্রতি তাঁর অফুরন্ত করুণা ও সহানুভূতি। সারাজীবনে তিনি নানা তথ্য-উপাদান ঘেঁটে এইটুকু বুঝেছিলেন যে, সর্বকালেই দুর্বল নারী সবল পুরুষের দ্বারা নিপীড়িত হয়েছে। তাঁর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাস বাঙালী নারীর মৌন বেদনা-সহানুভূতির রসে আর্দ্র হয়ে পাঠকের সহানুভূতি প্রবল ভাবে আকর্ষণ করে। সমাজ, পরিবার—যার প্রধান নেতা পুরুষ, তার দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে বাঙালী নারী যে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে, সারা ভারতের নারীসমাজের চিত্রও প্রায় তারই মত। তাই অন্য প্রদেশের সহৃদয় পাঠকও শরৎ-সাহিত্যের বাঙালী সমাজের ঘটনাকাহিনী অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে পড়ে থাকেন। এই বিংশ শতকেও তিনিই ভারতের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লেখক। তাঁর অনুবাদিত গ্রন্থের তালিকা দেখলে বোঝা যায় একমাত্র বেদব্যাস ও বাল্মীকি ছাড়া শরৎচন্দ্রকে অন্য কেউ অতিক্রম করতে সক্ষম হননি।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দুজন পূর্বগামী বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের তুলনামূলক আলোচনা যেমন আকর্ষণীয় তেমনি সার্থকতাপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র যে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা তা সর্ববাদিসম্মত ভাবে স্বীকৃত। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। তিনি পথিকৃৎ।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেকে উদ্দেশ্যপ্রধান লেখক হিসাবে বিবেচনা করতেন। সেদিনের প্রচলিত নৈতিকতাই ছিল তাঁর লক্ষ্য এবং তার প্রচারের দায়িত্বই যেন

তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মধ্যে শৈল্পিক নিস্পৃহতা কম থাকায়, যে সকল চরিত্র প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাদের প্রতি তাঁর প্রায় ব্যক্তিগত ক্রোধই প্রকাশ পেয়েছে। মন্দের শাস্তি, ধার্মিকের পুরস্কার এবং ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস, এই তিনটি জিনিস ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্যবস্তু।[২]

রোহিণীর পরিণাম সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে বঙ্কিমের নীতিবাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছিলেন তা কিছুটা বিতর্কের বিষয়। শরৎচন্দ্র যে মানসিক দ্বন্দ্বের চিত্র 'গৃহদাহ'র সুরেশ ও অচলার ক্ষেত্রে দেখিয়েছেন, বঙ্কিম সঙ্কোচ বশত তা দেখাননি ; যদিও অচলা ও রোহিনী এক নয়। অচলা মনের দোলাচলবৃত্তির জন্য বিপর্যয় ডেকে এনেছে কিন্তু রোহিণীর রূপোন্মাদনা ও জিগীষাবৃত্তি তার ও গোবিন্দলালের সর্বনাশ করেছে। বঙ্কিমের বিভিন্ন উপন্যাসে সে-কালে যে সকল সামাজিক, নৈতিক এবং দার্শনিক চিন্তাগুলি প্রধান ছিল তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেছে। যেমন 'শৈবলিনী'তে নৈতিক প্রশ্ন, 'সীতারাম'-এ রাষ্ট্রীয় আদর্শের সঙ্গে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্বের প্রশ্ন, 'দেবীচৌধুরাণী'তে সমাজ-সেবাব আদর্শের প্রশ্ন কাহিনীতে উপস্থাপিত হয়েছে। সূত্র-বাঁধা চরিত্র-চিত্রণের ফলে তাঁর অনেক নায়ক-নায়িকাই শ্রেণীগত চরিত্র হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রচারক ও সংস্কারকের উদ্দেশ্য সিদ্ধি-সাধনে তাদের সার্থকতা থাকতে পারে, কিন্তু শিল্পকলার দিক থেকে তারা বহুল পরিমাণে ব্যর্থ।

সামাজিক সমস্যার মীমাংসা শরৎচন্দ্র করেননি। কিন্তু নিপীড়িত মানুষের হৃদয়ে তিনি প্রবেশ করেছেন দক্ষ শিল্পীর ক্ষমতা নিয়ে। বঙ্কিমের সঙ্গে এখানেই তাঁর পার্থক্য। বঙ্কিম নীতির, শাসনের, সংযমের জয়গান করেছেন ; শরৎচন্দ্র মানুষের ব্যক্তিত্বের সমস্যাকে, সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহকে, ব্যক্তি হৃদয়ের দুর্বলতাকে প্রবল সহানুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের কাছে শরৎচন্দ্রের ঋণ সুস্পষ্ট। তিনি প্রায়ই বলতেন রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' তাঁর কাছে আদর্শ-স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথের ভাষাকে কাজে লাগিয়েও শরৎচন্দ্র তাঁর ভাষার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এনেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার অঙ্গ থেকে সংস্কৃত রূপস্ফীতিকে ছেঁটে ফেলে ভাষাকে গতিশীল ও নমনীয় করেছিলেন। সেই কারণে শরৎচন্দ্রকে ভাষার ব্যাপারে বিশেষ শ্রম স্বীকার করতে হয়নি। ভাষার ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব একটা নতুন বাচনিক স্বাচ্ছন্দ্য আবিষ্কার। শরৎচন্দ্রের ভাষা প্রথমদিকে বঙ্কিমচন্দ্রীয়,—অচিরেই স্বকীয়—স্থানে স্থানে রবীন্দ্রধ্বনিত।

শুধু ভাষায় নয়, জীবন-দৃষ্টিতেও শরৎচন্দ্র তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথ

তাঁর 'চোখের বালি', 'গোরা' এমন কি 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে সকল প্রচলিত সংস্কারের মূল্য নতুন করে যাচাই করার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'কে শরৎচন্দ্র উপন্যাসের ক্ষেত্রে নতুন দিক্ নির্দেশক বলে মেনেছিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে আরও বলেছিলেন যে, সাহিত্যে গুরুবাদ তিনি মানেন। রবীন্দ্রনাথকে যদি বাঙালীর জীবন ও সাহিত্যে আধুনিকতার অগ্রগামী ধরা হয় তবে নিঃসন্দেহে শরৎচন্দ্র তাঁর যোগ্য শিষ্য। 'চোখের বালি' রচনা পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে প্রথানুগত্যকে অস্বীকার করা হয়েছিল, তারই পূর্ণতর বিকাশ আমরা শরৎচন্দ্রেও লক্ষ্য করেছি। বিনোদিনীর মনোবাসনা রমা, রাজলক্ষ্মী, অভয়ারও মনোবাসনা। সমাজ-বিগর্হিত নিষিদ্ধ প্রেমকে শরৎচন্দ্রই প্রথম উপন্যাসের উপজীব্য করেননি। বিনোদিনীর মত বাকপটু, রসিকা, গৃহকর্মনিপুণা, সেবা-পরায়ণা এবং পরকে আপ্যায়ণে-শুশ্রূষায় পারদর্শিনী শরৎচন্দ্রের সমুদয় নায়িকা। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ নায়িকাই সেদিক থেকে বিনোদিনীর ছায়ায় গঠিত।[৩]

শরৎচন্দ্রের লেখায় পূর্বসূরীদের প্রভাব সম্পর্কে বলা যায়—অতীতের উপর ভর করেই তো আমরা এগিয়ে চলি ভবিষ্যতের দিকে —পশ্চাতের উপর ভর না করে অগ্রসর হওয়া যায় না। সাহিত্যের জগতে পূর্বসূরীদের প্রভাব এড়ানো অসম্ভব। শরৎচন্দ্র তাদের কাছেও ঋণী যারা উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত। সত্যই এদের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও তাদের জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত গভীর উপলব্ধি শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির মৌলিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এ যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শক্তিশালী ঔপন্যাসিকগণ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন শরৎ-সাহিত্যের পরিমণ্ডল নিশ্চিত ভাবে সে হিসাবে সংকীর্ণ। বাংলা সাহিত্যেই, 'গোরা' বা 'পথের পাঁচালী' বা 'পুতুল-নাচের ইতিকথা' অথবা 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র মত বই শরৎচন্দ্র রচনা করেন নি। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' অথবা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'র মত বিচিত্র পটভূমিতেও উপন্যাস লেখা শরৎচন্দ্রের ভাগ্যে ঘটেনি। অবশ্য শরৎচন্দ্র 'গৃহদাহ', 'শ্রীকান্ত', 'পথের দাবী', 'শেষ প্রশ্ন' প্রভৃতি উপন্যাসে এবং 'মহেশ', 'ছবি', 'বিলাসী', 'অভাগীর স্বর্গ' প্রভৃতি গল্পে বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের দিক থেকে কিছুটা প্রসারিত করবার চেষ্টা করেছেন, তবু সমগ্রভাবে পরিচিত বাঙালী সংসার জীবনের ছবি তোলার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী।

শরৎচন্দ্রের জীবনে যদি কোন স্থায়ীভাব থেকে থাকে, তবে তা সহানুভূতি। কি সুদূরপ্রসারী গহনচারী ছিল তাঁর এই সহানুভূতি! জীবনের স্থূল-সূক্ষ্ম,

প্রখ্যাত-অখ্যাত, সুখ্যাত-কুখ্যাত সকল কিছুকেই তিনি ভালবেসেছিলেন, বুঝেছিলেন এবং এঁকেছিলেন। আবার অবজ্ঞাত, অনভিজাত অথবা সমাজের প্রত্যন্তচর ক্ষুদ্র জীবনের সকল রসমাধুর্যের তিনি ছিলেন বিলাসী ভোক্তা ও সুনিপুণ পরিবেশক। তা না হলে, মহেশ বলদটির সুকরুণ শোকাবহ জীবনাবসান ও তার মালিক কৃষকপ্রজা গফুরের সবটুকু দুঃখ ব্যথা কি করে তিনি বুঝলেন? দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, মারী-তাড়িত, অজ্ঞান অশক্ত মানুষ কি রকম শোচনীয় জীবন যাপন করে, আর দলে দলে কিভাবে পশুর মত মৃত্যু কবলিত হয়, পল্লীচিত্র এঁকে তার এই রকমের নিদারুণ মর্মঘাতী বিবরণ ক'জনে দিতে পারেন? জীবনের পায়ে চলা পথে বহু মানুষকে তিনি শুধু চোখ দিয়েই দেখেননি, প্রাণ দিয়েও দেখেছেন, দেখেছেন ভালবাসার দৃষ্টি দিয়ে, মায়া আর মমতার দর্পণে। তাই, সমাজের হিংস্র কশাঘাতে যারা আহত আর রক্তাক্ত হয়েছে বার বার, তাদের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর দরদ দেখা দিয়েছে বেশী। তাদের বেদনাই তাঁর মুখ খুলে দিয়েছে, তাঁকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে পাঠিয়েছে। তাই তাঁর রচনা সমবেদনায় সান্দ্র হৃদয়ের ঐশ্বর্যে ঋদ্ধ। মনন নয়, সংবেদন তাঁর রচনার মূলকথা—হৃদয় দিয়ে হৃদয় পাওয়া। তাই তার আবেদন মূলতঃ মর্মে, মস্তিষ্কে নয়।

রবীন্দ্রনাথের তুলনায় শরৎচন্দ্র অধিক জীবননিষ্ঠ; কিন্তু বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতায় রবীন্দ্রনাথকে উত্তীর্ণ হতে পারেননি। শরৎ-সৃষ্ট চরিত্রগুলি জীবনের মাটিতে থাকে অর্থাৎ কল্পনাশক্তি প্রয়োগ না করে জীবনের ঘটনায় চরিত্রের ব্যাখ্যা অন্বেষণের ঝোঁকটি শরৎচন্দ্রের বেশী। উভয়েরই নিপুণ বিশ্লেষণ পদ্ধতি বঙ্কিমী-জগৎ থেকে তাঁদের পৃথক করে দিয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ কল্পনাশক্তি ও কাহিনী বয়নের বৈদগ্ধ্য সাধারণ পাঠককে উপভোগের ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা বাধা দিয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের সুস্থির সমাহিত সৌন্দর্য্যপিপাসু কবি-ব্যক্তিত্ব হয়ত ছিল কিন্তু নিসর্গতন্ময়তা, বস্তুসম্পর্ক-নিরপেক্ষ-ভাবালুতা, বিমান-বিসর্পিল-কল্পনা-জীবিতা হয়ত সে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ছিল না। বাস্তবসম্পৃক্ত জীবন রসে ছিল সেই ব্যক্তিত্ব ভরপুর, দুঃখ ও কারুণ্যের অনুভূতিতে ছিল তা তন্ময়। তাই শরৎচন্দ্র বললেন, 'সংসারে সৌন্দর্য্যে সম্পদে ভরা বসন্ত আসে জানি; আনে সঙ্গে তার কোকিলের গান, আনে প্রস্ফুটিত মল্লিকা-মালতী-জাতি-যুথি, আনে গন্ধ-ব্যাকুল দক্ষিণা পবন।...ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটলো না। সে দারিদ্র্য আমার লেখার মধ্যে চাইলেই চোখে পড়ে।'

তা হলে সামগ্রিক ভাবে শরৎ-সাহিত্য কি কি কারণে পাঠকের চিত্তকে আকর্ষণ করে—

(ক) তাঁর অনেক উপন্যাসেই সমাজের নানা কুসংস্কার, নিপীড়নকে বিদ্রূপ করা হয়েছে এবং তিনি তাঁর রচনায় যুগযুগান্তরের অন্ধ অচলায়তন সমাজ-ব্যবস্থাকে ভেঙে নতুন সুস্থ মানবধর্মকে সমাজের অনুশাসনের উপরে স্থান দিয়েছেন। (খ) শরৎ-সাহিত্যে সমাজের চোখে যারা অধঃপতিত, যারা ধর্মীয় কারণে ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে নিগৃহীত, তাদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে। (গ) অনাচার দূরীকরণে তিনি ছিলেন আপস-হীন। (ঘ) তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসগুলিতে বাংলা দেশ ও বাঙালী মানুষ, পরিবেশ এবং আচরণে সম্পূর্ণ ভাবে জাতীয় চরিত্র রক্ষা করেও এক নতুনতর ব্যঞ্জনা পেয়েছে। সাহিত্য রচনার জন্য জীবনাতিরিক্ত কল্পনাকে মূল্য দিয়ে তিনি কখনও জীবনকে বিবর্ণ করেননি, আবার শুধুমাত্র বাস্তব জীবন ও পরিচিত মানুষের জীবনলিপি রচনা করে তাকে নীরস করে তোলেননি। (ঙ) শরৎ-সাহিত্যে নারী চরিত্রগুলি অধিক মর্যাদা পেয়েছে। মেয়েরাও যে 'মানুষ', সে যে শুধুই 'মেয়ে' নয়, এই বোধ বাংলার মেয়েদের মনে জাগ্রত করে তুলেছে। (চ) শরৎচন্দ্র দেশপ্রেমিক ছিলেন। কখনও বা তিনি এই দেশপ্রেম রাজনৈতিক চেতনার ('পথের দাবী' স্মরণীয়) দ্বারা সক্রিয় করে তুলেছেন। (ছ) প্রেমের রহস্য উদ্‌ঘাটন এবং স্বরূপ-নির্ণয়ে শরৎচন্দ্র যে অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর স্থান নির্দেশ করেছে। (জ) তাঁর হাস্যরস আড়ম্বরহীন ও অনাবিল। (ঝ) তাঁর ভাষা, চিত্র নির্মাণের দক্ষতা এবং শব্দ-ব্যবহারের সামর্থ্য আমাদের বিস্মিত করে। তাঁর সংলাপ-চাতুর্য ছিল এক অনন্যসাধারণ বস্তু।

এর থেকে আমাদের এই বক্তব্য দৃঢ় হল যে, বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে পূর্বসূরীদের সঙ্গে শরতের স্থানও বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে রইল। শরৎচন্দ্রের জীবন তাই বৃথায় যায়নি। যদিও তাঁর 'সাহিত্য-সাধনার বৃহত্তর অংশ' 'অনাগতের অবহেলায় ডুবে' গেছে তবুও 'সত্য'টুকু, 'স্বল্প সঞ্চয়টুকু' তিনি যা রেখে গেছেন তা হচ্ছে মানবপ্রেম, জীবনপ্রেম। তাঁর দৃষ্টি-পথ ছিল প্রেমের পথ। যে সকল মানুষকে বলা যায় 'Suffering humanity'-র দরদী, শরৎচন্দ্র তাঁদের মধ্যে প্রধান স্থান পাবেন। আর পাবেন বলেই মানুষের অন্তরে আজও তাই শরৎ-চন্দ্রিমার আলো অম্লান হয়ে থাকবে।

বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ যুগের পর যথাযথ ভাবে না হলেও কল্লোলযুগ নামে

চিহ্নিত এ যুগে মধ্যবিত্তের সীমা অতিক্রম করে কিছুটা শ্রমিক, কৃষক ও গৃহ-হীনদের শ্রেণীকে সাহিত্য স্পর্শ করেছে। জীবনের অসুন্দর কুৎসিত দিকের অবতারণায় সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে একটা অলিখিত বাধা ছিল, শরৎচন্দ্র তাকে খানিকটা শিথিল করেছিলেন। গতানুগতিক সমাজনীতিকে অস্বীকার, নতুন ধরণের সমাজনীতির দাবী, বিবাহ বহির্ভূত বা বিধিবহির্ভূত প্রেমের জয়-জয়কার এই যুগের সাহিত্যের বিশেষত্ব। কিন্তু তারও সূত্রপাত শরৎচন্দ্রে দেখা গেছে। শরৎচন্দ্র মনে এবং জীবনযাত্রার অভ্যাসে মূলতঃ উনিশ-শতকীয়, কিন্তু উনিশ শতক যে বিগতপ্রায় এবং বিশ-শতক যে আগতপ্রায় তিনি এ সম্পর্কে সচেতন। এই আবির্ভাবকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। অবশ্যই বঙ্কিমের মত শরৎচন্দ্রও সংস্কারপন্থী। কল্লোলযুগের লেখকগণ মনোভাবের দিক দিয়ে কিছুটা বিদ্রোহী। পুরানো সমাজকে বর্জন করে তাঁরা নতুন তত্ত্ব অনুযায়ী সমাজকে ঢেলে সাজাতে চান।

বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ, এঁরা বাঙালী জীবনকে উপন্যাসের উপযুক্ত উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তখন অনেকেই ভেবেছিলেন বাঙালী জীবনে বৈচিত্র্য নেই, তাই তাঁরা বিলাতী নভেলের আলোকে ও পুঁথি পড়া দৃষ্টিতে জীবনকে দেখতে চেয়েছিলেন, বিলাতী নভেল থেকেই প্লট খুঁজছিলেন। দুই একজন মাত্র প্রতিভাবান স্রষ্টা তখন সার্থক ঔপন্যাসিক হয়ে উঠেছিলেন—তাঁরাও এই দেশ থেকেই, এই মাটি থেকেই উপাদান সংগ্রহে লেগেছিলেন। দেশের সমাজজীবনে ক্রমান্বয়ে পট পরিবর্তনের কালে বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে এলেন নরেশচন্দ্র, সৌরীন্দ্রমোহন, শৈলজানন্দ, বিভূতি-মাণিক-তারাশঙ্কর (তিন বন্দ্যোপাধ্যায়), ধূর্জটিপ্রসাদ, প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্য-প্রবোধ-বুদ্ধদেব, বলাই-চাঁদ (বনফুল), প্রেমাঙ্কুর আতর্থী এবং আরও অনেকে। অবশ্যই, শরতোত্তর বাংলা উপন্যাসের প্রধান পুরুষ ঐ তিন বন্দ্যোপাধ্যায়।

শরৎচন্দ্রের শেষ পর্বের সৃষ্টির মধ্যে সমসাময়িক বিভিন্ন সামাজিক স্তরের পরিচয় আছে, যা পূর্বসূরীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে মেলেনি। 'পথের দাবী'তে আছে শ্রমিকের দাবি, 'মহেশ' গল্পে ও 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে কৃষক সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। 'ষোড়শী' নাটকে অনেকেই বলিষ্ঠ ও বিদ্রোহী কৃষক সমাজের রূপ দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কৃষক সমাজের প্রতিনিধি গফুর কেন তার ক্ষেতখামার, ভিটেমাটি ছেড়ে শহরের শ্বাসরুদ্ধকারী আবহাওয়ার জাঁতাকলে ধরা দিল, লেখক তার নিষ্করুণ ভয়াবহ দিকটি সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের লেখায় যা মর্যাদা লাভ করেছিল কালোচিত

ভাবে উত্তরসূরীগণ তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর কথা এনেছেন, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সমস্যা এনেছেন। উপেক্ষিত, অবহেলিত মানুষের এক নতুন মর্যাদাবোধ উত্তরসূরীদের মনে জেগে উঠেছে। শৈলজানন্দ-প্রেমেন্দ্র এই উপেক্ষিত অবজ্ঞাত মানুষের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করলেন। দরিদ্র ও দুর্গত কৃষক এবং শ্রমিক সমাজের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে সক্ষম হলেন তারাশঙ্কর ও মাণিক। বিভূতিভূষণের পল্লীর সৌন্দর্য্যমাধুর্যের প্রীতি আংশিকভাবে শরৎচন্দ্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত। 'পথের পাঁচালী' পল্লীসমাজের নয়, পল্লীগৃহের কথা, অপু-দুর্গার মত অনুভূতি-প্রবণ কল্পনা-কুশল শিশু-লীলারই কাব্য-কথা। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজে'র সত্যকে সে অস্বীকার না করে, তার পাশ কাটিয়ে গিয়ে দাঁড় করায় পল্লীজীবনের ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের তেমনি সত্যনিষ্ঠ, অথচ রোমান্সের মায়া মাখানো আর একটি রূপে। মাণিকের সমাজ বিদ্রোহের শিখা প্রজ্বলিত হয়েছে শরৎ-সাহিত্যের অগ্নিস্পর্শ লাভে, আর তারাশঙ্কর শরৎচন্দ্রের দ্বারা কিরূপ প্রভাবিত তা তাঁরই লেখা 'আমার সাহিত্য জীবন' পড়লেই জানা যায়। তাই, জীবন-ঘনিষ্ঠ বাস্তবতার ক্ষেত্রে যুগ-নির্মাণের দাবি শরৎচন্দ্র করতে পারেন। আঙ্গিকের তফাৎ ঘটলেও মূল সত্তায় শরৎচন্দ্রের কাছে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঋণ অনস্বীকার্য। সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে চিত্রনির্মাণ, শরৎচন্দ্রের এই বৈশিষ্ট্যটিও তাঁর কলমে উত্তোরিত হয়েছে। মাণিকবাবু তাঁর 'লেখকের কথা' গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের কাছে ঋণ স্বীকার করে লিখেছেন, 'শরৎচন্দ্রের বই পড়ে মনে হ'ত তিনি অন্যায় আর গোঁড়ামীকে আঘাত করেছেন কিন্তু অন্য কোন লেখক সম্পর্কেই এ রকম ভাবা সম্ভব হতো না।' অবশ্যই মাণিকবাবুর অঙ্গীকার ছিল শরৎচন্দ্রের তুলনায় কিছুটা ভিন্নধর্মী।

বাংলা সাহিত্যের বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়ীর অপর দুজন, তারাশঙ্কর এবং বিভূতিভূষণও এই যোগসূত্রে বাঁধা পড়েছেন। শরৎচন্দ্রের দ্বন্দ্বমূলক সমাজ সমস্যার আরোপ তারাশঙ্করেরও উপজীব্য। বিভূতিভূষণ নিলেন শরৎচন্দ্রের রোমান্সধর্মী পরিবেশ রচনার তুলিটি। তারই সাহায্যে চিত্র বর্ণন ও আবেগ এবং নিসর্গপ্রেমের ঐশ্বর্যে তিনি পাঠক মনে স্থায়ী আসন পাতলেন।

শরৎচন্দ্র যদিও ছিলেন মূলতঃ চরিত্র-চিত্রনের রূপকার, তবু এই চরিত্র-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই তিনি সামাজিক সমস্যার প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। অন্নদাশঙ্কর রায়কে এই ধারাটিই গ্রহণ করতে দেখা গেল। তাঁর 'সত্যাসত্য' উপন্যাসের বৃহৎ পরিসরের অবকাশে নায়ক বাদল সেন যেন শ্রীকান্তের মতই একটি পথিক-সত্তা স্বতন্ত্র পরিবেশে আরোপ করল। শ্রীকান্তের মতই সে

জীবন-সত্যের সন্ধানে উৎসুক

আর একটি কথা। শরৎচন্দ্র অসাধারণ সংযমী লেখক ছিলেন। এই ক্ষেত্রে তিনি বঙ্কিম-রবীন্দ্রের সার্থক উত্তরসূরী এবং ঐ বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়ীর প্রেরণার স্থল। রূপমোহ ও জৈবক্ষুধার বর্ণনাংশে শব্দের কী ব্যয়কুণ্ঠা! সবিস্তার বর্ণনের কত অনীহা!

বাংলা উপন্যাসে বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। কোথাও সাফল্য এসেছে কোথাও বা তা পরীক্ষার স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকছে। ভ্রমণ-কাহিনী, আত্ম-কাহিনী অথবা রম্য-রচনার রূপাকৃতি আত্মস্থ করে উপন্যাসের দেহরূপ হচ্ছে পুষ্ট। বাংলার নবীনতর সমকালীন ঔপন্যাসিকদল উপন্যাসের কলাকৌশল এবং বিষয়বস্তুতে আরও বৈচিত্র্য আনছেন এবং এঁদের সমবেত প্রচেষ্টায় বাংলা উপন্যাস ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হবে নিশ্চয়ই।

এ তো গেল সামগ্রিকভাবে শরৎ-সাহিত্য মূল্যায়ন। এবারে আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ 'শ্রীকান্ত'তে ফিরে আসি এবং দেখবার চেষ্টা করি 'শ্রীকান্ত' আত্মজীবন-নির্ভর উপন্যাস হিসাবে কতটুকু সার্থক।

উৎস-নির্দেশ

(১) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—শ্রীঅসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ৬৯০

(২) শরৎ-সাহিত্যের মূলতত্ত্ব—হুমায়ুন কবির। পৃঃ ৪১

(৩) বাংলা উপন্যাসের কালান্তর (প্রথম সংস্করণ) —সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ২৩৭

আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস

'Certainly nearly every great book of any feeling is largely autobiographical, not in precise detail, but in its manifestation of the author's attitudes and reactions to life.'—Ethel Mannin.

যে সকল উপন্যাসে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা নানাভাবে ব্যবহৃত হয়, তার মানসিকতা ও নায়কের অন্তর্জীবনের মধ্যে একটা গভীর আত্মিক যোগ লক্ষ্য করা যায়, তাকেই আমরা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস (Autobiographical Novel) বলতে পারি। এই ধরণের উপন্যাসে ঔপন্যাসিক ব্যক্তি জীবনের ঘটনাপঞ্জীকে স্তরে স্তরে বিন্যাস করে দেন। এই উপন্যাসে লেখকের স্মৃতিবাহিত অভিজ্ঞতার প্রয়োগ সবচেয়ে বেশী ঘটে। লেখকের সঙ্কোচ-ভীরু মন অনেক বিক্ষিপ্ত ভাবনার মাঝখানেও নিজেকে আর লুকিয়ে রাখতে পারে না।

জীবন কাহিনী কীর্তিমান ব্যক্তির কথা, আত্মচরিত নিজের অন্তরঙ্গ কাহিনী। যে কোন ব্যক্তিই আপনার কথা বলতে পারেন, তার মধ্যে সমাজ ইতিহাসে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কিছু না থাকলেও বলতে পারেন। রচনা মাধুর্য থাকলে, বিষয়গত দৈন্য সত্ত্বেও আত্মজীবনী উৎরে যায়। আত্মজীবনী আর আত্মজীবন-চরিত-মূলক উপন্যাসে পার্থক্য আছে। আত্মজীবনী তথ্যের ধারাবাহিক বিবরণী; আত্মজীবনচরিত-মূলক উপন্যাস লেখকের চরিত্র ও অভিজ্ঞতার ভাবরূপ। আত্মজীবনী-মূলক উপন্যাসের নায়কের সঙ্গে যে লেখকের বিশেষ বাহ্যিক মিল থাকতে হবে তার কোন মানে নেই।

সাহিত্যের যে সমস্ত শাখা উপন্যাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ হল আত্মজীবনী। সেণ্ট অগাষ্টিনের Confessions বা আত্মজীবনী যেমন এই ধারাকে প্রভাবিত করেছে, তেমনি রুশো, গ্যেটে প্রমুখ লেখকদের আত্মজীবনী ও অন্যান্য লেখকদের আত্মজীবনীর অন্ত-

বিশ্লেষণ ও ব্যক্তি জীবনের উদ্ঘাটন উপন্যাসকে প্রভাবিত করেছে। এই ধরণের একটি দিক হল আঙ্গিকগত। আত্মজীবনীর ধাঁচে উত্তম পুরুষের জবানীতে কাহিনীকথন অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই উপন্যাসের একটি বিশিষ্ট রূপ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এ জাতীয় সমস্ত উপন্যাসকেই আত্মজীবনী-মূলক উপন্যাস বলা যায় না। কোনও কোনও উপন্যাসে উত্তমপুরুষের মাধ্যম না থাকলেও লেখকের জীবন ও মানস গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়, সেগুলিকে পুরোপুরি আত্মজীবনী-মূলক উপন্যাস বলা না গেলেও অন্তত সেই ধাঁচের রচনা বলতে কোনও বাধা নেই, আর তাদের মধ্যে কয়েকটি তো সম্পূর্ণরূপেই আত্মজীবনী-মূলক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' ও শরৎচন্দ্রের 'স্বামী'-তেও উত্তমপুরুষের মুখে কাহিনীর বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু এগুলি আত্মজীবনী-মূলক উপন্যাস নয়। আবার 'রজনী', 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে কাহিনীর বর্ণনা হয়েছে, কিন্তু তাদের কথা লেখকের কথা নয়।

গ্যেটের The Sufferings of Young Werther ও Wilhelm Meister-এ তাঁর নিজের জীবনের অনেক উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। Charlotte Brontee-র Jane Eyre-এর নায়িকার দ্বন্দ্বযন্ত্রণা আত্মসচেনতা লেখিকার মানস জীবনেরই প্রতিচ্ছবি, এটি পুরোপুরি Subjective novel, আত্মজীবনী-মূলক উপন্যাস; তাঁর Villette-ও তাই। শার্লট ব্রন্টির সমস্ত রচনাই রোমান্টিক কবিদের রচনার মত আত্ম-উদ্ঘাটন, সাধারণ উপন্যাসের মত লেখকের ব্যক্তিসত্তা নিরপেক্ষ জীবনচিত্র নয়। মার্ক রাদারফোর্ড-এর The Autobiography of Mark Ratherford আত্মজীবনী-মূলক উপন্যাস, গিসিং-এর The Private Papers of Henry Ryecroft (1903)-ও তাই। এ ছাড়াও, কাম্যুর 'আউটসাইডার', ডিকেন্স-এর 'ডেভিড কপারফিল্ড' আত্মজীবনী-মূলক উপন্যাস।

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'তে আত্মচরিতের বেশ স্পর্শ আছে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের নায়ক শরৎচন্দ্র স্বয়ং কিনা, সে সংশয় বা সন্দেহ অনেকেরই থাকবে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের জীবন জানবার পর আমরা যে 'শ্রীকান্ত' সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করি তাতে কোন সন্দেহ নেই। গ্রন্থখানিকে তাই আত্মজীবনচরিত-মূলক বলে মনে করা অসঙ্গত হবে না। হয়ত প্রত্যেক ঘটনা সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রযোজ্য না-ও হতে পারে, তবে, অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা যে লেখকের ব্যক্তিগত জীবন থেকে সংগৃহীত তা নিরাপদে ধরে নেওয়া যেতে পারে। বইখানি লেখকের মানস প্রসার, জীবনের সঙ্গে সুদূরপ্রসারী বহুমুখী পরিচয়ের সত্য নিদর্শন।

আত্মজীবনী-মূলক উপন্যাসে লেখক নিজেকে উদ্ঘাটিত করেন। মার্সেল প্রুস্ত এই ধরণের উপন্যাসকে Introspective বা অন্তর্মুখীন উপন্যাস বলেছেন। এই শ্রেণীর উপন্যাসে অতীতের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে রূপদান করা হয়। এই অর্থে উপন্যাস স্মৃতির সংগ্রহশালা। আত্মজীবনী রচনা করা কঠিন কিন্তু আত্মজীবনী-মূলক উপন্যাসের দায়িত্ব আরও সুকঠিন। এখানে লেখক আপনাকে সকল ঘটনার কেন্দ্রস্থলে রেখে সকলকে কথা বলবার, প্রকাশিত হবার সুযোগ দেন। আপনাকে বোঝাবার জন্য লেখক অপরের হাতে নিজেকে সমর্পণ করেন। আবার, এর সঙ্গে নিজের চরিত্র ও কার্যাবলী সম্পর্কেও তাঁকে বিচার করতে হয়।

('শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে ধারাবাহিক জীবন-কথা বলেননি। এখানে আত্মকথা অপেক্ষা আত্মোপলব্ধির মূল্য বেশী। শরৎচন্দ্র যেমন বহু তুচ্ছ বিষয়কে বড় করে দেখিয়েছেন, তেমনি জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ অংশকে বর্জনও করেছেন; আত্মপ্রচারে ব্যস্ত থাকেননি। শ্রীকান্ত তাই নিরাসক্ত দর্শকে পরিণত হয়েছে, অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়েছে। জীবনকে সে দেখেছে, উপলব্ধি করেছে, কিন্তু মন্তব্য করেনি। শরৎচন্দ্র আত্মজীবনের সঙ্গে আত্মচিন্তার অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তথ্যের সত্যকে তত্ত্বের সত্যে মণ্ডিত করেছেন। তথ্য যদি সামান্যও হয়, লেখক তাকে নিজের হৃদয়ের স্পর্শে নিজের প্রয়োজনের উপযোগী করে নিয়েছেন—সেগুলি তাঁর সেই অন্তর-অনুভূতির সঙ্কেত-বস্তু হয়ে উঠেছে; এমনি করেই বাহির ও ভিতরের যোগ রক্ষা করেছেন।)

(উপন্যাসে এমন বহু বিষয় সন্নিবেশ করা হয়েছে যা লেখকের জীবনেই কোন না কোন ভাবে ঘটেছিল। কিন্তু উপন্যাসে সে সকল ঘটনা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেগুলি ঠিক সেইভাবে সেই নামাঙ্কিত পাত্রপাত্রীকে অবলম্বন করে ঘটেনি। অভিজ্ঞতা কথাসাহিত্যিকের একটা বড় অবলম্বন; সুতরাং উপন্যাসের মধ্যে জীবনের সত্য ঘটনা কিছু পরিমাণে থাকলে তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। আবার উপন্যাসে শরৎচন্দ্র উত্তমপুরুষে কাহিনী বিবৃত করেছেন বলেই কাহিনীটিকে আত্মজীবনী-মূলক উপন্যাস বলা হচ্ছে, তাও নয়। বর্ণনার সুবিধার জন্যই শরৎচন্দ্র উত্তমপুরুষে বর্ণনা করেছেন। উত্তম-পুরুষে বক্তব্য না রেখেও এই জাতীয় উপন্যাস রচনা চলে।)

(তবে 'শ্রীকান্ত' দিনপঞ্জী বা ডায়ারী অথবা ভ্রমণ কাহিনীও নয়) উপন্যাসে ডায়ারীর মত ব্যক্তিপুরুষের আত্মগত নানা ভাবনা আছে। কিন্তু আত্মগত

সমস্ত কথাকে লেখক গ্রন্থে অসাধারণ কুশলতার সঙ্গে একটা ধারাবাহিকতা দান করেছেন। ডায়ারীর মত প্রসঙ্গান্তরে গিয়েও একটি অখণ্ড সংযোগসূত্রে বেঁধে দিয়েছেন।)

(আর, ভ্রমণ কাহিনীতে ভ্রমণ মুখ্য, কাহিনী গৌণ; উপন্যাসে কাহিনী মুখ্য। উপন্যাসমাত্রেই ঘটনা, চরিত্র এবং জীবনজিজ্ঞাসা মিলিয়ে একটি সমগ্র জীবনের অখণ্ড রূপ ফুটিয়ে তোলে। ডায়ারী বা ভ্রমণ কাহিনী তা পারে না। কিন্তু 'শ্রীকান্ত'-তে কাহিনীর মধ্যে একটা সংহতি এনে জীবনের ও সমাজের নানা সমস্যা, সমস্যার সঙ্গে সংঘাতে মানবমনের দ্বন্দ্ব ও বিকাশ—সবই দেখানো হয়েছে। তবে, এ কাহিনী এক ভবঘুরের কাহিনী। কিন্তু ভবঘুরের কাহিনীও ভ্রমণ কাহিনী নয়। ভ্রমণ কাহিনীতে বিশেষ বিশেষ স্থানের বস্তুরূপের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা হয়, 'শ্রীকান্ত'র মধ্যে কোন বিশেষ স্থানিকরূপ স্পষ্ট ও বিশিষ্ট হয়ে ওঠেনি। ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে যে অবিরাম গতিশীলতা থাকে তা-ও এ উপন্যাসে নেই। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস, এমন কি ভ্রমণ কাহিনীর আকারে লিখিত উপন্যাসও একে বলা চলে না অথবা উপন্যাসের আকারে লিখিত ভ্রমণ কাহিনীও একে বলা চলে না। ভ্রমণ কাহিনীর উদ্দেশ্য দেশ দেখা এবং দেশের পরিচয় দেওয়া; শ্রীকান্ত বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ালেও ঘটনাচক্রের দ্বারা চালিত হয়ে সে ঘোরে। তার জীবনের সামনে কোন স্থায়ী উদ্দেশ্য নেই, সাময়িক অজুহাত পেলেই তল্পীতল্পা বাঁধে; তার দৃষ্টিভঙ্গিও পরিব্রাজকের নয়। শরৎচন্দ্র তাই ভারতবর্ষে দেওয়া 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' নাম পরিবর্তন করে নায়কের নামেই এই গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন।)

ঠিক এই কারণেই এতে গল্প বা উপন্যাসের মত কোন আদ্যান্তযুক্ত প্লট নেই; লেখক একে নায়কের জীবন-ঘটিত কতকগুলি বিচ্ছিন্ন স্মৃতিকথার একটা সংকলন মাত্র বলেছেন, সেই ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত স্মৃতিগুলির কয়েকটিকে একটা সূত্রে নতুন করে গেঁথে দিয়েছেন।) কিন্তু এগুলি উপন্যাসেরই উপাদানে পরিণত হয়েছে। প্লট থাক বা না থাক, পৃথকভাবে তা রসোদ্রেক করে। কতকগুলি ঘটনা ও চরিত্র আমাদের আকৃষ্ট করে, বর্ণনা ও বিবৃতিগুলি কাব্যের মত উপভোগ্য হয়। বিক্ষিপ্ত নানা ঘটনা সত্ত্বেও শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর আকর্ষণ-বিকর্ষণমূলক প্রণয় কাহিনী দীর্ঘ উপন্যাসের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় ঐক্য এনে দিয়েছে, দ্রষ্টা, ভোক্তা ও রসস্রষ্টা শ্রীকান্তের জীবনধারাই সমগ্র উপন্যাসের ক্ষেত্র দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের এই উপন্যাস Dickens-এর Picwick Papers-এর মত Thackarey-র উপন্যাসরাজির মত বৈচিত্র্যে

সম্বন্ধ। এগুলি উপন্যাসের Organic Plot নয়, Loose Plot. 'শ্রীকান্ত'-তে তাই Plot না থাকলেও ঐ নায়ক-চরিত্রের এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যে, তা এক গাছি ডোরের মত অবিন্যস্ত ফুলরাশিকে একটি মালার আকার দান করেছে।

কিন্তু, শ্রীকান্তের চরিত্র খুব সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় আকার লাভ করেনি। সে নিজের আলোতে বাইরের সমাজকে দেখেছে। যদিও শ্রীকান্তের এক প্রবল আশাবাদের স্পর্শে অন্তর আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তথাপি শ্রীকান্তের মধ্যে আত্মবিশ্লেষণের বেশ অভাব। সে অন্যকে বিশ্লেষণ করছে, অপরের বিশ্লেষণের আলোতে নিজেকে বিশ্লেষণ করছে না। এই কারণেই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের সকল প্রত্যাশা উপন্যাসটি পূরণ করতে পারেনি। অথচ উপন্যাসটি বিষয়বস্তুতে ও গঠনশৈলীতে আত্মজীবনীমূলক। কারণ শ্রীকান্ত ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে একটি গূঢ় অন্তরঙ্গ যোগ আছে। এক অর্থে এটি শরৎচন্দ্রের আত্মকাহিনী। কিন্তু তা স্বলিখিত জীবন-বৃত্তের মত না। তাঁর স্বপ্নদৃষ্ট আত্ম প্রতিমূর্তির পরিচয় এই গ্রন্থে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। এই ধরণের আত্মকাহিনীও উপন্যাস হয়ে ওঠে। লেখক নিজেকে, বাইরে একটু তফাতে দেখেছেন এবং তার সেই অন্তরের স্বরূপটিকে তিনি আমাদের দৃষ্টিগোচর করাতে চেয়েছেন। নিজেকে দেখার মধ্যে তাই আত্মনিরপেক্ষতা এসে গেছে, নিজের সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য অকপটতা ও বিচার-বিমুখতা—এমন কি, যেন সজ্ঞানতার অভাব রক্ষা করেছে। কোনরূপ আত্মপ্রচার নেই, বিশেষ তেমন কৈফিয়ৎও নেই। যেখানে তার কর্মোদ্যম দেখা গেছে তা ক্ষণেকের জন্য এবং নিজের চরিত্রকে সমালোচনা থেকেও মুক্তি দিয়েছে। যেখানে সে সজ্ঞান আত্মসমালোচনায় মুখর হয়েছে সেখানে আমরা লেখক শরৎচন্দ্রকেই খুঁজে পেয়েছি। সুতরাং কেবল বাইরের ঘটনাগুলির মিলের জন্য নয়, অন্তর্জীবনের মিলের জন্যও 'শ্রীকান্ত'কে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলা চলে।

শ্রীকান্ত জীবন-প্রেমিক। জীবনকে সে নানাভাবে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছে, কিন্তু নিরাসক্ত ও নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে জীবনকে দেখেছে। তার জীবনবৃত্তে যাদের আবির্ভাব ঘটেছে তাদেরও মোহমুক্ত মন নিয়ে গ্রহণ করেছে, কিন্তু অন্তরের প্রীতি ও মাধুর্য প্রকাশিত হয়েছে। 'আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের', এই উপলব্ধি শ্রীকান্তকে ভোগ কামনা থেকে দিয়েছে মুক্তি। কখনও রাজলক্ষ্মী, কখনও কমললতার দিকে চেয়ে সে বুঝতে পেরেছে যে, সে চিরদিনই একটা 'ভবঘুরে', তার বন্ধন নেই, তার হৃদয়

কখনও সত্যকার আশ্রয় চায়নি, সমস্ত বাঁধনকে সে ভয় করেছে; তার বাসনা-কামনায়ও একাগ্রতা নেই, জিজ্ঞাসারও আদি-অন্ত নেই। 'শ্রীকান্ত' চার পর্বেও তাই শেষ হল না বলে মনে হবে। শেষ মানেই অস্থিরতার অন্ত, একটা কোন স্থানে বসে পড়া। শ্রীকান্তের এইটাই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু শরৎচন্দ্রের নয়। শ্রীকান্ত অবন্ধন থেকে বন্ধনে, অতৃপ্তি থেকে তৃপ্তিতে, সমাজ-সংস্কারের বহির্দেশ থেকে তার ভিতরে যেতে পারে না। যদি যায়, তবে তা আর শ্রীকান্তের কাহিনী থাকবে না, শরৎচন্দ্রের জীবন কাহিনী হবে। শরৎচন্দ্রের জীবন-বৃত্ত এবং শ্রীকান্তের জীবন-বৃত্তের এখানেই পার্থক্য। শ্রীকান্ত তাই অপ্রাপ্তি, সমাপ্তি নয়। চিরন্তন জীবন গতির দুঃখ-রসই এর শিল্প সান্ত্বনা।

এই উপন্যাসের কাহিনীতে তাই দুটি ভাগ বা ধারা আছে; একটা লেখকের আত্মজীবন বা আত্মচরিত, আর একটা সেই জীবন সম্বন্ধে চিন্তা বা তার সমালোচনা। প্রথমটি আত্ম-প্রকাশ, দ্বিতীয়টি আত্ম-চিন্তা। শক্তি ও অশক্তি, মোহ ও দুর্বলতা, লোভ ও ত্যাগ, সংস্কারের বশ্যতা এবং তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—এ সমস্তই উপন্যাসে অকপটে প্রকাশ পেয়েছে; এই যে স্ববিরোধী মনোভাব, দুই বিরুদ্ধ আদর্শের প্রতি সমান শ্রদ্ধা, এর জন্য বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নেই। এই সকল কারণেই আমরা মনে করি, শ্রীকান্তের কাহিনী শরৎচন্দ্রেরই অন্তরঙ্গ-জীবনের কাহিনী, শ্রীকান্ত শুধুমাত্র একটা ঔপন্যাসিক চরিত্রই নয়। এবং অপরাপর চরিত্রগুলি অর্দ্ধেক বাস্তব, অর্দ্ধেক কল্পনা। ঘটে যা তা সব সত্য নয়। শরৎচন্দ্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজস্ব ভাবদৃষ্টি মিলিয়ে, এই সকল চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। শ্রীকান্ত তাই Robinson Crusoe কিংবা David Copperfield-এর মত আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস হয়ে উঠেছে। শ্রীকান্ত বক্তা ও দ্রষ্টা, সেইজন্য সে আর সকলকে বর্ণনা করেছে, কিন্তু নিজেকে বর্ণনা করতে পারেনি; ঘটনাস্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। শ্রীকান্ত সর্বদাই নিজেকে আড়ালে রেখেছে যাতে তার সংস্পর্শে যে-সব মানুষ বা ঘটনা ভীড় করে আসছে তারা তার প্রভাবে বিকৃত না হয়।

'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের স্ব-লিখিত জীবন কাহিনী নয় বলেই এর মধ্যে লেখক নিজেকে যথাসম্ভব নির্লিপ্ত রেখে অতি সহজ ও সরলভাবে আত্মকাহিনী বলে গেছেন। এর মধ্যে তাই অমূর্ত শরৎচন্দ্রকে পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্র অপরকে যেমন করে জেনেছেন, নিজের মনোভাবের যে পরিচয় পেয়েছেন তাই অকপটে বর্ণনা করেছেন। অতীতের স্মৃতি যখন শ্রীকান্তের মানসপটে ভেসে ওঠে তখন শ্রীকান্ত প্রৌঢ়। শরৎচন্দ্রও উনচল্লিশ বছর বয়সে 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্ব লিখতে

বসেন। যৌবনে যে মন ও অনুভূতি নিয়ে জগৎকে দেখা যায়, তা প্রৌঢ় বয়সে থাকে না। তাই এক দিক দিয়ে এই উপন্যাস শরৎচন্দ্রের আত্ম-সমীক্ষা। উপন্যাসে নানান্ ঘটনার মধ্যে শ্রীকান্ত নিজের অনুরাগ-বিরাগ, মোহ ও দুর্বলতা উদ্ঘাটিত করে নিজেকে প্রকাশ করেছে, তাই এই কাহিনীকে নিছক কল্পিত কাহিনী বলে মনে হবে না। কিন্তু আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের সকল প্রত্যাশা পূরণে 'শ্রীকান্ত' অক্ষম হলেও, বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস রচনার প্রথম প্রয়াস হিসাবে নিশ্চয়ই সার্থক।

আত্মজীবন নির্ভর উপন্যাস ছাড়াও বহু লেখক যে নিজেকে এবং নিজের দেখা পারিপার্শ্বিক চরিত্রগুলিকে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কৌশলে প্রবেশ করান, তা পরবর্তী পর্যায়ে দেখাবার চেষ্টা হ'ল।*

*এই প্রবন্ধটি রচনায় আংশিক সাহায্য নিয়েছি মোহিতলাল মজুমদারের 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের 'আত্মকাহিনী বনাম উপন্যাস' পর্যায় থেকে।

সৃষ্টির অন্তরালে স্রষ্টা

লেখকের জীবন-কথার যা প্রকাশযোগ্য তা কি
তার লেখার বাইরে বিশেষ কিছু থাকে ?—শরৎচন্দ্র

সাহিত্য একটি শিল্প সৃষ্টি কিন্তু মানবজীবন এর উপাদান। মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা এবং বহু বিচিত্র বাসনা-কামনাই সাহিত্যশিল্পী তাঁর রচনার মধ্যে রূপায়িত করে তোলেন। পারিপার্শ্বিক প্রভাবকে সাহিত্যিক যেমন অস্বীকার করতে পারেন না, তেমনি অস্বীকার করতে পারেন না নিজের জীবনকেও। সাহিত্যে তাই জীবন আছে, সমাজ আছে, মানব চরিত্র আছে —কিন্তু তা সত্ত্বেও সাহিত্য এদের যথার্থ অনুকরণ নয়। কোন শিল্পই বাস্তবের অনুলিপি নয়। তবুও বস্তুকে নিয়েই শিল্প, কেবলমাত্র শিল্পের জন্য শিল্প নয়।

তাই, বহু সাহিত্যিকই যে চরিত্র দেখেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত-

প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে তার যে পরিণতি দেখেন, তাই লেখেন। অনেকেই লেখেন বা লিখেছেন, শরৎচন্দ্র বহু উপন্যাসে যেমন তাঁর ভাগলপুরের মামার বাড়ি বসবাসকালীন ঐ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন, তেমনি আমরা লক্ষ্য করেছি, প্রখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির রচনাতেও একটি বিশেষ অঞ্চলের প্রতিবেশ ও কথাবার্তা বেশ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তারাশঙ্করও একাধিক উপন্যাসে তাঁর শৈশবের বিচরণের ক্ষেত্র বীরভূম-লাভপুর অঞ্চলের প্রতিবেশটি অবিকল ফুটিয়ে তুলেছেন। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'য় যে পারিবারিক চিত্র আছে, সেটি নাকি নদীয়া জেলার বাঘ-আঁচড়া গ্রামের সত্য ঘটনা। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র নিশ্চিন্দিপুর আষাঢ়ুর ঘাট বারাকপুর, যা এখন বনগ্রামের কাছাকাছি। রমেশ দত্তর 'সমাজ ও সংসার'-এ রাঢ়ের পল্লী অঞ্চলের পটভূমিকায় অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবা বিবাহের কাহিনী আঁকা হয়েছে। অঞ্চলের প্রতিবেশ বা কথাবার্তা ছাড়াও লেখক নিজেকেও বহুস্থানে কৌশলে প্রকাশ করে থাকেন। তাঁদের দেখা চরিত্র এবং আত্ম-প্রকৃতিও সাহিত্যিক রূপ নিয়ে সুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠে। এবং তা উপন্যাস হয়, কিন্তু আত্ম-জীবনী হয় না; যেহেতু, তাতে তাঁরা নিজেকে অথবা অপরকে বাস্তব ভিত্তির মধ্যে দিয়ে কল্পনার আশ্রয়ে প্রকাশ করেন।

বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' যেন অনেকটা লেখকের নিজের কথা। বিভূতিভূষণের কথায়, 'সে ছিল অনেকখানিই আমার সঙ্গে জড়ানো।' সমারসেট মমের (Somerset Maugnam) কয়েকটি গ্রন্থ মমের জীবনীর উপযোগী তথ্যে সমৃদ্ধ। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস—'Of Human Bondage' এক হিসাবে আত্মজীবনীমূলক। এই উপন্যাসে মম নিজের বাল্য ও যৌবনকে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন। Philip Carey চরিত্রটি তাঁর নিজেরই প্রতিকৃতি। আত্ম-জীবনী নয়, তবে আত্ম-জীবনীমূলক উপন্যাস। মমের 'Razors' Edge' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'এই উপন্যাসে আমি কল্পনার আশ্রয় নিইনি, যাঁরা এখনও জীবিত আছেন, অস্বস্তি ও অশান্তির হাত থেকে তাঁদের নিষ্কৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থের চরিত্রাবলীর নাম কাল্পনিক।' টলষ্টয়ের বিখ্যাত গ্রন্থ 'যুদ্ধ ও শান্তি' (War and Peace) তে পীয়র ও আঁদ্রে চরিত্র লেখকের নিজের জীবনেরই অনুকৃতি; রোসটভ আর মেরী বোলনস্কায়া চরিত্রে টলষ্টয়ের পিতা এবং মাতার চরিত্র রূপায়িত। আর 'আনা কারেনিনা'র লেভিনের চরিত্র মনে করিয়ে দেয় তাঁরই উচ্ছৃঙ্খল ভাই ডিমিট্রিকে। তেমনি আত্ম-জীবনীমূলক ছাপ পাওয়

যাবে ডস্টয়েভস্কীর 'The Gambler' উপন্যাসে। আর্নেষ্ট হেমিংওয়ের বাল্য জীবনের সুগভীর ছাপ পড়েছে তাঁরই সৃষ্ট চরিত্র নিক এডামস-এর মধ্যে। এদিক দিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্র যেমন একই দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন বিভিন্ন উপন্যাসে, হেমিংওয়ের নায়ক নিক সর্বত্র ঘুরে ফিরে এসেছে অন্য নামে, অন্য গ্রন্থে। ডি এইচ. লরেন্স যেভাবে পৃথিবী দেখেছিলেন, হেমিংওয়ে সেইভাবে নিজের চোখে জগৎকে দেখেছেন, প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে। জীবনে তিনি পর্যায়ক্রমে মুষ্টিযোদ্ধা, গভীর জলের মৎস শিকারী, পশু-শিকারী এবং দুর্ধর্ষ সমর সাংবাদিকের কাজ করেছেন। এই অভিজ্ঞতাই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। শরৎচন্দ্রের মতই লেখকের নিজের আদর্শে রচিত আর এক বিশ্ব-বিখ্যাত সাহিত্যিক তাঁর উপন্যাসের নায়কদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি নুট হামসুন। ১৯শ শতকের লেখকগণ সাধারণতঃ তাঁদের পরিচিত চরিত্রকেই উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। টুর্গেনিভ স্বীকার করতেন যে বাস্তবে একটা কোন চরিত্র না পেলে স্বাভাবিক চরিত্র সৃষ্টি সম্ভব নয়। ফ্লবেয়ার বলেছিলেন, 'মাদাম বোভারী? সে তো আমি নিজেই।' বাস্তবিকই লেখক অংশত নিজেকেই সৃষ্টি করে থাকেন। ইবসেন বার্ধক্যে পৌঁছে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সমস্ত জীবন তিনি একটা একটানা অশান্তির মধ্যে কাটিয়েছেন। তাঁর সমস্ত নাটকই সেই একটি মাত্র মানুষের অশান্তির কথাই বলেছে। রোমাঁ রোলাঁর মহৎ উপন্যাস 'জাঁ ক্রিস্তফ'-এর মধ্যে রোলাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব অনেকখানি প্রতিফলিত হয়েছে। 'জাঁ ক্রিস্তফ'-এর সঙ্গে 'শ্রীকান্ত'র অনেকটা তুলনা চলে। আর, রোমাঁ রোলাঁ স্বয়ং শরৎ-সাহিত্যের একজন অনুরাগী পাঠক।

পরিবেশ বা অঞ্চলের প্রভাব যেমন অনেক লেখকের লেখাতে পড়ে তেমনি এই ধরণের উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের মধ্যে লেখকের ছায়া-মূর্তিটি লক্ষ্য করা যায়। 'ডেভিড কপারফিল্ড' পড়লেই যেমন ডিকেন্স-এর কথা মনে পড়ে, তেমনি ফিলিপ মনে করিয়ে দেয় সমারসেট মমকে। অপু যেমন বিভূতিভূষণকে চিনিয়ে দেয় তেমনি শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রকে। শরৎচন্দ্রও কালিদাস রায়কে বলেছিলেন, 'আমার যা কিছু বলবার, তার সবই আমার বই-এ আছে, এত বেশী আত্মকথা ও অভিজ্ঞতার কথা কারো লেখায় পাবে না।'

কথাটি যে কত সত্য তা আমরা পরবর্তী 'সৃষ্টির অন্তরালে শরৎচন্দ্র' পর্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনার চেষ্টা করব। ঠিক এই কারণে ডিকেন্স-এর 'ডেভিড

কপারফিল্ড' গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছি যার মধ্যে লেখক-জীবন কেমন অদ্ভুতভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এটিও উপন্যাস, কিন্তু ডিকেন্স ও ডেভিড যেন অভিন্ন।

সৃষ্টির অন্তরালে শরৎচন্দ্র

'আমার বই থেকে যদি কেউ আমার অন্তর্জীবনের কথা উদ্ধার করতে না পারে, তাহলে সে আমার কথা লিখতে পারবে না।'

—শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্র বাস্তব থেকেই চরিত্র সৃষ্টি করতেন। সেই বাস্তব তাঁব অভিজ্ঞতারই ফসল ছিল। এই সকল বাস্তব অভিজ্ঞতার মাল-মশলা সাহিত্যে রূপান্তরিত হয়ে শরৎ-সাহিত্য অপূর্ব বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

শরৎচন্দ্র নিজেই অনেক সময় বলতেন, 'আমার উপন্যাসেব অধিকাংশ চরিত্র এবং ঘটনা আমার স্বচক্ষে দেখা।' 'আমার স্মরণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ।' অথবা 'আমার মেমারিটা বড্ড ভাল। ছেলেবেলা থেকে ইনট্যাকৃট আছে।' সত্যিই, এর উপব তাঁর নির্ভরতা ছিল অসাধারণ এবং সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহের পদ্ধতিও ছিল অভিনব। তাঁর লেখায়—তিনি যা দেখেছেন, যে দেশে ঘুরেছেন, যাদের সঙ্গে পরিচিতি হয়েছেন—তা সবই এক নবতর বিচিত্র উপকরণ রূপে ফুটে উঠেছে।

তবে, অনেক জায়গায় শরৎচন্দ্র লেখার মধ্যে শিল্পিত আবরণের আড়ালে আত্মগোপন করতে পারেন নি। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটিই তার বড দৃষ্টান্ত। যাঁবা তাঁকে ঠিকমত চিনতেন, তাঁরা লেখার মধ্যে অনেক সময়েই তাঁকে ধরে ফেলতেন। আবার অনেক সময়ে চরিত্রগুলির স্থান আর পারিপার্শ্বিক অবস্থা দুটিরই পরিবর্তন ঘটায়, সেগুলি ধরি ধরি করেও ধরতে সাহস হয় না। এই পর্যায়ে কেবলমাত্র 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটি বাদ দিয়ে মোটামুটিভাবে সমগ্র শরৎ-সাহিত্যের বাস্তব দিকগুলি সংক্ষেপে উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হব। অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই তাঁর দেখা পথ-ঘাট, নদ-নদী, মন্দির-মসজিদ, স্টেশন-গ্রাম,

চরিত্র এমন কি পরিচিত আত্মীয়-পরিজনের ব্যবহৃত নাম এবং আত্মগোপনকারী লেখককে খুঁজে দেখবার চেষ্টা করব।

দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্র তাঁর বাল্য ও কৈশোর মিলিয়ে প্রায় বারো বছর বসবাস করেছিলেন। তাই শরৎচন্দ্রের দেবানন্দপুর ত্যাগের পরও বহু বছর পরে প্রকাশিত গল্প-উপন্যাসে এই গ্রামের আশে-পাশে অবস্থিত গ্রাম-নদী-শহর-গঞ্জ, মন্দির-মসজিদ্-বিদ্যালয়, হাসপাতাল, সাঁকো এবং পথের যত্রতত্র উল্লেখ দেখতে পাই। এই সকলই তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছে।

দেবানন্দপুর গ্রামের সরস্বতী নদীর বর্ণনা রয়েছে 'বিরাজ বৌ' এবং 'দত্তা' উপন্যাসে। বিরাজ বৌ তার জীবনের দুর্যোগের আর দুর্ভাগ্যের রাতে হাতে পায়ে কাপড় জড়িয়ে যার কোলে আশ্রয় নিয়ে মুক্তি পেতে চেয়েছিল এই দুঃখময় সংসার থেকে, তা হচ্ছে ঐ সরস্বতী নদী এবং 'দত্তা' উপন্যাসেব নায়ক নরেন এর তীরে বসেই পুঁটিমাছ ধরেছিল। 'বাল্যকালের গল্প'তে এই অঞ্চলে সুপরিচিত কুন্তী নদীর কথাও পাওয়া যায়। দেবানন্দপুরের রাস্তার বর্ণনা 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে তো আছেই, এছাড়া 'বিলাসী' গল্পতেও এই রাস্তার কথা বলা হযেছে। 'দত্তা' উপন্যাসে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের কথাও উল্লেখিত হয়েছে। গ্রামের বাইরে স্কুলে যাবার পথে শরৎচন্দ্র ও বন্ধুরা 'মুড়া অশ্বত্থতলা' নামে একটি স্থানে সমবেত হতেন। এই স্থানটিই উপন্যাসে 'ন্যাড়া বটতলা' নামে চিহ্নিত হয়েছে। তা ছাড়াও এই উপন্যাসটিতে দেবানন্দপুর গ্রামের আশেপাশের—যেমন খাঁয়েদের গলায়-দড়ের বাগান, সরস্বতী নদীর বাঁশের সাঁকো, কৃষ্ণপুরের কথা বারবার এসেছে দেখা যায়।

পাণ্ডুয়া, উত্তরপাড়া, তারকেশ্বর, হুগলী প্রভৃতি স্টেশন এবং বাডল, নলডাঙ্গা, কৃষ্ণপুর, হলুদপুর, বাবুগঞ্জ, নারায়ণপুর, রাজহাট, হরিপাল, সপ্তগ্রাম ও হাতিপোতা ইত্যাদি গ্রামের কথা অথবা সেই স্থানের সামান্য বর্ণনা তাঁর 'বিরাজ বৌ' 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'পণ্ডিতমশাই', 'পল্লীসমাজ', 'অরক্ষণীয়া', 'দেবদাস', 'দত্তা', 'শুভদা', 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে এবং 'বিন্দুর ছেলে', 'মেজদিদি', 'নিষ্কৃতি', 'রামের সুমতি' প্রভৃতি গল্পের মধ্যে পাওয়া গেছে। 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসের চরিত্র নীলাম্বর ও পীতাম্বরের বাড়ি দেখানো হয়েছে হুগলী জেলার সপ্তগ্রামে। হুগলী হাসপাতালেরও উল্লেখ পাওয়া যায় এই উপন্যাসটিতে—এখানেই বিরাজের চিকিৎসা হয়েছিল। অসুস্থ স্বামীর রোগমুক্তিতে দেবতার চরণে বিরাজ যে পুজো পাঠায়, তাও লাগোয়া গ্রাম বারেকপুরের পঞ্চাননতলা।

অভাবের কঠিন দিনগুলিতে স্বামীর অগোচরে বিরাজ তার সাধ্যমত উপার্জনের জন্য যে মাটির ছাঁচ তৈরী করে পাঠায় সে স্থান হচ্ছে মগরার পিতলের কারখানা। গ্রামের গোপাল চক্রবর্তীর বৃদ্ধ পিতার গঙ্গাযাত্রা করানো হয়—ঐ ত্রিবেণী-তীর্থ-পথে। বিরাজ তার দুঃখ-লাঞ্ছনার পর আবার তার আদরের পুঁটি আর তার স্বামীকে ফিরে পায়—তারকেশ্বরের পথপ্রান্তে। শুধু 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসেই তারকেশ্বরের উল্লেখ পাওয়া যায় তাই নয়, 'দত্তা', 'পল্লী-সমাজ'-এও তারকেশ্বরের কাহিনীর কিছুটা অংশ বর্ণিত হয়েছে। সুদূর ব্রহ্মদেশে অবস্থান করেও লেখার সময়ে এই সমস্ত কিছুই তাঁর বিস্মরণ ঘটেনি। দেশ-ছাড়া মানুষের পক্ষেই নিজের গ্রামের এবং তার নিকটবর্তী অঞ্চলের সমস্ত স্মৃতি বিশেষ করে মনে পড়ে। তাই দেখি 'পল্লীসমাজ'-এর নায়ক রমেশ তার বাল্যের ভালবাসার পাত্রী বিধবা নায়িকা রমাকে নতুন করে আবিষ্কার করে তারকেশ্বরের মহামিলন ক্ষেত্রে। 'রামের সুমতি' গল্পের রাম বৌদিদি নারায়ণীর কাছে অভিমান করে 'বাবার থানের উদিকে' (তারকেশ্বরের ওদিকে) চলে যেতে চায়। শরৎচন্দ্র 'পল্লীসমাজ'-এর দশম পরিচ্ছেদ শুরু করেন, তারকেশ্বরের দুধপুকুরের সিঁড়িতে রমা ও রমেশের সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে। তারকেশ্বরে এ দুধপুকুর শরৎচন্দ্রের পূর্ব থেকেই দেখা ছিল। দেবানন্দনপুর গ্রামের বিশালাক্ষী ঠাকুরের কথা 'মেজদিদি' গল্পে পাওয়া গেছে।

ভাগলপুরে যখন শরৎচন্দ্র ছিলেন তখনও যে তাঁর নিজের গ্রামের বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কথা মনে পড়ত, তা 'দেবদাস' পড়লেই ধরা পড়বে। দেবদাসের বাড়ি ছিল হুগলী জেলায়। পার্বতীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য সে ঐ জেলার পাণ্ডুয়া স্টেশনে নেমে পড়েছিল। পার্বতীর বিয়ে হয়েছিল বর্দ্ধমান জেলার হাতিপোতা গ্রামের জমিদারের সঙ্গে। ব্যাণ্ডেল বাজারের নিকটেও হাতিপোতা নামে একটি স্থানের সন্ধান মেলে। 'বিন্দুর ছেলে' গল্পে যাদবের পিসতুতো বোন এলোকেশীর শ্বশুরবাড়ি ছিল উত্তরপাড়ায়। 'বৈকুণ্ঠের উইলে' হুগলীর গঙ্গাতীরের বাবুগঞ্জ শহরের উল্লেখ আছে। হুগলীর আদালত কক্ষও বাদ পড়েনি। 'নিষ্কৃতি' গল্পের ভবানীপুরের উকিল আত্মভোলা গিরিশ তার খুড়তুতো ভাই রমেশের স্ত্রী ছোটবৌ শৈলজাকে গ্রামের সম্পত্তি লিখে নিষ্কৃতি পেতে চায় যেখানে দাঁড়িয়ে, সেটি হুগলীর আদালত কক্ষ। 'বৈকুণ্ঠের উইল' গল্পের বৈকুণ্ঠের ছোট ছেলে বিনোদ পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার সংবাদে যখন বাড়ি ফেরে না, তখন বাড়ির কোচোয়ান বার বার গাড়ি নিয়ে গিয়ে যে স্টেশন থেকে বিফল হয়ে ফিরে আসে তার নাম

চুঁচুড়া স্টেসন।

'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে বাড়ল, নলডাঙ্গা ও বদ্দিবাটি গ্রাম ও স্টেশনের উল্লেখ আছে। 'শুভদা'তে হলুদপুর (হরিদ্রাপুর) ও নারায়ণপুরের এবং 'অরক্ষণীয়া'য় হরিপাল গ্রামের উল্লেখ আছে। দেবানন্দপুরের আশেপাশেই এই গ্রামগুলির অবস্থিতি। তবে শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' উপন্যাসে বারেকপুর গ্রামকেই 'দিঘড়া' গ্রাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিন বন্ধুর অন্যতম জগদীশ অন্য দুই বন্ধুর সাথে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে যাবার জন্য 'দিঘড়া' গ্রাম থেকে আসত। তবে দিঘড়া সত্যই আছে এবং তা হুগলী জেলারই কোন গ্রাম।

এই গ্রাম, শহর, হাসপাতাল, পথ ইত্যাদির কথা ছাড়াও তাঁর ব্যক্তি জীবনের ছাপও অনেক লেখাতেই ফুটে উঠেছে। যেমন, দেবদাস চরিত্রটির মধ্যে শরৎচন্দ্রের নিজের জীবনের খণ্ডাংশের ছায়াপাত ঘটেছে। দেবদাসের বাল্য-জীবনের উপর শরৎচন্দ্রের দেবানন্দপুরে অতিবাহিত বাল্য-জীবনের ছাপ রয়েছে এবং দেবদাসের উচ্ছৃঙ্খল জীবন-কাহিনী শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরে অতিবাহিত তৎকালীন উচ্ছৃঙ্খল জীবনেরই প্রতিকৃতি হয়ে উঠেছে। শরৎচন্দ্র নিজেও বলেছেন, বইখানি তাঁর মাতাল অবস্থায় লেখা হয়েছিল।

'দেবদাস' ছাড়াও শরৎচন্দ্রের প্রথম যৌবনে লিখিত 'অনুপমার প্রেম' ও 'শুভদা'তেও তাঁর নিজের জীবনের ছাপ অনেকখানি পড়েছে। 'অনুপমার প্রেম' গল্পটির মধ্যে তাঁর নিজের এবং তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কোন প্রিয়জনের ('রাজলক্ষ্মী' পর্যায়ে তাঁর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে) চরিত্রের ছায়াপাত হয়েছে। বথাটে, নেশাখোর ললিতমোহনের চরিত্র তাঁর ভাগলপুরের জীবন যাপনের সময়কার চরিত্রের অনুরূপ। অনুপমার মধ্যেও তাঁর স্নেহের পাত্রী এক বিধবা নারী চরিত্রের ছাপ আছে। সেই বিধবা নারীটির একটি নামও নাকি ছিল অনুপমা।

'শুভদা' উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের পারিবারিক জীবনের দৈনন্দিন দুঃখ-কষ্টের মর্মান্তিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই গ্রন্থে তাঁর বাল্য-জীবনের দুঃখের চিত্র স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়েছে। কারণ, গ্রন্থের চরিত্রগুলির সঙ্গে লেখকের তদানীন্তন পরিবারবর্গেরও একটা মোটামুটি সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল ডিহরীতে চাকরী পেয়েছিলেন এবং দু বছর তিনি সেখানে চাকরি করেও ছিলেন। শরৎচন্দ্র ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে, ন বছর বয়সে পিতার সঙ্গে তাঁর কর্মস্থলে যান। ছেলেবেলায় থাকাকালীন স্মৃতিটুকুকেই কাজে লাগিয়েছেন 'গৃহদাহ' উপন্যাসে। এই উপন্যাসের শেষ পর্বটি ঘটিয়েছেন

এই ডিহরীতেই। পরবর্তীকালে এই ডিহরী সম্পর্কে লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে পত্রও লেখেন।

'পল্লীসমাজ' উপন্যাসটি সম্পর্কে শরৎচন্দ্র মুরলীধর বসুকে রেঙ্গুন থেকে একটি পত্রে লিখেছিলেন—'পল্লীসমাজ' আপনাব মন্দ লাগে নাই, বরং ভালই লাগিয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি। বাল্য এবং যৌবনকালটার অনেকখানি পাড়াগাঁয়েই আমার কাটিয়াছে। গ্রামকেই বড ভালবাসি। তাই দূরে বসিয়াও যে দুই চারিটা কথা মনে পড়িয়াছে তাহা লিখিয়াছি।'

শরৎচন্দ্রেব 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসটি রচনার সঠিক ইতিহাস জানা না গেলেও উক্ত গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি হরিহর শেঠ, অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল এবং বাগেশ্বর বসুর কাছে গ্রন্থেব উপাদান সংগ্রহ সম্পর্কে গল্প করেছিলেন। তিনজনকেই বলা গল্পের মধ্যে সামান্য হেরফের থাকলেও এ কথা ঠিক যে, শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসটির উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ রমণীর কথাই ভেবেছিলেন এবং কোথাও না কোথাও তাঁর বাড়িতে স্ব-পাক আহার করে দু-একদিন কাটিয়েছিলেন।

ঢাকায় রমেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে 'পথের দাবী'র কথায় শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—'ব্রহ্মদেশে গোপনে কোকেনের ব্যবসা চালাত, এরূপ একটি দলের কথা আমি শুনেছিলাম। দলের কর্ত্রী ছিল একটি স্ত্রীলোক। এবা সুমাত্রা ও যবদ্বীপে ব্যবসা চালাত। এ থেকেই 'পথের দাবী'র সুমিত্রার সৃষ্টি। আর সন্ত্রাসবাদী দলের অনেকের সঙ্গেই আমার পরিচয় ছিল। তাঁদের জীবনের ভিত্তির উপরেই আমার সব্যসাচীর সৃষ্টি।'

চন্দননগরে এক আলাপ-সভায় 'প্রবর্তক', কার্তিক ১৩৩৭) 'পথের দাবী' সম্পর্কে আলোচনায় শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, '... সমস্ত Island গুলো (বর্মা, জাভা, বোর্ণিয়ো) ঘুরে বেড়াতাম। সেখানকার লোক অধিকাংশই ভালো নয়—smugglers, এই সব অভিজ্ঞতার ফল—'পথের দাবী'।'

শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন' গ্রন্থের ৫৪-৫৫ পৃষ্ঠায় 'পথের দাবী'র বাস্তবতা সম্পর্কে লিখেছেন, "বাঙলার বিপ্লবীদের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলেই শরৎচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত 'পথের দাবী' এই সময়ে রচনা করেন। অনেকে মনে করেন যে কোন বিশেষ বিপ্লবী নেতার জীবনের ছায়াবলম্বনে শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী'র নায়ক সব্যসাচীর চরিত্র চিত্রণ করেছেন। এ ধারণা সত্য নয়। সমস্ত বিপ্লবীদের জীবনের কাহিনী শুনে এবং অনেকের সঙ্গে মেলামেশা করে তিনি আপন কল্পনার দ্বারা সব্যসাচীর মধ্যে বাঙলার

বিপ্লবীদের একটি Type সৃষ্টি করেছিলেন। তবে কয়েকজন বিপ্লবী নেতার জীবনের ছায়া বিশেষ করে সব্যসাচী চরিত্রে পড়েছে। দুর্জয় সাহস, অসাধারণ শারীরিক শক্তি, অসীম স্নেহপ্রবণতা ও ক্ষমতাশীলতা—এইগুলি নিয়েছেন ৺যতীন মুখার্জীর জীবন থেকে, ছদ্মবেশ ধারণের অসাধারণ নিপুণতা ও গিরীশ মহাপাত্ররূপী সব্যসাচীর খুঁড়িয়ে চলা নিয়েছেন ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের জীবন থেকে, পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরে বেড়ানো ও বৈপ্লবিক কেন্দ্র সংগঠনের দিকটা নিয়েছেন ৺রাসবিহারী বসু ও ৺নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের (এম, এন, রায়) জীবন থেকে, নানা দেশের নানা ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের ব্যাপারটা নিয়েছেন ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও তারকনাথ দাস প্রভৃতির জীবন থেকে। দুই হাতে অব্যর্থ লক্ষ্যে রিভলবার ছোঁড়ার দক্ষতার মধ্যে সতীশ চক্রবর্তীর এবং আরও কয়েকজনের ছাপ আছে।"

'দত্তা' উপন্যাসটি 'বিজয়া' নামে যখন শিশিরকুমার ভাদুড়ী অভিনয় করেন তখন তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের রূপসজ্জা নিয়ে রাসবিহারীর চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শিশিরবাবু নাকি বলেছিলেন, শরৎচন্দ্র রামানন্দকেই রাসবিহারী হিসাবে কল্পনা করে চরিত্র এঁকেছেন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের খুব ভাল relation ছিল না।

শরৎচন্দ্রের জীবনে তাঁর পিতা-মাতার ও হিরন্ময়ীদেবীর সান্নিধ্য বা সংস্পর্শ যেমন ঘটেছিল নিশ্চয়ই অন্য কেউ তেমনভাবে শরৎ-সান্নিধ্য লাভ করে নি। সুতরাং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কি এঁদের প্রতিকৃতি কোন চরিত্রের মধ্যে প্রকাশ পায়নি? পেয়েছে নিশ্চয়ই। ঘর থেকেই মানুষের সহৃদয়তার চর্চার শুরু হয়, শরৎচন্দ্রের বেলাতেও এ কথা কেন সত্য হবে না?

'শ্রীকান্ত'র শাহজী ও 'বড়দিদি'র সুরেন্দ্রনাথ—শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট এই দুটি চরিত্রে তাঁর পিতাকে অনেকখানি ফুটিয়ে তুলেছেন। মতিলালের চাকুরি অনুসন্ধানের কাহিনীটির ছবি দেখতে পাওয়া যাবে 'বড়দিদি' উপন্যাসের সুরেন্দ্রনাথের চাকুরি খোঁজার সশঙ্ক প্রচেষ্টার করুণ ব্যর্থতায়। যার কাছে চাকুরি পাওয়া যেতে পারে তার সঙ্গে কপালগুণে দেখা না হওয়াটাই যেন চাকুরি না পাওয়ার দুঃখের মধ্যেও একটা বড় স্বস্তি।

মাতা ভুবনমোহিনী দেবী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না; তবে অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না, শরৎ সাহিত্যের অপরিমেয় দরদ, ভাবাবেগের সমৃদ্ধি ও আন্তরিকতাগুণের মূলে ভুবনমোহিনী দেবীর প্রভাব কাজ করেছে। বাঙ্‌লা দেশের নারীজাতিকে যে শরৎচন্দ্র বিশেষ মর্যাদা ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে

দেখেছিলেন তারও মূলে তাঁর মায়ের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত থাকা অসম্ভব নয়। এই ভুবনমোহিনীকেই কি আমরা তাঁর সৃষ্ট অন্নপূর্ণা, নারায়ণী, সিদ্ধেশ্বরী, বিশ্বেশ্বরী প্রভৃতি নারীচরিত্রগুলির মধ্যে দেখতে পাই না ?

'গৃহদাহ' উপন্যাসটিতেও কল্পনার সাথে বাস্তবতার অপূর্ব মিশ্রণ ঘটেছে। ডিহরীর কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এছাড়া মৃণালের শাশুড়ীর মৃত্যু-কামনার দৃশ্যটি যে সত্য ঘটনাকে অবলম্বন করে লিখিত তা অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা'তেই জানিয়েছেন। মানুষ কি রকম আকুল হয়ে মৃত্যু প্রার্থনা করে তার একটি সত্য ঘটনা শরৎচন্দ্র অবিনাশবাবুকে বলেছিলেন।

শেষ বয়সে শরৎচন্দ্র ছোট ছেলেদের জন্য গোটাকয়েক গল্প লিখেছিলেন, তার মধ্যে 'লালু'র তিনটি গল্পই রাজেন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা। কিন্তু 'ছেলে-ধরা' ও 'বছর পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী' গল্প দুটিতে শরৎচন্দ্রের নিজের জীবনের কিছু অভিজ্ঞতার ছাপ আছে; কারণ 'ছেলেধরা' গল্পের শেষে তাঁরই মন্তব্য—'ঘটনাটি ছেলে ভুলানো গল্প নয়, সত্যই আমাদেব ওখানে ঘটেছিল।'

শরৎচন্দ্র তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের চবিত্রগুলির নাম পর্যন্ত তাঁর নিজের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের নামে রূপ দিয়েছেন। যেমন 'গৃহদাহ'র কেদার-বাবু তাঁর মাতামহের নাম, 'চরিত্রহীন' এর সতীশ ভাগলপুরবাসী এক বন্ধুর নামে, উপেন নামটি তাঁর মামার নামে ব্যবহৃত। 'বড়দিদি'র সুরেন্দ্র, 'পরিণীতা'র গিরিণ এবং বিপ্রদাস প্রভৃতি নামও তাঁর মামাদের নামে।

'শেষ প্রশ্ন'র রাজেন শরৎচন্দ্রের কৈশোর ও প্রথম যৌবনের বন্ধু 'রাজু'র কথা মনে করিয়ে দেয়। আর বাস্তবিকই রাজেনের মধ্যে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতম বিপ্লবীবন্ধু রাজেন্দ্রনাথ মজুমদারের (ইন্দ্রনাথের) স্মৃতি মিশে রয়েছে। হরেন ও অক্ষয়ও শরৎচন্দ্রের পরিচিত দুই বন্ধুর নাম। হাওড়ায় যখন শরৎচন্দ্র কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন এক সময় হরেন্দ্রনাথ ঘোষ ছিলেন সেক্রেটারী, আর অক্ষয়বাবু একজন অধ্যাপক বন্ধু। ব্রহ্মদেশ থেকে ফিরে আসবার পব, বাজে শিবপুরে থাকাকালীন অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিশেষ পরিচয় ঘটে। তাঁর বাসার অদূরবর্তী শিবতলা লেন নিবাসী প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন ইনি। শরৎচন্দ্র এঁর নাম ও প্রকৃতি অবলম্বনে 'শেষ প্রশ্ন'র এই চরিত্রটি সৃষ্টি করেন, অবশ্যই মূলের উপর কল্পনার তুলি বুলিয়েছেন।

'শেষ প্রশ্ন' লেখবার পূর্বে শরৎচন্দ্র একবার আসাম গিয়েছিলেন। এবং সেখানেই কমলের জন্ম বলে মনে হয়। এ ছাড়াও উপাদান সংগ্রহের জন্য তিনি আগ্রায় কিছুদিন ছিলেন। সেখানে একজন বাঙালী শিক্ষককে একটি মেয়েকে নিয়ে বসবাস করতে দেখেন এবং লক্ষ্য করেন শিক্ষকটির ওখানে কোন সুনামও নেই। শরৎচন্দ্র একেই শিবনাথ চরিত্রে রূপ দেন এবং আগ্রার পরিবেশ ও তাজমহলের বর্ণনা ও উপন্যাসে স্থান পায়।

শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলার লেখা 'কাশীনাথ' গল্পে যে নায়কের কথা আছে তার নামকরণ করেন তাঁরই বাল্যাবস্থার পাঠশালার প্যারী পণ্ডিতের পুত্রের নামে। কাশীনাথ ও বিপ্রদাস ব্যতীত আর কোন প্রত্যক্ষ নাম গ্রন্থের নামকরণে ব্যবহৃত হয়নি। বিপ্রদাস অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ মামা প্রায় চুরাশী বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁকে শরৎচন্দ্র বাস্তবে যেমন দেখেছেন গ্রন্থে প্রায় তদ্রুপই চিত্রিত করেছেন।

এই বিপ্রদাসের পিতা অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের মাতামহের নামই কেদারনাথ। তাঁরা ছিলেন আদর্শবাদী এবং হিন্দুধর্মের প্রতি একান্ত অনুরক্ত। সেই পরিচয়ের কতকটা আভাস শরৎচন্দ্রের এই উপন্যাসের মধ্যেই পাওয়া গিয়েছে। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'শরৎ-পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন, "শরৎচন্দ্রের বহু চরিত্রের বাস্তব উপকরণ এই পরিবার থেকে সংগৃহীত বলেই মনে হয়। এই সংগ্রহের কাজ পরিবার ছাড়িয়ে চাকর-বাকর পর্যন্তও ছড়িয়ে গেছে। শরতের 'দেবদাস'-এ ধর্মদাস এই পরিবারের মুশাই চাকর। মুশাই-এর মত এমন বিশ্বাসী প্রভুভক্ত চাকর পাওয়া চিরকালই কঠিন। সে শৈশবে গয়া থেকে এসে এই পরিবারে ভর্তি হয় এবং প্রায় ষাট বৎসর পর্যন্ত চাকরি করে। মুশাইকে অমর করবার জন্যে তাঁর 'দেবদাস'-এ ধর্মদাসকে এঁকেছেন।"

এ ছাড়া সাবিত্রী, কিরণময়ী প্রভৃতি চরিত্রগুলির যে বাস্তব ভিত্তি আছে, তা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনায় আভাসে ইঙ্গিতে কিছু জানা যায়। শরৎচন্দ্র সেইজন্যই বলতেন, 'আমার উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র আমার স্বচক্ষে দেখা।'

নানান ধরণের জীবনের সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তাই গল্প-উপন্যাসে সেই জীবনকে অবলম্বন করে নতুন সাহিত্যরস ও শিল্পাদর্শ তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস শরৎচন্দ্রের স্মৃতকথা বলে অনেকে মন্তব্য করলে শরৎচন্দ্র কালিদাস রায়কে বলেন, 'সকল উপন্যাসই তো

লেখকের স্মৃতিকথা, ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত চরিত্রের মুখে বসানো। সেই সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছে, জেনেছে তাদের কথাও থাকে। লেখক তার অভিজ্ঞতার বাইরের কথা কি উপন্যাসে ঠাঁই দেয়? ঠাঁই দিলে তা রূপকথা হয়, রোমান্স হয়, উপন্যাসের ছদ্মবেশে প্রবন্ধের বই হয়, উপন্যাস হয় না। আমি আমার স্মৃতিকথা শ্রীকান্তর মারফতে—সবটা নয়, অনেকটা বলেছি বৈকি! এ জন্যই সাধারণ পদ্ধতি ত্যাগ করে 'ফার্ষ্ট পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার' এর জবানীতে গোটা বই লিখেছি। এতে মাঝে মাঝে মন্তব্য করবার সুবিধা হয়েছে।'

অথচ বাস্তবের নগ্নতাকে তিনি তাঁর সাহিত্যে কখনই প্রশ্রয় দেননি। Idealism ও Realism সম্পর্কে তাঁর কোনরূপ বিশেষ গোঁড়ামি ছিল না। সত্য, শিব ও সুন্দরে যে কোনরূপ পার্থক্য থাকতে পারে তা তার মনে আসে নি; idealism-এর সঙ্গে realism-এর কোন গগনচুম্বী প্রভেদ তিনি খুঁজে পাননি। তাঁর মতে, রস ও বস্তু—এই উভয় জগতের সমীকরণের ফলেই মহৎ সাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব। শুধু কল্পনাও নয়, শুধু বাস্তবও নয়; এ দুটির সমন্বয়েই রস-সাহিত্য। শরৎ-সাহিত্যেও বাস্তব কেবল বাস্তব হয়েই থাকেনি তা কল্পনার আলোয় রসসিক্ত হয়েছে। বাস্তবে তিনি যা দেখেছেন তা তাঁর প্রতিভাবলে—তাঁর মনের দৃষ্টিতে, বিশিষ্ট ভাবকল্পনায়, হৃদয়ের রঙে ও প্রাণের সুরে সাজিয়েছেন। উদার মান।ধর্মকে—মনুষ্যত্বের মূল নীতিকে—সর্বান্তঃকরণে ও ব্যাপক সহৃদয়তাবশে স্বীকার করে নিয়েছেন বলেই শরৎচন্দ্র বাস্তববাদী হয়েও সত্যকার শিল্পী হতে পেরেছেন।

ডিকেন্‌স ও ডেভিড কপারফিল্ড

"I was born on a Friday," said David Copperfield. In this, and in many another particular, were David and his creator at one. —Arthur Compton-Rickett.

ছবি দু'রকম হতে পারে—ফোটোগ্রাফ এবং চিত্রাঙ্কন। ফোটো তন্ময়—Objectiv , অপর পক্ষে চিত্র মন্ময়—Subjective ; চিত্র সৃজনধর্মী। এখন সাহিত্য যেহেতু সৃজনধর্মী—Creative সুতরাং এখানে Subject তথা লেখকের অভিজ্ঞতার একটা প্রতিফলন থাকবেই। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে হুবহু একই জিনিস ঘটবে। তাহলে তো সেটা ফোটোগ্রাফ হয়ে উঠবে।

দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, বিখ্যাত লেখকদের রচনায় প্রায়ই তাঁদের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে। আমরা, অনুসন্ধিৎসু পাঠকেরা, লেখকের সৃষ্ট চরিত্রগুলির আড়ালের মানুষগুলিকে খুঁজতে বসে যাই। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে সাহিত্যের একটি শাখা এই বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে—কেউ কেউ এ নিয়ে হয়ত ডক্টরেট ডিগ্রীও পেয়ে থাকবেন। বিভূতিভূষণকে 'পথের পাঁচালী'র অপুর মধ্যে অথবা শরৎচন্দ্রকে 'শ্রীকান্তে'র মধ্যে কিম্বা চার্ল্‌স ডিকেন্‌সকে 'ডেভিড কপার্‌ফিল্ডে'র মধ্যে খুঁজে বের করার মধ্যে কৌতূহলী পাঠক তাই গোয়েন্দা উপন্যাসের রহস্যভেদের মত একটা রোমাঞ্চ অনুভব করেন।

'David Copperfield' উপন্যাসটি রচনা শেষ হয়ে গেলে স্বয়ং ডিকেন্‌স তাঁর বন্ধু Forster-কে লেখেন, "If I were to say half what Copperfield makes me feel, how strangely, even to you, I should be turned inside out."

সুতরাং স্বয়ং ডিকেন্‌স সাক্ষী যে, ডিকেন্‌স অনেকটা পরিমাণে ডেভিড ;

অথবা ঘুরিয়ে বললে বলতে হয় ডেভিড অনেকটা পরিমাণে ডিকেন্‌স-এর প্রতিফলন। আমরা অবশ্য ডেভিডকে posthumous child হিসাবে পেয়েছি। ডেভিডের মায়ের সম্পর্কেও জেনেছি, কিন্তু ডিকেন্‌স-এর মায়ের সম্পর্কে বিশেষভাবে জানা যায়নি। শৈশবে মাস ছয়েক চাকরি করার পর ডিকেন্‌সকে তাঁর বাবা ফ্যাক্টরী ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া করে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন কিন্তু তাঁর মা ঝগড়া মিটিয়ে পুনরায় কাজে পাঠাতে চান। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের প্রতি এই অবিচারকে ডিকেন্‌স জীবনে ক্ষমা করতে পারেননি—ভুলতেও পারেননি।

ফ্যাক্টরীর চাকুরি তাঁর অনেকগুলি সাহিত্য কীর্তির ব্যাখ্যার সাহায্য করেছে। তাঁব প্রত্যেক উপন্যাসের কেন্দ্রস্থলে তাঁর মত নিপীড়িত, অত্যাচারিত একটি অসহায় শিশুর দেখা মেলে—Oliver Twist, Little Nell, David, Paul Dombeys, Pip প্রভৃতি তাঁর এই অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা-প্রসূত চরিত্র। (১)

ডিকেন্‌স-এর পিতা ডিকেন্‌স-এর জন্মের (১৮১২ খ্রীঃ) পরও ৩৯ বৎসব জীবিত ছিলেন (১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু)। তাঁর দরিদ্র কেবানী পিতা জন ডিকেন্‌স ঋণভারে জর্জরিত হয়ে হ্যাম্পশায়ার থেকে লণ্ডনে চলে যান। তখন তাঁদের অত্যন্ত খারাপ অবস্থা। এই অবস্থাটা Mr. Micawber-এব চবিত্রে খানিকটা প্রতিফলিত হয়েছে। তখন তাঁদের এমন অবস্থা যে ছোট্ট ডিকেন্‌সকে মাত্র এগারো বৎসর বয়সে একটা কামারশালায় সাপ্তাহিক ছয় শিলিং-এর বিনিময়ে কাজ নিতে হয়। ডিকেন্‌স-এর সৃষ্ট ডেভিডকেও মাত্র দশ বৎসর বয়সে Murdstone and Grinby-তে সপ্তাহে ছয় শিলিং-এর বিনিময়ে কাজ করতে হয়।

ডিকেন্‌স জ্ঞান হবার পর থেকেই কুশ্রী দারিদ্রের পরিচয় লাভ করেছেন। আর ছেলেবেলা থেকেই সকলের কাছে শুনতেন, এই দারিদ্রের জন্য দায়ী তাঁর বাবা। তবু বাবার উপর কোন বিদ্বেষ তাঁর ছিল না। সরল, আমুদে, স্নেহশীল কিন্তু উড়নচণ্ডী এই লোকটির উপর ডিকেন্‌স-এর ছিল গভীর মমতা। ডেভিড কপারফিল্ডের চিরদরিদ্র বন্ধু Micawber চরিত্রে তিনি তাঁকে অমর করে রেখেছেন। ইংরাজী ভাষার অভিধানে ডিকেন্‌স-এর আরও অনেক চরিত্রের মতো Micawber শব্দটি স্থান পেয়েছে বিশেষ অর্থে।—যে অলস ব্যক্তি নিজে উদ্যোগী না হয়ে কেবল আশা করে থাকে কিছু একটা সুরাহা হয়ে যাবেই, ইংরেজীতে তাকেই বলে 'মিকওবার'।

এর কিছুদিন পরেই দেনার দায়ে জন ডিকন্‌সকে গ্রেফতার করা হল। এক আত্মীয়ের উইল থেকে অকস্মাৎ কিছু টাকা পাওয়ায় তিনি ঋণ শোধ করে কারামুক্ত হতে পারলেন। কাজ ছাড়িয়ে ছেলেকে বাড়ি নিয়ে এলেন তিনি। আর্থিক সচ্ছলতার জন্য নয়,—এ ধরণের কাজে বংশমর্যাদার হানি হয় বলে। কিন্তু মা-এর জন্য ঝগড়া শুরু করে দিলেন। ছেলেকে বাড়িতে বসিয়ে খাওয়াবে কে? আর্থিক সামর্থ্য কই? মা চেয়েছিলেন, চার্লস আবার শিশি-বোতলের কারখানায় কাজে যাক। ডিকেন্‌স এই জন্যই মাকে কখনো ক্ষমা করতে পারেন নি। অনেক দোষ থাকা সত্ত্বেও বাবাকে ভালবাসতেন, মাকে নয়। মায়ের সম্বন্ধে অনেক কঠোর মন্তব্য করেছেন, এমন কি, মৃত্যুর পরে কবরের উপরের স্মৃতি-ফলকে তিনি কিছুই লেখেন নি মায়ের সম্পর্কে।

পনেরো বৎসর বয়সে ডিকেন্‌সকে মেসার্স এলিস এণ্ড ব্ল্যাকমোর আইন ব্যবসায়ের সংগঠনে শিক্ষানবিশী গ্রহণ করতে হয়। ডেভিডকেও মেসার্স স্পেনলো এণ্ড জরকিন্স-এ আইন ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশী করতে দেখা যায়। এরপর ডেভিড Dr. Strong-এর সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করে। অবশেষে স্কুলের এক সহপাঠি Traddles-এর পরামর্শে সে শর্টহ্যাণ্ড শিখে পার্লামেণ্টে সংবাদ সংগ্রহের কাজ শুরু করে। এই সময়ে একদিন সে গোপনে একটি লেখা পাঠায় এবং সেটি ছাপা হয়।

ডিকেন্‌সকেও আমরা ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টারী রিপোর্টার হিসাবে পাই। আর ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ডিকেন্‌স প্রথম লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। এই প্রসঙ্গে Compton Rickett-কে উদ্ধৃতি দিচ্ছি, 'One evening at twilight, with fear and trembling, he stealthily dropped his first manuscript "into a dark letter box, in a dark office, up a dark court in Fleet street." When he saw it in print he walked down to Westminister Hall and turned into it for half an hour, he tells us, "because my eyes were so dim with joy and pride, and not fit to be seen in the street."

Then came Pickwick—and Fame!'

এখানেও ডিকেন্‌স-এ এবং ডেভিড-এ অদ্ভুত মিল। ডেভিড এবং ডিকেন্‌স, উভয়ের প্রথম রচনা ২১ বৎসর বয়সে প্রকাশিত হয়, উভয়েরই এই ২১ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়েছিল এবং ঐ ২১ বৎসর সম্বন্ধে 'ডেভিড কপারফিল্ড'-এ

বিশেষভাবেই উল্লিখিত আছে, I have come legally to man's estate. I have attained the dignity of twenty one.

এই উপন্যাসেরই Dora চরিত্রটি আর কেউ নয়, তখনকার পরিচিত ব্যক্তিবা সকলেই জেনে ফেলেছিলেন ডিকেন্স-এর প্রথম প্রেমিকা মেরিয়া ব্যাডনাল; যিনি ডিকেন্স-এর মৃত্যুর পরও ষোল বৎসর বেঁচে ছিলেন এবং সগর্বে বলে বেড়াতেন, চার্লস ডিকেন্স তাঁকে ভালবেসেছিলেন। চার্লসও মেরিয়াকে বহুদিন ভুলতে পারেন নি। কপারফিল্ডের ডোরা স্পেনলো তাই মেরিয়াকে মনে করেই লেখা।

ডেভিড কপাবফিল্ডই বলি অথবা অলিভাব টুইস্টই বলি—আমরা এক ভাগ্যতাড়িত, বহু দুঃখময় অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ একটি ছোট ছেলেকে বাঁচার জন্য আপ্রাণ লড়াই করতে দেখতে পাই এবং অবশেষে যখন তাদের জীবন-তরণী এসে ঘাটে ভেড়ে তখন আমরা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। ডিকেন্স-এর জীবন-তরণীও অবশেষে জীবনের বাঁধা পথে এসে ভিড়তে পেরেছিল, আর আমরাও ডিকেন্স-এর মত একজন সত্যিকারের লেখককে পেয়েছি।

ডিকেন্স-এর মতে এই গ্রন্থটি তাঁর সবচেয়ে ভাল বই। চরিত্রগুলির মধ্যে মিশে গেছে ডিকেন্স-এর জীবনের বহু ঘটনা এবং অন্যান্য পরিচিত চরিত্রের মধ্যে পিতা ও মেরিয়া ব্যাডনালের প্রতিচ্ছবি।

এইবার আমরা 'ডেভিড কপারফিল্ড'-এর লেখকের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের এবং একজন রুশ লেখকের সাদৃশ্য বিচারে সচেষ্ট হব।

উৎস নির্দেশ

(১) বিশ্বসাহিত্য ও শরৎচন্দ্র-পৃথ্বিশচন্দ্র ভট্টাচার্য। পৃঃ ৩৯৭

ডিকেন্‌স, গোর্কি ও শরৎচন্দ্র

> 'ডিকেন্সের জীবন-বাণী একটি বাক্যে বলিতে গেলে বলিতে হয়, **'Never be mean, never be false, never be cruel,'** শরৎচন্দ্রেরও জীবন-বাণী তো ইহাই।'
>
> —ডঃ অজিত কুমার ঘোষ।

আমরা লক্ষ্য করলাম লেখক কেমন করে নিজেকে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করান অথবা তাঁর সৃষ্ট চরিত্র এবং ঘটনাগুলির মধ্যে লেখকের মানস প্রতিফলন কেমন অদ্ভুতভাবে প্রবেশ করে থাকে। ডিকেন্‌স ও ডেভিড কপারফিল্ড প্রসঙ্গ এইজন্য আলোচিত হল যে, ডিকেন্‌স-এর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বহু বিষয়ে —জীবন ও সাহিত্য-মানসে—মিল খুঁজে পাওয়া যায় এবং ডিকেন্‌স ও ডেভিডের মতই শরৎচন্দ্র ও শ্রিকান্তের সাযুজ্য বেশ লক্ষ্য করা যায়।

অথচ শরৎচন্দ্রের কথা মনে এলে, শুধু ডিকেন্‌স নয়, প্রখ্যাত রুশ গল্প-কার, কবি ও ঔপন্যাসিক ম্যাক্‌সিম গোর্কির (যাঁর প্রকৃত নাম আলেক্‌সেই মাক্‌সিমোভিচ্‌ পেশ্‌কভ্‌) কথাও আমাদের স্মরণে আসে। এর বিশেষ কতকগুলি কারণ অবশ্যই আছে। জীবন ও সাহিত্য-মানসে এই তিনজনের মধ্যেই বেশ মিল আছে বলেই এঁদের একত্রে বিশেষভাবে মনে পড়ে। শরৎচন্দ্র এই দেশের লেখক হলেও তাঁর মনোভঙ্গী য়ুরোপীয় লেখকদের স্বগোত্র। তাঁর কথা মনে এলেই আমাদের অন্য দেশের বহুতর বাস্তব অভিজ্ঞতার পোড়-খাওয়া সংগ্রামী লেখকদের কথা মনে পড়ে। বিশেষত তাঁর অনুষঙ্গে ডিকেন্‌স-গোর্কির আদলটি বিশেষ ভাবেই ভেসে ওঠে। এছাড়া, আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যোগও ঘটেছে শরৎচন্দ্রের মধ্য দিয়ে। উনিশ শতক থেকে পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসে যে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি, পতিত ও হতভাগ্য মানুষের প্রতি সহানুভূতি, প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে অনাস্থা, নিষিদ্ধ ও অসুন্দর জীবনের প্রতি যে আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে তা প্রতিধ্বনিত হয়েছে শরৎ-সাহিত্যে। প্রথম জীবনে শরৎচন্দ্রহেনরী উড, মেরী করোলি ও জেন অস্টিনের ভক্ত ছিলেন (ডিকেন্‌স তো সারাজীবনে তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় লেখক),

ব্রহ্মদেশে জোলা, মোপাসাঁ ও টলস্টয়ের প্রভাব ছিল খুব বেশি, শেষ জীবনের রচনায় গোর্কি, হামসুন, বার্নার্ড শ প্রভৃতি লেখকের তাত্ত্বিক ও বিতর্কিত মতবাদের ধারা অনুসরণ করেছিলেন। তা'ছাড়া, দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক মতবাদের জন্য তিনি হার্বার্ট স্পেন্সার ও বার্ট্রাণ্ড রাসেলের কাছে সবচেয়ে ঋণী। তবে, ডিকেন্স, গোর্কি ও শরৎচন্দ্র—এই তিনজনেরই বৈচিত্র্যময় জীবনের তিক্ততা ও যন্ত্রণা, অভাব ও অভিযোগ, অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা ও গভীরতায়—অন্য পরিবেশ এবং কালের ব্যবধান সত্ত্বেও—বেশ সাযুজ্য আছে বলে মনে করি। তুলনামূলক ভাবে বিচারেও এঁদের জীবন ও সাহিত্য পাঠে আমরা যেন একই আস্বাদ পেয়ে থাকি। ডিকেন্স শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক শিল্পী নন। শরৎচন্দ্রের জন্ম ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, আর ডিকেন্স-এর মৃত্যু তারও ছয় বৎসর পূর্বে ১৮৭০, ৯ই জুন; কিন্তু গোর্কি ও শরৎচন্দ্রের বয়সের পার্থক্য মাত্র আট বৎসরের। বয়সে গোর্কি (১৮৬৮—১৯৩৬ খ্রীঃ) বড়।

শরৎচন্দ্র, ডিকেন্স ও গোর্কিকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন। যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই তিনি ডিকেন্স পড়া ধরেছিলেন। তিনি একসময়ে ডিকেন্স-এর 'David Copperfield' গ্রন্থখানি হাতে করে এখানে সেখানে ঘুরেও বেড়াতেন। ডিকেন্স ও ডেভিডের মত শরৎচন্দ্র ও শ্রীকান্তের সাযুজ্যও তাই লক্ষণীয়। ডিকেন্স-এর প্রভাব শরৎচন্দ্রের কিছু লেখাতেও পড়ে থাকবে। দেবদাস চরিত্রটির মধ্যে 'A tale of two cities' উপন্যাসের সিডনি কার্টন চরিত্রের ছায়া পড়েছে বলে অনুমিত হতে পারে। ডিকেন্স যে দরদ ও আবেগ নিয়ে A tale of two cities উপন্যাসে মাতাল অথচ মহৎ সিডনি কার্টনের অনুপম চরিত্রটি এঁকেছেন সেরূপ দরদে ও আবেগে হীন পরিবেশের চরিত্র অঙ্কণে শরৎচন্দ্রের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ডিকেন্স ভক্ত শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নায়ক-নায়িকারা মাতাল কিম্বা পতিতা হলেও মহৎ।

ডিকেন্স-এর গভীর সহানুভূতিশীল জীবনদৃষ্টি এবং হাস্য-পরিহাস ও করুণ-রসের প্রতি প্রবণতার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাদৃশ্য মোটামুটিভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের শেষ বয়সের লেখার মধ্যে ডিকেন্স বা উডের লেখার তেমন প্রভাব আছে কি না সন্দেহ। শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্যে যেমন মানুষের দুর্বলতার প্রতি সহানুভূতি, অকুণ্ঠ দরদ এবং নীচতা ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন মনোভাব ফুটে উঠেছে, তেমনি ডিকেন্স-এর সৃষ্ট সাহিত্যেও হাসি-কৌতুক-ব্যঙ্গ আছে, আছে ভালমন্দের সংঘাত, আইনের অপব্যবহার-জনিত দরিদ্রের দুর্ভাগ্য ও দুর্বলতার মধ্যে বাস্তব জগতের প্রতিচ্ছবি।

কিছু লেখক আছেন যাঁরা ঘটনাবলীকে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে তার গভীরে আমাদের নিয়ে যান। আর একদল আছেন যাঁরা আমাদের সামনে ঘটনাবলীকে এমন নিখুঁতভাবে উপস্থাপিত করেন যে আমরা আমাদের মনকে সক্রিয় করে তুলি। যখন এই দ্বিতীয় দলের গল্প উপন্যাস পাঠ করি তখন সংঘটিত ঘটনাবলী আমাদের মনকে আবিষ্ট রাখে। সমস্ত কাহিনীটি পাঠ করার পর অবসর সময়ে উপস্থাপিত চরিত্রগুলি আমাদের ভাবায়। আর, প্রথম দলের পুস্তক লেখকেরা, গল্প পড়ার সময়েই পাঠককে ভাবায়। রবীন্দ্রনাথ যদি এই প্রথম দলের লেখক হন শরৎচন্দ্র তবে দ্বিতীয় দলের লেখক। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসে আমরা যত প্রত্যক্ষ উক্তির সমারোহ দেখি রবীন্দ্রনাথে ততটা দেখি না। সেখানে মনোবিশ্লেষণের বিপুল আয়োজন।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ডিকেন্স-এর এইখানে মিল আছে। ডিকেন্স ঘটনার চিত্রায়ণে যতটা ব্যস্ত ছিলেন মানসিক বিশ্লেষণে ততটা নয়। Compton-Rickett এর সাক্ষ্য, 'Dickens is, as has been said, in no sense a psychologist. His work is impressionistic, not analytical. (২)

ব্রহ্মদেশে যখন শরৎচন্দ্র ছিলেন তখন তিনি জোলা ও অন্যান্য ফরাসী সাহিত্যিকদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি রুশ-সাহিত্যেরও ভক্ত পাঠক ছিলেন। টলস্টয়ের নাম বহুবার উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর লেখা ভালবেসেছেন ; তাই 'পুনরুত্থান' (Ressurrection) ও 'আনা কারেনিনা (Anna Karenina) তাঁর বহুপঠিত গ্রন্থগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু তাঁর চিঠিপত্রে, বক্তৃতামালায় অথবা রচনায় দস্তয়েভস্কির নামোল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে, গোর্কির নাম তিনি করেছেন এবং শ্রদ্ধার সঙ্গেই করেছেন। শরৎচন্দ্রের ভূমি-সংস্কার ও কৃষকদের উন্নতি বিষয়ক চিন্তা যেমন টলস্টয়ের সাহিত্য থেকে পরিপুষ্ট হয়েছে বলে মনে হয় তেমনি রুশ-বিপ্লবের অন্যতম প্রধান সৈনিক গোর্কির সমাজ সচেতনতা এবং বিপ্লবী লেখক হিসাবে তাঁর প্রভাব শরৎচন্দ্রের উত্তরপর্বের রচনায় পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে বলেও মনে হয়। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় গোর্কির প্রভাব ছিল যেমন অসামান্য, তেমনি প্রগতিবাদী ও মুক্তিকামী বাঙলার লেখকদের কাছেও গোর্কি ছিলেন আদর্শ লেখক। শরৎচন্দ্রের পরিণত সাহিত্যপর্বে তিনি যে বিপ্লবাত্মক আদর্শ প্রচার করেছিলেন তার উপরে গোর্কির প্রভাব অসঙ্গত বলে মনে হয় না।

গোর্কির 'মাতৃ' (Mother, ১৯০৬ খ্রীঃ) উপন্যাসে প্যাভেল ও তার

সহকর্মীদের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক ওয়ার্কার্স পার্টির সম্মেলনে যেভাবে পুলিশবেষ্টিত অবস্থায় তারা বিপ্লবের জয়গান করেছিল,

'Arise to the struggle, oh workers, arise,
Arise all who labour and hunger'—

তেমনি, শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসের রামদাস তলোয়ারকারের পুলিশের অত্যাচারের সামনে জনসমুদ্রকে সম্বোধন করে নির্ভীক অগ্নিবর্ষী ভাষণ আমাদের মনে পড়ে যায়, 'শুধু একবার যদি তোমাদের ঘুম ভাঙে, কেবল একটিবার মাত্র যদি এই সত্য কথাটা বুঝতে পারো যে তোমরাও মানুষ, তোমরা যত দুঃখী যত দরিদ্র, যত অশিক্ষিতই হও তবুও মানুষ, তোমাদের মানুষের দাবী কোন অজুহাতে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, তাহলে এই গোটাকতক কারখানার মালিক তোমাদের কাছে কতটুকু ?'

'পথের দাবী'র অন্যতম বিপ্লবী চরিত্র রামদাসের বক্তৃতায় শ্রমিক-মজুর-কৃষক সংহতির আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। তাতে মনে হয় শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক চিন্তার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। কৃষক-সমাজের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী 'মহেশ' গল্পে আছে, কৃষক-সমাজের প্রতিরোধের চিত্র পাওয়া যাবে তাঁর অসম্পূর্ণ 'জাগরণ' উপন্যাসে। মনে হয়, এ সমস্তই রুশ-সাহিত্য পাঠের ফলাফল।

১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে মুন্সীগঞ্জে সাহিত্য-সভায় সভাপতির অভিভাষণে রুশ সাহিত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'পূর্বের মত রাজা রাজড়া, জমিদারের দুঃখ-দৈন্য-দ্বন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্যসেবীর মন আর ভরে না। তারা নীচের স্তরে নেমে গেছে। এটা আপশোষের কথা নয়। বরঞ্চ এই অভিশপ্ত অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ-সাহিত্যের মত যেদিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।' ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখে ঢাকা রূপলাল হাউসে 'শান্তি' পত্রিকার পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত সম্মিলনে প্রদত্ত বক্তৃতায়ও তিনি জানিয়েছিলেন, 'সাহিত্যের মধ্য দিয়ে রাশিয়ার গর্কি প্রভৃতিকে ভাল লাগে—তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোন মিল নেই, তবু তাঁদের appreciate করি।'

শরৎচন্দ্রের গোর্কিকে appreciate করার সঙ্গত কারণ অবশ্যই ছিল। রুশ-সাহিত্যের মত, সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার

মাঝখানে তিনিই প্রথম কিছুটা পরিমাণে যেতে পেরেছিলেন। এবং বলা বাহুল্য, গোর্কির মত শরৎচন্দ্রেরও এটি শ্রেণীগত চেতনা ও ভবঘুরে অভিজ্ঞতার জন্যই সম্ভবপর হয়েছিল। 'অরক্ষণীয়া', 'বামুনের মেয়ে', 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ' এবং 'শ্রীকান্তে'র অসংখ্য পার্শ্ব-চরিত্রগুলিতে উচ্চবর্ণ সমাজ শিরোমণি সামন্ত প্রভুর জাঁতাকলে পিষ্ট অসহায় নরনারীর বাস্তব ছবিগুলি শরৎচন্দ্রই যে প্রথম বস্তুবাদী দৃষ্টিতে সাহিত্যের দরবারে উপস্থাপিত করেছিলেন—একথা বলা অত্যুক্তি হবে কী? সমাজকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে শরৎচন্দ্রের পূর্বে, বাংলা সাহিত্যে বিশেষ ভাবে কেউ কি সফল হয়েছিলেন? এই সমাজ-জিজ্ঞাসাই কী শরৎচন্দ্রকে ঔপনিবেশিক শোষণ, ব্রীটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশের মুক্তি সংগ্রামজনিত রাষ্ট্রচিন্তায় সক্রিয় কর্মী করে তোলে নি? বিপ্লববাদ ও সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন সম্পর্কে চিন্তা এনে দেয় নি?

শরৎচন্দ্র অবশ্য মার্কসবাদী বা মার্কসীয় জীবনাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না। গোর্কিও জন্মসূত্রে মার্কসবাদের অধিকারী ছিলেন না। তবে শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পে যে উৎখাত চাষীর চটকলের মজুরে ঐতিহাসিক পরিণতির অনিবার্যতা বিজ্ঞান-সম্মত দৃষ্টিতে লেখক উদ্ঘাটিত করেছেন, তা কী মার্কসবাদী চিন্তা-বহির্ভূত? তবে, লেখক হিসাবে শরৎচন্দ্র কোন কোন স্থলে স্ববিরোধিতার জালে আটকা পড়ে গেছেন, এটা ঠিকই।

সাহিত্যকে সমাজ-পরিবর্তনের হেতু হিসাবে ব্যবহার করা শরৎচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল। যতদিন না আমাদের সাহিত্য রাশিয়ার মত নীচুতলার মানুষের মধ্যে নেমে আসবে ততদিন সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নেই—এই বিশ্বাস, এর থেকেই গড়ে উঠেছিল। তবে, রাশিয়ার প্রস্তুত সমাজ-ব্যবস্থা গোর্কিকে গোর্কি করেছিল এবং অপ্রস্তুত ভারতবর্ষ শরৎচন্দ্রকে শরৎচন্দ্র করেছিল। লেনিনের সঙ্গে গোর্কির বন্ধুত্বের ফলেই গোর্কির চিন্তাধারা ও রচনাশৈলী বিশিষ্ট রূপান্তর লাভ করেছিল এবং তিনি প্রথম ও শ্রেষ্ঠ সোভিয়েৎ লেখক হিসাবে তখন স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

শ্রমিক-জীবন নিয়ে গোর্কির 'মাত্' (মা) বোধ করি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। 'মা' গ্রন্থটি যেমন গোর্কির বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ফসল; তারও বিশ বৎসর পরের লেখা শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'ও তাঁর বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি উল্লেখযোগ্য পরিচয়। ব্রীটিশ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারী মূর্তিকে প্রথম লেখক হিসাবে শরৎচন্দ্রই ভারতবাসীর কাছে তুলে ধরেছিলেন। ম্যাক্সিম গোর্কি যেমন মুক্তি আন্দোলনে তাঁর লেখায় ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের উল্লেখ

করেছেন, শরৎচন্দ্রও তেমনি ট্রেড ইউনিয়নকে মুক্তি আন্দোলনের অংশ হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। 'পথের দাবী'তে শরৎচন্দ্র যে শ্রমিকদের দারিদ্র্যপিষ্ট ও নীতিচ্যুত কদর্য ও গ্লানিকর জীবনের শোচনীয় চিত্র তুলে ধরেছেন, তা গোর্কির The Lower Depths নাটকের নীচের তলাকার মানুষগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

গঠন ও বিন্যাসের দিক থেকে ডিকেন্স-এর উপন্যাস খুব সুষ্ঠু ও সংহত নয়। লেখক হিসাবে তিনি পাঠক ও জনসাধারণর চাহিদা পূরণের জন্যই তাঁর উপন্যাসের ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। দোষ-ত্রুটি তাঁর কাহিনী, রচনারীতি ও আঙ্গিকে অনেক আছে কিন্তু তাঁর সবকিছু ত্রুটির উপরে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে তাঁর মানবিকতা। তাঁর হৃদয়ের অপার করুণা ও মানবপ্রেম বাস্তব বুদ্ধি ও যুক্তিকে ছাড়িয়ে উঠেছে বলেই তাঁর সৃষ্টি আজ চিরন্তনী সাহিত্যের অঙ্গীভূত।

ডিকেন্স যেমন প্রথম ইংল্যাণ্ডবাসীকে সাধারণ মানুষের কথা দরদের সঙ্গে শোনালেন, গোর্কি এবং শরৎচন্দ্রও তেমনি যথাক্রমে রুশদেশের এবং ভারতের সাধারণ মানুষের কথা দরদ দিয়ে প্রকাশ করলেন। তিনজনেই নিম্নতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ ছিলেন এবং তিনজনেই তাঁদের শ্রেণীগত জীবন থেকে প্রেরণা লাভ করেছেন। তিনজনেরই রচনা সর্বোৎকৃষ্ট হয়েছে তখন, যখন তাঁরা তাঁদের নিজেদের সামাজিক জীবনের মানুষের ছোটখাটো আশা-নিরাশার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনজনেই তাঁদের শ্রেণীগত সীমানা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন, যখন তাঁরা আরও নিম্নতর সমাজ-জীবনের চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন তাঁদের থেকে উন্নততর সমাজ-জীবনের চিত্রাঙ্কনে। ডিকেন্স, গোর্কি ও শরৎচন্দ্র—তিনজনেই সমাজের বিপথ-গামী ও ছন্নছাড়াদের প্রতি একটা বিশেষ অনুকম্পা প্রকাশ করেছেন এবং সকলেই সমাজ-সংস্কারক মানবতাবাদী ছিলেন।

শিশুচরিত্র অঙ্কনের সময় ডিকেন্স ও শরৎচন্দ্র উভয়েই চরম সার্থকতায় পৌঁছেছেন। আরও ভালো করে বলতে গেলে বলতে হয়, তাঁরা নিজেরাই তখন শিশু হয়ে গিয়েছেন। 'It is hard to overpraise Dickens' sketches of child life. Dickens did not describe a child—he became a child for the time being.'—Rickett. শরৎচন্দ্রও শিশুমনের অন্তরতম অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে তার বিচিত্র প্রবৃত্তিকে বিচিত্র রূপ দিয়েছেন। ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত, পরেশ, রাম, কেষ্ট—এরা যেন সব রক্তমাংসের

মানুষ। অপর দিকে Paul, David, Pip, Oliver-- এদের সাথেও আমরা একাত্মবোধ করি।

Realism-এর পাঠ এই। তিনজনই নিয়েছিলেন যথাবিধি। আর সেই পাঠ আত্মস্থ করেছিলেন তাঁরা নিজের জীবন দিয়ে; জীবনের মর্মান্তিক দারিদ্র্যের, সমাজের পুঞ্জীভূত ক্লেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে। অমানুষিক দারিদ্র্যে, জীবন ধারণের তাড়নায় জীবনের প্রথম ভাগে এই তিনজনই ঘরবাড়ি ছেড়ে ভবঘুরে বৃত্তি নিয়েছিলেন। জীবনের তিক্ত স্বাদ তিনজনেই গ্রহণ করে কৃতার্থ হয়েছেন এবং পরিণামে এই তিক্ততাই তিনজনকে মানবশিল্পী হিসাবে নির্মাণ করেছে।

ডিকেন্স, গোর্কি ও শরৎচন্দ্র দারুণ জনপ্রিয় লেখক এবং তাঁদের লেখা শুধুমাত্র বিদগ্ধ জনদের জন্য নয়। তিনজনেই সমসাময়িক কালে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ যেমন ডিকেন্স-এর ভক্ত পাঠক, রাশিয়ার জনসাধারণ যেমন গোর্কির ভক্ত পাঠক, তেমনি ভারতের জনসাধারণ শরৎচন্দ্রের ভক্ত পাঠক ডিকেন্স-এর যেমন একটি মৌল ইংরেজ মনোভাব ছিল, গোর্কি ও শরৎচন্দ্রেরও তেমনি একটা মূলগত রুশিয় ও বাঙালি মনোভাব ছিল। সেকৃসপীয়ারের গভীরতা, মিল্টনের বৈদগ্ধ্য বা রবীন্দ্রনাথের মননশীলতা ও কাব্যগুণ তাঁদের মধ্যে না থাকতে পারে কিন্তু নিপীড়িত মানবতার প্রতি তাঁদের অসীম দরদ ছিল এবং সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁরা আমাদের অত্যন্ত আপনজন।

ব্যক্তিজীবনেও দেখা গেছে যে, ডিকেন্স-এর মত গোর্কি ও শরৎচন্দ্রও জীবনের প্রথম দিকে অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়েছিলেন। লেখক জীবনেই এঁদের ভাগ্য-পরিবর্তন হয়। তিনজনেই সমালোচকদের শ্লেষকে অগ্রাহ্যের মধ্যে এনেছেন এবং তিনজনেরই প্রথম প্রেমে এসেছে ব্যর্থতা।

ডিকেন্স-এর কেরাণী পিতা জন ডিকেন্স ঋণের দায়ে কারারুদ্ধ হন, দুর্গত পরিবারের সন্তান চার্লসকে শৈশবেই শ্রমিক-জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়; বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভও অধিক অগ্রসর হয়নি। গোর্কিও অতি শৈশবে পিতৃহীন হন কিন্তু দারিদ্র্যবশতঃ কিশোর বয়সেই জীবিকান্বেষণে বার হয়ে বহু প্রকার কাজ করেন ও নানা শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসেন। তিনি প্রায় সমগ্র রুশ দেশ পদব্রজে ভ্রমণ করেছিলেন। আর এই তৃতীয় ব্যক্তিটিকেও জীবনের ছাব্বিশটি বৎসরের মধ্যেই মা-বাবাকে হারাতে হয়, মাত্র দু'টি দশ টাকার নোটের অভাবে একদিন পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ রাখতে হয় এবং

বর্ণাশ্রমভেদী সমাজে একঘরে হয়ে থাকতে হয়। কাজেই realism-কে আত্মস্থ করা তো এঁদের পক্ষেই সম্ভব। নিখুঁত পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে. এঁরা মাটির পৃথিবীর মানুষের রূপ এঁকেছিলেন।' সমাজে যাঁরা সর্বনিম্ন ধাপের মানুষ, যাঁদের রক্ত জল করা শ্রমে কৃষি, কারুকর্ম ও কল-কারখানা চলছে অথচ যাঁদের অভাব কষ্ট বেদনা ও বঞ্চনার বার্তা ভদ্রসমাজ কোনদিন জানতেও পারেন না, তাঁদের জাগ্রত ও জীবন্ত আলেখ্য এঁরা প্রকাশ করেছেন।

ডিকেন্স-এর 'David Copperfield' (১৮৪৯-৫০ খ্রীঃ) Autobiographical novel বা আত্ম-জীবন নির্ভর উপন্যাস, 'শ্রীকান্ত' ও (চার পর্ব) তাই; গোর্কিরও আত্মজীবনীমূলক ত্রয়ী 'দিয়েৎস্তভো' (শৈশব, ১৯১৩-১৪ খ্রীঃ) 'ভ্ ল্যুদিয়ান' (সংসারে ১৯১৫ খ্রীঃ) এবং 'মই য়ুনিভের্সিতেতি' (আমার বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৩ খ্রীঃ) সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ডিকেন্স-এর আত্মজীবনী যেমন তাঁরই বিখ্যাত গ্রন্থ 'David Copperfield'-এর মধ্যে অনেকখানি প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি শরৎচন্দ্রব জীবনকথা তাঁর 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের মধ্যে অনেকখানি পরিস্ফুট হয়েছে। David-এর সাথে তাই শ্রীকান্তের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। 'David Copperfield' শুধু ডিকেন্স-এর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস নয়, এর মধ্যে তাঁর সর্বাধিক আত্মপ্রকাশও ঘটেছে; 'শ্রীকান্ত' সম্পর্কেও এই একই কথা বলা যেতে পারে। শ্রীকান্তের রচনারীতি David Copperfield-এর রচনা রীতির সঙ্গেও সাদৃশ্যযুক্ত।

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রই বোধ করি প্রথম ছকে বাঁধা গল্প সরিয়ে নতুন ধরণের উপন্যাসের পরিকল্পনা করলেন এই উপন্যাসটি লিখে। এক্ষেত্রেও তিনি কিছুটা দিশা পেয়েছেন ডিকেন্স-এর 'ডেভিড কপারফিল্ডে'। ডিকেন্স-এব এই উপন্যাসটিতেও বাঁধা-ধরা কোন গল্প নেই। ভাগ্য-তাড়িত একটি ছেলে কি ভাবে বিভিন্ন পরিবেশে বিচিত্র সব মানুষের সংস্পর্শে গিয়ে জীবনের এক একটি পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, ডিকেন্স তাই নিখুঁত বাস্তবদর্শিতা নিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। শরৎচন্দ্রও এই পথের অনুসরণে কল্পনা করেছেন শ্রীকান্তকে, তার জীবনে কত মানুষই না এল, ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি ও শাহজী, কুমার সাহেব, অভয়া, সুনন্দা, কমললতা ও গহর এবং রাজলক্ষ্মী, এমনি আরও কতজন। সকলেই তাদের স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। অথচ সকলের সংস্পর্শে শ্রীকান্ত ক্রম-বিবর্তিত, নিত্য-পরিণত হয়ে চলেছে। শ্রীকান্ত চরিত্রটি ওই নামাঙ্কিত চারখানি বই-এর যোগসূত্র। শ্রীকান্ত চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতেই আর সকল চরিত্র এসেছে, তারা তাদের স্বতন্ত্র বর্ণে ও ব্যক্তিত্বে হয়েছে

বিকশিত। শ্রীকান্ত চরিত্রটির উগ্র ব্যক্তিত্ব থাকলে অন্য চরিত্রগুলির পূর্ণ প্রকাশে বাধা পায়; তাই শ্রীকান্তকে কিছুটা মেরুদণ্ডহীন বলে মনে হয়। শরৎচন্দ্রও তাই শ্রীকান্তকে অনেকখানি অনুগ্র সহন্‌শীল চরিত্র রূপে গড়ে তুলেছেন। ডেভিডের চরিত্রেও কি উগ্র ব্যক্তিত্ব আছে? ডেভিডের পক্ষে যা কারণ, শ্রীকান্তের পক্ষেও তাই।

উৎস নির্দেশ

(১) শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার।

—ডঃ অজিত কুমার ঘোষ, পৃঃ ৫০

(২) A History of English Literature

—Arthur Compton-Rickett-Page no-504

একটি বিস্ময়কর জীবন

"A Man of Mystery"

"আমার এই জীবনটা আগাগোড়াই যেন একটা মস্ত উপন্যাস"—উক্তিটি শরৎচন্দ্রের এবং মোটেই অত্যুক্তি নয়। সত্যই শরৎচন্দ্রের জীবন একটি মস্ত উপন্যাসের মত। বড় বৈচিত্র্যময়, বড় রহস্যময় জীবন। ছেলেবেলায় বে-পরোয়া ভাব, যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল-ছন্নছাড়া এবং প্রৌঢ় বয়সেও অস্থিরমতি স্বভাব বজায় ছিল তাঁর জীবনে। 'ইন্দ্রনাথ', 'দেবদাস', ও 'সব্যসাচী' তাঁর মনের মধ্যেই ঘুরে ফিরে বেড়াত। বাড়ি থেকে পালিয়েছেন, সন্ন্যাসী হয়ে পথে পথে ঘুরেছেন, একাধিক নারীর প্রণয়-প্রার্থী হয়েছেন, বিয়েও করেছেন একাধিক, 'নারীর ইতিহাস' সংগ্রহের জন্য পতিতালয়ে ঘুরে দুর্নামের ভাগী হয়েছেন, কংগ্রেসের অহিংস মন্ত্রে বিশ্বাস করেও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলে প্রভূত অর্থ সাহায্য করেছেন। এই ভাবে জীবনটিকে বহন করে নিয়ে গিয়ে শেষ সময়ে যশের মুকুট পরেছেন। অথচ ছেলেবেলা থেকে অনাহারে, অর্ধাহারে ও অনিদ্রায় দিনের পর দিন কাটিয়েছেন, গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এই ভাবে

অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। সুদূর বর্মামুল্লুকেরও হেন স্থান ছিল না যেখানে তাঁর পা পড়েনি। তাঁর সমগ্র জীবন এক অদ্ভুত অবস্থা-বিপর্যয়ের ইতিহাস।

গান-বাজনা জানতেন, ছবি আঁকতে পারতেন, অভিনয়ও করেছেন, সর্বোপরি সাহিত্যিক হয়েছেন। এছাড়া পাখি শিকার ও মাছ ধরাও তাঁর সখ ছিল। দরদী, খেয়ালী, আত্মভোলা, লিখন-বিলাসী, বন্ধু-বৎসল, অতিথিপরায়ণ, মজলিসী, ধর্মনিষ্ঠ ও প্রেমিক এই মানুষটির চরিত্র বৈশিষ্ট্য সত্যই বিস্ময়কর। বাস্তবিক বড় বৈচিত্রময় ছিল তাঁর জীবন।

এই মানুষটিই মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে ৩১শে ভাদ্র ১২৮৩, ইংরেজী ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ তারিখে ভুবনমোহিনী দেবীর কোল আলো করেছিলেন তিনি। তিনি ধনীর দুলাল ছিলেন না, ছিলেন এই দীন ধরণীব দরিদ্র সন্তান।

প্রাচীন গ্রাম এই দেবানন্দপুর। তার ততোধিক প্রাচীন নদী সরস্বতী। বড় বড় বুড়ো বটগাছের ছায়াব ছায়ায় আচ্ছন্ন গ্রাম্য পথ। বনতুলসীর ঝোপে আবৃত পোড়ো-ভিটার ভাঙা স্তুপ। এই গ্রামেরই দরিদ্র সন্তান তিনি। প্রভূত অভাব ছিল সংসারে, তাই একবার বাল্যকালে দেবানন্দপুরের পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস, আবার পিতাব সঙ্গে বিহারের ডিহরীতে যাওয়া এবং ভাগলপুরে মাতুলালয়ে ফিরে এসে বিদ্যাচর্চা করাতে তিনি শৈশবেই স্বভাব-চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। ছেলেবেলায় তাঁর ডাক নাম ছিল 'ন্যাড়া'। ন্যাড়াকে লেখা-পড়া শিখিয়ে মানুষ করায় গুরুজনের তাড়না ও চেষ্টার অবশ্য ত্রুটি ছিল না।

পিতা মতিলাল লেখাপড়া জানলেও (এণ্ট্রান্স পাশ করে কিছু দিন এফ. এ. পড়েছিলেন) চাকরি বড় একটা করতেন না। তিনিও অস্থিরমতি ও উদাসীন গোছের লোক ছিলেন, আত্মভোলা ও বাঁধন ছেঁড়া মানুষ। শরৎচন্দ্রের মাতা ভুবনমোহিনী নিজগুণে সত্যই ছিলেন ভুবনমোহিনী। তাঁব গুণে সকলেই মুগ্ধ ও বশীভূত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পরই মতিলাল ও শরৎচন্দ্র কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত দুদিকে ছিট্‌কিয়ে পডেছিলেন।

অবস্থার অসচ্ছলতা হেতু মতিলাল অধিকাংশ সময়েই ভাগলপুরে শ্বশুরালয়ে থেকেছেন। তখনকার দিনের তুলনায় মতিলালের লেখাপড়া মন্দ ছিল না; কিন্তু তাঁর অস্থির প্রকৃতির জন্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি, চিরকালই পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়েছে। তিনি গল্প-কবিতা যা কিছু লিখেছেন সবই অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। জীবনে দুঃখও পেয়েছেন।

ছেলেবেলায় খড়ের ছাউনি দেওয়া প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়া শুরু

করা থেকেই তাঁর দুরন্তপনা আরম্ভ হয়েছিল। শৈশবেই গ্রামের সরস্বতী নদীতে খেয়া ডোঙা বেয়ে কৃষ্ণপুর গ্রামের রঘুনাথ বাবাজীর আখড়া ('শ্রীকান্ত' উপন্যাসে যার ছাপ পড়েছে) বাড়িতে পালানো, বনে লুকিয়ে বসে বসে সঙ্গী সাথীদের নিয়ে মাছ চুরি করার জন্য পরামর্শ আঁটা, পাঠশালার একটি ছোট্ট মেয়ের কাছ থেকে বৈঁচি ফল খাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি বহু ঘটনাই দেবানন্দপুরে ঘটেছিল। তারপর বিহারের ডিহরির ক্যানেলের পাড়ে পাড়ে পাকা খিরনী কুড়িয়ে কুড়িয়ে বেড়ানো আর ফাঁস করে গিরগিটি ধরা প্রভৃতি চলতে থাকল। আবার ভাগলপুরে এসে ছাত্রবৃত্তি (বর্তমান চতুর্থ শ্রেণী) পাশ করলেন। আরও দুই বৎসর ভাগলপুরে পড়াশুনা করে পুনরায় দেবানন্দপুর। আবার ভাগলপুরে গিয়ে পড়াশুনা করে দ্বিতীয় বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। শরৎচন্দ্রের বাল্যকাল কোথায় কতদিন অতিক্রান্ত হয়েছিল সে সম্বন্ধে তাঁর সমসাময়িক ও ঘনিষ্ঠ লোকেদের মধ্যে মতের বিভিন্নতা দেখা যায়।

শৈশবকাল থেকেই মাছ ধরা, ডোঙা ঠেলা, নেশা করা, সাপ মারা, সমবয়সীদের দলপতি হওয়া, যাত্রা-থিয়েটার করা এবং মাঝে মধ্যেই নিরুদ্দেশে পাড়ি জমানো—সবই চলত। এই ছেলেবেলাতেই রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল। প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালা, রাজুর বন্ধুত্ব, মাছ চুরি এবং নৌকা চড়া প্রভৃতি সবই তাঁর 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের মধ্যে ছায়া ফেলেছে। ঘুড়ি ওড়ানো, লাট্টু ঘোরানো, গুলি খেলা, ফড়িং ধরা, ফড়িং পোষা, নদীতে মাছ ধরা, পরের বাগানে ফল চুরি—এই সব তাঁর ছেলেবেলার খেলা, আর ঝোঁক ছিল বলেই পরবর্তীকালে দুরন্ত চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি অপরাজেয় হয়েছিলেন। তাঁর সৃষ্ট দুরন্ত চরিত্রগুলির মত তিনি নিজেও বাল্যকালে দুরন্ত ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের কথাতেই বলি, "ছেলেবেলার কথা মনে আছে, পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরে, ডোঙা ঠেলে, নৌকা বেয়ে দিন কাটে। বৈচিত্রের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলের সাগ্‌রেদি করি, তার আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন গামছা কাঁধে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বার হই। ঠিক বিশ্বকবির কাব্যের নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়, একটু আলাদা। সেটা শেষ হলে আবার একদিন ক্ষতবিক্ষত পায়ে নির্জীব দেহে ঘরে ফিরে আসি। আদর অভ্যর্থনার পালা শেষ হলে অভিভাবকেরা পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান করে দেন।"

প্রথম পুত্র শরৎচন্দ্রের ছন্নছাড়া উদাসী ভাবের জন্য ভাবতে ভাবতে, সংসারের দারিদ্র এবং গৃহের অশান্তির জন্য জননী ভুবনমোহিনী দেবীর হল মৃত্যু (১৮৯৫)। ভুবনমোহিনীর মৃত্যুর পর মতিলাল ভাগলপুরেরই একটি অঞ্চল

খঞ্জপুর মহল্লায় ভাড়া বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। মতিলাল দেবানন্দপুরের ভিটা বাড়িটা মাত্র ২২৫ টাকায় বিক্রয় করে দিয়ে দেবানন্দপুর থেকে চির বিদায় নিলেন। এফ. এ. ক্লাসেই শরৎচন্দ্রের পড়াশোনার সমাপ্তি। 'আদমপুর ক্লাব'-এ অভিনয় ও সঙ্গীত চর্চা, সাহিত্য সাধনা আর রাজুর সাহচর্যে দুঃসাহসিক অভিযানের মধ্যে শরৎচন্দ্রের দিন কাটে। খঞ্জপুরে নিরুপমা দেবী ('বুড়ি') ও তাঁর ভাই বিভূতিভূষণ ভট্টের ('পুঁটু') সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। 'আদমপুর ক্লাবে' শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রাজেন্দ্রনাথও অভিনয় করতেন। একদিন অভিনয়ের পর রাজেন্দ্রনাথ নিরুদ্দিষ্ট হন। প্রিয়-বন্ধু বিচ্ছেদ হয়।

সংসারের দুশ্চিন্তায় তখন মতিলাল পীড়িত। অর্থ উপার্জনে শরৎচন্দ্রকে মন দিতে হল। বনেলী স্টেটে চাকরি গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। ছাত্র হিসাবে তিনি মন্দ ছিলেন না, কিন্তু ছাত্রজীবন তাঁর দীর্ঘ হয়নি। মাতৃ-বিয়োগই তার একমাত্র কারণ। খেলাধূলা, অভিনয়, চাকরি, প্রতিবেশী বিভূতিভূষণ ও নিরুপমা দেবীদের বসবার ঘরে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা প্রায় সময়েই একাগ্রচিত্তে নানান্ গ্রন্থ অধ্যয়ন ও সাহিত্য চর্চা চলতে থাকল। এই সময়েই বড়দিদি, দেবদাস, চন্দ্রনাথ, প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। কিন্তু আবার বাউণ্ডুলে মন তাঁকে তাড়া লাগাল। অস্থিরতাই তাঁর পৈতৃক উত্তরাধিকার, পিতার উপর অভিমান বশতঃ তিনি নিরুদ্দেশে পাড়ি জমালেন।

অস্থিরমতি শরৎচন্দ্র সন্ন্যাসীবেশে (নাগা সন্ন্যাসীদের সাথেও ঘুরেছেন) এখানে সেখানে কিছুদিন ঘোরবার ('শ্রীকান্ত' উপন্যাসে সন্ন্যাসী জীবনের অভিজ্ঞতার কথা আছে) পর মজঃফরপুরে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে পরবর্তীকালের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এই পরিচয়ই স্থায়ী হয়। শরৎচন্দ্র ধর্মশালায় উঠেছিলেন এবং পরে লেখিকা অনুরূপা দেবীদের গৃহে তিনি দুই মাস থাকেন। তরুণ সন্ন্যাসী শরৎচন্দ্রের গান ও সেবাকার্যে মুগ্ধ হয়ে স্থানীয় জমিদার মহাদেব সাহু তাঁকে আশ্রয় দেন। গান-বাজনা, শিকার এবং সাহিত্য চর্চা নিয়ে এখানে শরৎচন্দ্রের দিন কাটত। ('শ্রীকান্তে'র 'কুমার সাহেব'-এর চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে এই জমিদারকে দেখে।) ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মজঃফরপুর থেকে ভাগলপুরে ফিরলেন এবং অতি কষ্টে পিতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করে আবার চাকরির সন্ধানে সুদূর ব্রহ্মদেশে যাত্রা করলেন তাঁর ভাগ্যান্বেষণে। আর্থিক সংকট ও পরাশ্রয়ে ব্যক্তিত্বহীন জীবন যাপন তাঁকে শেষ পর্যন্ত ভাগ্যের সন্ধানে দেশছাড়া করল। কিন্তু ব্রহ্মদেশে যাবার পূর্বে বেশ কিছুদিন

(আনুমানিক ছয় মাস) তিনি কলিকাতায় অতিবাহিত করেন। অবশ্য ছোট ছোট ভাই-বোনদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে বিভিন্ন স্থানে রেখে গেলেন। ছোট বোনটিকে বাড়ির মালিক-মহিলাটির কাছে রেখে (শরৎচন্দ্রের ছোট মামা পরে একে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন এবং তিনিই এঁর বিয়ে দিয়েছিলেন) ভাগ্য অন্বেষণে কলিকাতায় এলেন। কলিকাতায় এসে তিনি উপেন মামার দাদা হাইকোর্টের উকিল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে ওঠেন এবং তাঁর কাছেই ৩০ টাকা মাহিনায় হিন্দী পেপার বুকের ইংরেজী তর্জমা করার একটা চাকরি পান। একদিন বৌবাজারে সুরেন মামা ও গিরীন মামার সঙ্গে দেখা করতে গেলে (এঁরা তখন কলকাতায় কলেজে পড়তেন) গিরীন মামার অনুরোধে বসে সঙ্গে সঙ্গেই 'মন্দির' নামে একটি গল্প লিখে সুরেন্দ্রনাথের বেনামীতে 'কুন্তলীন প্রতিযোগিতায়' পাঠিয়েছিলেন। দেড়শো গল্পের মধ্যে এই গল্পটিই শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছিল।

এর পর (জানুয়ারী ১৯০৩) সেখান থেকে তিনি বর্মায় চলে যান। মাত্র সাতাশ বৎসর বয়সে সম্পূর্ণ অপরিচিত, গৃহহীন শরৎচন্দ্র বর্মার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। যখন তিনি রেঙ্গুনে পৌছান তখন তাঁর পকেটে মাত্র দুটি টাকা ছিল বলে শোনা যায়। বর্মায় গিয়ে লালমোহনবাবুর ভগ্নীপতি রেঙ্গুনের অ্যাডভোকেট অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে ওঠেন। কিছুদিন পরে মেসোমশাই অঘোরবাবু বর্মা রেলওয়ের অডিট অফিসে তাঁর একটা অস্থায়ী চাকরি করে দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অল্পদিনের মধ্যেই অঘোরবাবু অকস্মাৎ মারা যান। শরৎচন্দ্রের চাকরিটিও চলে যায়। বাধ্য হয়ে তাঁকে আবার নতুন করে ভাগ্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হতে হয়। রেঙ্গুনের এক বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে সেখান থেকে ৪৫ মাইল উত্তরে পেগুতে অবিনাশ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে ওঠেন। অবিনাশবাবুর বাড়ি ছিল দেবানন্দপুরের অদূরে বৈদ্যবাটীতে, তাই বিদেশে অবিনাশবাবু শরৎচন্দ্রকে যত্ন করেই স্থান দিয়েছিলেন। এই সময় মনীন্দ্র কুমার মিত্র ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্মার **Examiner of Public Works and Accounts** অফিসে অতি সামান্য বেতনের একটি কেরাণী-পদ দেন। এই চাকরি পাওয়ার পূর্বে শরৎচন্দ্র মাঝে লাঙ্গলাবিনে কিছুদিন এক ধানের ব্যবসায়ীর সঙ্গে কাজ করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকার সময় শহরের উপকণ্ঠে বোটাটং-পোজনডং অঞ্চলে কারখানার মিস্ত্রীদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতেন, তাদের চাকরির দরখাস্ত লিখে দিতেন, বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে দিতেন, অসুখে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথি

চিকিৎসা করতেন, বিপদে সাহায্যও কবতেন। মিস্ত্রীরা শবৎচন্দ্রকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি কবত এবং দাদাঠাকুর বলে ডাকত। শরৎচন্দ্র এদের নিযে একটা সংকীর্তনের দলও করেছিলেন।

এতকাল তাঁব জীবনে গভীর অধ্যযনেব স্থযোগ ঘটেনি। এইবাব জীবনে প্রথম শবৎচন্দ্র গভীর অধ্যয়নেব স্থযোগ পান। ছাত্রজীবনে মাত্র ছুটি দশটাকাব অভাবে F. A. পরিক্ষার Fee জমা দিতে না পাবায, তাঁকে কলেজেব পড়া ছাড়তে বাধ্য হতে হযেছিল। এই দুঃখ তাঁর অন্তবেব অন্তস্থলে জমাট হয়ে ছিল। তাই লাইব্রেবীতে গিযে তিনি Mill, Kent, Hegel, Schopenhauer প্রভৃতি মণীষীদেব দার্শনিক গ্রন্থগুলি ক্ষুধিতেব আগ্রহে অধ্যয়ন কবতে থাকেন। এই সময়ে ববীন্দ্রনাথেব গ্রন্থগুলিও তাঁব পুনবায পড়বার স্থযোগ ঘটে। বেঙ্গুনে থাকাকালীনই তিনি আত্মীয় বন্ধুব আগ্রহাতিশয্যে সাহিত্য ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে একটি স্থাযী আসন কবে নেন। মাঝে মধ্যে এই সমযে তাঁকে কলিকাতায় আসতেও হত।

স্থদূব বর্মা মুল্লুকে শবৎচন্দ্র ববাববই অস্থায়ী কেবানী হিসাবে চাকবি কবেছিলেন। ওব মধ্যে যে কতবাব কত জাযগায চাকবি ছেড়েছেন, এবং ধরেছেন তার ঠিক নেই। মাসিক তিরিশ টাকা বেতন থেকে শত খানেক টাকা মাহিনাব চাকাব বিভিন্ন সমযে বিভিন্ন স্থানে কবেছেন। তাব চাকবিব কথা প্রমথনাথ ভটাচাযকে ২২-৩-১২ তাবিখে লেখা পত্রে জানা যায—'চাকবি কবি, নব্বই টাকা মাহিনা পাই এব দশ টাকা এলাউযেন্স পাই। একটা ছোট দোকানও আছে। দিনগত পাপক্ষয কোন মতে কুলাইযা যায, এই মাত্র। সম্বল কিছুই নাই।'

বেঙ্গুনে অবস্থানকালে তিনি উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপনও কবেন। এক বকম ছেলেবেলা থেকেই তিনি নেশা কবতে শুরু করেন। জীবনে তামাক, মদ এবং আফিং কোনটিই তিনি বাদ বাখেননি। বেঙ্গুনে এক সমযে তিনি মদ ছেড়ে আফিং ধবেছিলেন, তাবপব আফিংও ছেড়ে দিযেছিলেন। কিন্তু শবীব অসুস্থ হযে পড়ায তিনি আফিং খাওযা আব ছাড়তে সক্ষম হননি। ভবিষ্যতে এই আফিংই তাঁর অকালমৃত্যু এনে দেয।

এই সময়ে শবৎচন্দ্র বর্মার মিস্ত্রীদের পল্লীতে অবস্থানকালে যে সকল নারীব সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং প্রণয়ে পড়েছিলেন তার সত্যাসত্য নির্ণয় কবা সত্যই কষ্টসাধ্য। কারণ বিভিন্ন লেখক তাঁদের লেখায় তাঁর সম্পর্কে যা লিখেছেন তাতে শরৎচন্দ্রের ঐ সমকালীন জীবনযাত্রার সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় না।

তবে, শরৎচন্দ্র যে অনেক সময়েই প্রণয়ে ব্যর্থ হয়েছেন, সেকথা মেনে নেওয়াই উচিত। শরৎচন্দ্র তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের নিজের সম্পর্কে বানিয়ে মিথ্যা করেও অনেক গল্প করেছেন। সত্যিকারের তিনি যা নন, অনেক সময় লোকের কাছে নিজেকে তাই বলে প্রচার করতেন। তাঁর বাইরের আচরণগত মূর্তির সঙ্গে ভিতরের মানুষটির কোন সাদৃশ্য ছিল না। দিলীপকুমার রায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের একটি চিঠিতে আছে—'সবচেয়ে জ্যান্ত লেখা সেই, যা পড়লে মনে হবে গ্রন্থকার নিজের অন্তর থেকে সব কিছু ফুলের মত বাইরে ফুটিয়ে তুলেছে। দেখোনি বাঙ্গলা দেশে আমার সব বইগুলোর নায়ক নায়িকাকেই ভাবে, এই বুঝি গ্রন্থকারের জীবন, নিজের কথা। তাই সজ্জন সমাজে আমি অপাংক্তেয়। কতই না জনশ্রুতি লোকের মুখে মুখে প্রচারিত।'

শরৎচন্দ্র পতিতাদের ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলেন, একথা সত্য। পতিতাদের ইতিহাস সংগ্রহ করা একটি ভদ্র মানুষের পক্ষে কত কঠিন তা সহজেই অনুমেয়। তিনি প্রায় ছয়-সাত শত বাঙালী কুলত্যাগিনীর ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলেন, তা লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠিতেও লিখেছিলেন এবং সেই চিঠিতে এ কথাও আছে, অনেক দিন, অনেক মেহন্নত, অনেক টাকা তাতে নষ্ট হয়, কিন্তু একটা আশ্চর্য শিক্ষাও আমার হয়েছিল। দুর্নামে দেশ ভরে গেল……।' সত্যই তিনি নারীজীবন, বিশেষত পতিতাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক দিকগুলি আলোচনা করার জন্য বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে নানা স্থান থেকে হতভাগিনী কুলত্যাগিনীদের যথার্থ ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টায় বহু পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁরই লেখা প্রবন্ধ 'নারীর মূল্যে' আছে,—'বারো-তেরো বৎসর পূর্বে জনৈক ভদ্রলোক এই বাঙলাদেশে কুলত্যাগিনী বঙ্গ রমনীর ইতিহাস সংগ্রহ করিতেছিলেন। তাহাতে বিভিন্ন জেলার বহু সহস্র হতভাগিনীর নাম, ধাম, বয়স, জাতি পরিচয় ও কুলত্যাগের সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ৎ লিপিবদ্ধ ছিল। বইখানি গৃহদাহে ভস্মীভূত হইয়াছে—।' এই 'জনৈক ভদ্রলোক' শরৎচন্দ্র নিজেই এবং তাঁর সত্যই গৃহদাহে সমস্ত ভস্মীভূত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই বহু পরিশ্রমে সংগৃহীত পতিতাদের আত্মকাহিনী (নারীর ইতিহাস) এবং হাতে আঁকা ছবিও নষ্ট হয়ে যায়। সেই অপূর্ব সংগ্রহের বিনাশের কথা মনে করে শরৎচন্দ্রের মন প্রায়ই ব্যথিত হয়ে উঠত।

প্রকৃতপক্ষে রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাতবাসপর্ব। সম্মান ও প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল আলোক থেকে দূরে উপেক্ষিত অবজ্ঞাত মানুষের মধ্যে তিনি সাহিত্যের অমূল্য

উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। ব্রহ্মদেশ থেকে কলিকাতায় ফিরে স্থায়ীভাবে বসবাস করলেন বটে কিন্তু ব্রহ্মদেশকে ধরে রাখলেন সাহিত্যের মধ্যে।

শরৎচন্দ্র মিস্ত্রী পল্লীতে থাকার সময় তাঁর বাসার নীচেই চক্রবর্তী উপাধিধারী এক মিস্ত্রীর শান্তি নামে একটি কন্যা ছিল। চক্রবর্তী এক প্রৌঢ় ও মাতাল মিস্ত্রীর সঙ্গে শান্তির বিবাহের ব্যবস্থা করাতে শান্তিদেবী শরৎচন্দ্রের পায়ে পড়ে তাকে রক্ষা করতে বলেন। তখন শরৎচন্দ্র বাধ্য হয়েই নিজে তাকে বিবাহ করেন। শান্তিদেবীর গর্ভে তাঁর একটি পুত্র সন্তানও হয়, কিন্তু আজীবন যাঁর দুঃখে কেটেছে তাঁর ভাগ্যে স্ত্রী-পুত্র স্থায়ী হবে কেমন করে। প্লেগ রোগে শান্তিদেবী ও শিশুপুত্র মারা গেলে দ্বিতীয় বিবাহ করেন হিরণ্ময়ী দেবীকে— যিনি আজীবন তাঁর জীবন-সঙ্গিনী থেকে তাঁকে শান্তি দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু হিরণ্ময়ী দেবী নিঃসন্তান ছিলেন।

বিবাহের সময় পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের এই দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম ছিল মোক্ষদা। বিবাহের পর শরৎচন্দ্র তাঁর মোক্ষদা নাম বদলে হিরণ্ময়ী নাম দিয়েছিলেন এবং তখন থেকে তাঁর এই নামই প্রচলিত হয়। বিবাহের সময় হিরণ্ময়ীদেবীর বয়স ছিল ১৪ বৎসর। তিনি বিবাহের সময় পর্যন্ত লেখাপড়া জানতেন না, শরৎচন্দ্রই তাঁকে লিখতে ও পড়তে শিখিয়েছিলেন।

হিরণ্ময়ীদেবীর বাবার নাম কৃষ্ণদাস অধিকারী। তাঁর মূল বাড়ি মেদিনীপুর জেলায় শালবনীর নিকটে শ্যামচাঁদপুর গ্রামে। কৃষ্ণবাবু তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর আট বৎসরের কনিষ্ঠা কন্যা মোক্ষদাকে সঙ্গে নিয়ে ভাগ্যান্বেষণে এক মিস্ত্রী বন্ধুর কাছে রেঙ্গুনে গিয়েছিলেন।

হিরণ্ময়ীদেবী নিষ্ঠাবতী ধর্মশীলা মহিলা ছিলেন। তিনি পূজা-পার্বণ ও জপ-তপ নিয়েই অধিকাংশ সময় কাটাতেন। লেখাপড়া না জানলেও স্বামীকে সেবা দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, ভক্তি দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন বলে শরৎচন্দ্র নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্য সাধনায় নিজেকে নিরত রাখতে পেরেছিলেন। শরৎচন্দ্র এই প্রীতি-ভালোবাসাটুকুই পেতে চেয়েছিলেন কিন্তু এ যাবৎ তা না পেয়ে বহু স্থানে দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। এই চিরনেপথ্য-বাসিনী পতিপ্রাণা মহিলাটি তাঁর চিররুগ্ন, দরদী স্বামীর খাওয়া-দাওয়া ও সেবা-যত্নের প্রতি যদি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি না রাখতেন তবে শরৎচন্দ্রের অত্যাচারক্লিষ্ট, রোগজীর্ণ দেহটি যে কয়দিন টিঁকে ছিল, তা-ও থাকত না।

ইতিমধ্যে ১৩১৪ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের অমতেই সৌরীন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায় 'বড়দিদি' প্রকাশ করেছিলেন। তখন অনেকের মত

রবীন্দ্রনাথও এই লেখা পড়ে শরৎচন্দ্রকে প্রতিভাবান লেখক বলে বুঝেছিলেন। পরে 'যমুনা' পত্রিকার জন্য ফণীন্দ্রনাথ পালের অনুরোধে 'রামের সুমতি' গল্পটি তিনি পাঠিয়ে দেন। এইভাবে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ ঘটল।

সুদীর্ঘ বারো বৎসর রেঙ্গুনে অতিবাহিত করে স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণে শরৎচন্দ্রকে বর্মা ত্যাগ করতে হয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে শরৎচন্দ্র হঠাৎ দুরারোগ্য পা ফোলা রোগে আক্রান্ত হন এবং স্থির করেন অফিসে এক বৎসরের ছুটি নিয়ে কলিকাতায় এসে কবিরাজী চিকিৎসা করাবেন। অফিসে শেষ দিনে ছুটি চাইতে যাওয়ায় উপরওয়ালা সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া হয়। ফলে শরচৎন্দ্র চাকরিতে ইস্তফা দিয়েই বরাবরের জন্য রেঙ্গুন ছেড়ে দেশে চলে আসেন। চিকিৎসকের নির্দেশে বর্মা ত্যাগ করা অর্থ নৈতিক কারণে অসম্ভব হয়েও পড়ে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে চাকরি ত্যাগ করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হযেছিলেন। প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা লক্ষ্য করে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে মাসিক একশত টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে শরৎচন্দ্র কলিকাতায় প্রত্যাবতন করেন।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে সস্ত্রীক এসে প্রথমে হাওড়া শহরে ৬নং বাজে শিবপুর ফার্স্ট বাই লেন এবং আট মাস পরে ৪ নম্বরে উঠে যান। এইভাবে বাসা বদল করে থাকতে থাকতে সামতাবেড়ে তার দিদি অনিলাদেবীর গ্রামে রূপনারায়ণের তীরে একটি সুন্দর মাটির বাড়ি তৈরি করেন। বাজে শিবপুরেই তাঁর অধিক গ্রন্থ রচিত হয়, তাই ঐ সময়টাই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের স্বর্ণযুগ।

এইভাবেই তাঁর প্রতিষ্ঠা এল। যশের মুকুট তিনি একে একে পেতে থাকলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' লাভ করলেন ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট্ (D. Litt.), 'সাহিত্যাচার্য' উপাধি পেলেন। রাজনীতিতে নামলেন, সামতাবেড়ে ছাড়াও কলিকাতায় ২৪ নং অশ্বিনী দত্ত রোডে আর একটি বাড়ি করলেন, নিজস্ব একটি গাড়িও কিনলেন এবং সাহিত্যে যাকে গুরু বলে মেনেছিলেন—সেই রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অভিনন্দিত হলেন মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে, তাঁর ৬১তম জন্মদিবস উপলক্ষে।

হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকার সময়েই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ, তারপর পরিচয় গাঢ় হয় জোড়াসাঁকোয় বিচিত্রার আসরে। পরে একাধিকবার শান্তিনিকেতনে ও জোড়াসাঁকোয় শরৎচন্দ্র গিয়েছিলেন,

কবিও একবাব কলিকাতায শবৎচন্দ্রেব বাড়িতে এসেছিলেন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে দেশবন্ধুব আহ্বানে শবৎচন্দ্র কংগ্রেসে যোগ দেন এবং সেই সময থেকে সুদীর্ঘ ১৬ বৎসব তিনি হাওডা জেলা কংগ্রেসেব সভাপতি পদে নিযুক্ত থাকেন। তবে কংগ্রেসেব একজন ছোটখাট নেতা হওযা সত্ত্বেও ভাবতেব মুক্তি আন্দোলনেব সশস্ত্র সংগ্রামী বা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদেব সঙ্গেও যোগাযোগ বেখেছিলেন। এঁদেব নিজেব বিভলবাব, বন্দুকেব গুলি এবং অর্থ দিযেও বিভিন্ন সমযে সাহায্য কবেছেন। এ ছাডাও দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীব সঙ্গেও তাঁব বিশেষ যোগাযোগ ছিল।

শবৎচন্দ্রেব মেজভাই প্রভাস (বেদানন্দ স্বামী) বামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিযে সন্ন্যাসী হযেছিলেন। শবৎচন্দ্র বেঙ্গুন থেকে ফিবে ছোট ভাই প্রকাশকে এনে কাছে বাখেন এবং তাঁব বিবাহ দেন। তাঁব পুত্র-কন্যাকে শবৎচন্দ্র অত্যন্ত ভালোবাসতেন।

জীবনেব শেষ কযেক বৎসব শবৎচন্দ্রেব শবীব মোটেই ভালো যাযনি। অর্শেব পীডা, লিভাব ও কিডনিব দোষ, জ্বব, গা ফোলা বোগ, উদবাময, মাথাব যন্ত্রণা প্রভৃতি নানা বোগে ভুগেছেন। ছেলেবেলা থেকে দাবিদ্র ও অত্যাচাব, নেশা ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনই তাঁব এই পবিণতিব কাবণ। ডাক্তাববা এক্স-বে কবে দেখলেন তাঁব যকৃতে দুবাবোগ্য ক্যান্সাব বাসা বেঁধেছে, অধিকন্তু এই ব্যাধি তাঁব পাকস্থলীকেও আক্রমণ কবেছে। অবিলম্বে অস্ত্রোপচাব প্রযোজন। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ ডাঃ বিধানচন্দ্র বায, ডাঃ কুমুদশঙ্কব বায প্রভৃতি শবৎচন্দ্রেব পেটে অস্ত্রোপচাবেব ব্যবস্থা কবলেন। সে সমযেব বিখ্যাত সার্জন ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায অপাবেশন কবলেন। অস্ত্রোপচাব পর্ব ভালোভাবেই সমাধা হল। সকলেই খুশি। কাবণ, টেবিলে শাযিত অবস্থাতেই প্রাণ-হানিব আশঙ্কা ছিল। কিন্তু চিব অশান্ত মানুষ মৃত্যুব পূর্বেও এক কাণ্ড কবে বসলেন, যাতে নিজেই নিজেব জীবন-দীপ নিবাপিত কবলেন। নিষেধ সত্ত্বেও মুখ দিযে আফিং-এব জল খেলেন। কাবও উপদেশ শুনলেন না। বমি শুরু হল, ডাক্তাববা যথাসাধ্য চেষ্টা কবলেন কিন্তু সব ব্যর্থ হল।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁব অশান্ত, অতৃপ্ত, গতিশীল হৃদয চিবশান্ত হল। কলিকাতা পার্ক নার্সিং হোম-এ, ৬২ বৎসব বযসে ২বা মাঘ ১৩৪৪, ইং ১৬ই জানুযাবী, ১৯৩৮ ববিবাব বেলা দশটায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কবেন। কথা-সাহিত্যেব দেউলে যে দীপটি এতদিন উজ্জ্বলতম শিখা বিকীবণ কবে জ্বলছিল

তা নির্বাপিত হয়ে গেল। শরতের চন্দ্র পশ্চিমাকাশে চির অস্তমিত হল।

মৃত্যুর পূর্বে শরৎচন্দ্র একটি উইল করেন। উইলে তিনি তাঁর যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবীকে জীবনসত্ত্বে দান করেন। হিরণ্ময়ী দেবীর মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্রের পুত্র বা পুত্ররা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হবেন। হিরণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় ২৩ বৎসর পর ১৫ই ভাদ্র ১৩৬৭ সালে মারা যান।

অভিমানী শরৎচন্দ্র নিজের জীবন শুরু থেকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অকালেই এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করলেন। জীবনে কোন্‌টি তাঁকে যশ দেবে এবং কোন্‌টি অখ্যাতি এনে দেবে তার ধার ধারেননি। তাঁর কথাতেই বলি—"আমার বিগত জীবনের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত উদাসীন। জানি এ লইয়া বহুবিধ জল্পনা-কল্পনা ও নানাবিধ জনশ্রুতি সাধারণে প্রচারিত আছে। কিন্তু আমার নির্বিকার আলস্যকে তাহা বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। শুভার্থীরা মাঝে মাঝে উত্তেজিত হইয়া আসিয়া বলেন, এই সব মিথ্যার আপনি প্রতিকার করবেন না? আমি বলি, মিথ্যে যদি থাকে তো সে প্রচার আমি করিনি, সুতরাং প্রতিকার করার দায় আমার নয়—তাঁদের।"

দুরন্ত, নেশাগ্রস্ত, দুর্নামের ভাগী এবং অসুস্থ এই মানুষটি ঝড়ের গতিতে উল্কার মত নিজের অমূল্য জীবনটুকু এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। যতদিন বেঁচে ছিলেন, নিয়ম মানেন নি, গণ্ডি মানেন নি। সাহিত্য ক্ষেত্রে যেমন ধূমকেতুর মত আকস্মিক আবির্ভাব, তেমনি হঠাৎই তা নিঃশেষ করেছেন। অকর্মণ্য হয়ে তিনি বেঁচে থাকতে চাইতেন না। "দীর্ঘজীবনটাই আমার কাম্য নয়—এবং কারও কাম্য হওয়া উচিত নয়. যদি সেই জীবন কর্মশক্তিহীন হয়ে পড়ে। অকর্মণ্য দীর্ঘজীবন আমি মোটেই কামনা করি না, বরং ওকে আমি অভিসম্পাত বলেই মনে করি।" তিনি মনে করেছিলেন তাঁর কর্ম শেষ হয়েছে, তাই নিজেকে আর জোর করে ধরে রাখতে চান নি। তিনি যে ইন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য শ্রীকান্ত। যার মন্ত্রই হচ্ছে, মরতে তো একদিন হবেই। এই রহস্যময় পুরুষটির জীবন তাই তাঁর সাহিত্যের চেয়েও অধিকতর রোমাঞ্চকর। আর এ হেন জীবনটুকু তিনি 'জীবনস্মৃতি' বা আত্মজীবনীতে লিখে রেখে যেতে বোধ করি, কুণ্ঠাবোধ করেছেন। তাই, উপন্যাসের মাধ্যমেই শ্রীকান্তের জবানীতে নিজেকে অনেকখানি ধরা দিলেন, নিজের অভিজ্ঞতার কথা, নিজের ভালোবাসার কথা, প্রকাশ করলেন।

তাই তিনি তাঁর সাহিত্য-শিষ্য লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে

বড় দুঃখ করে লিখতে পেরেছিলেন,—"বড় দরিদ্র ছিলাম, ২০টি টাকার জন্ত একজামিন দিতে পাই নি। এমন দিন গেছে যখন ভগবানকে জানাতাম, হে ভগবান আমায় কিছুদিনের জন্ত জ্বর করে দাও, তাহলে. দুবেলা খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না; উপোস করেই দিন কাটবে। অবশ্য বেশিদিনের জন্যে এ অবস্থা ছিল না। মায়ের মৃত্যুর পরে বাবা প্রায় পাগলের মত হয়ে যা কিছু ছিল সমস্ত বিলিয়ে নষ্ট করে দিয়ে স্বর্গগত হন।......তার পরে পড়তে শুরু করি। ১৪ বৎসর ১৪ ঘণ্টা করে পড়ি। · সেই যে একজামিন দিতে পারিনি কেবল সেই রাগে। বর্মার রেঙ্গুনে ছিলাম কেরানী—হঠাৎ বড় সাহেবের সঙ্গে মারামারি করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই ব্যবসা আরম্ভ করেছি। কিন্তু অকস্মাৎ এমনি কপাল ফিরে গেল যে একেবারে রাতারাতিই একটা বিখ্যাত লেখক হয়ে গেলাম। মাঝে মাঝে সন্ন্যাসীর চেলা হয়েও দিন কাটাতে ছাড়িনি, লীলা, আমার এই জীবনটা আগাগোড়াই যেন একটা মস্ত উপন্যাস। এবং এই উপন্যাসে সব কাজই করেছি শুধু ছোট কাজ কখনও করিনি। যখন মরব—ফরসা খাতা রেখে যাব যার মধ্যে কালির আঁচড় এক জায়গায়ও থাকবে না।"

* * * * *

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৩৪৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যার ভারতবর্ষ পত্রিকায় লেখা হয়েছিল,—"আদি গঙ্গার তীরে যেখানে ভারতবর্ষের কয়েকজন বরেণ্য মহাপুরুষের মৃতদেহ চিতাগ্নিশিখায় ভস্মীভূত হইয়াছে. যেখানে চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন, আশুতোষ, শাসমল, যতীন দাস প্রভৃতির নশ্বর দেহ লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, সেখানে শ্রীকান্তের অমর রচয়িতা, চিরদুঃখ দরদী, আধুনিক কথা-সাহিত্যের নবজন্মদাতা, দরিদ্র বান্ধব শরৎচন্দ্রের রোগক্লিষ্ট কঙ্কালখানি চিতায় তুলিয়া দেওয়া হইল। শরৎচন্দ্রের সহোদর প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও উমাদপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শেষকৃত্য সম্পন্ন করিলেন। সেই চিতা-শয্যার চতুর্দিকে মহীশূর উদ্যানে, পথে-ঘাটে, আদি গঙ্গার ওপারে নদীর তীরভূমিতে সেদিন যে বিপুল জন সমাগম হইয়াছিল তাহা আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোন সাহিত্যিকের মৃত্যুতে ঘটে নাই।......

শীতকালের মলিন সন্ধ্যা ৫-৪৫ মিনিটে শরৎচন্দ্রের চিতায় অগ্নিপ্রদান করা হয়। প্রকাশচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মুখাগ্নি করেন। উমাপ্রসাদ শবদেহের বস্ত্র-গ্রন্থিগুলি মোচন করিয়া দেন। দেখিতে দেখিতে চন্দন কাঠ সজ্জিত চিতা,

লেলিহান শিখায় জ্বলিয়া উঠে। যে শিখায় পুড়িয়াছিল দেবদাস, নীরুদিদি, জ্ঞানদার মা, দুর্গাসুন্দরী—সেই শিখায় আধুনিক বাঙ্গলার সমাজ বিদ্রোহের মন্ত্রগুরু জ্বলিয়া ভস্মরাশিতে পরিণত হইলেন।"

*　　　　　*　　　　　*

শরৎচন্দ্র ছিলেন বাঙালীর দোষ ত্রুটি নিয়ে একজন খাঁটি বাঙালী। যেমন বেগে পরিপূর্ণ, তেমনি সবলে মেরুদণ্ডধারী এবং ধারালো মস্তিষ্ক বিশিষ্ট। বাঙালীর অতি প্রিয় ও আপনার মানুষ। আমি পূর্বেই বলেছি, ইন্দ্রনাথ, দেবদাস ও সব্যসাচী তাঁর জীবন প্রবাহে বয়ে চলেছে। তাই কখনও নিরীহ, কখনও উদ্দাম। তাঁর সৃষ্ট অধিকাংশ চরিত্রই আংশিকভাবে তিনি নিজেই।

দেহ ছিল আগাগোড়া শীর্ণকায়, লোমবিহীন, চর্বিবিহীন শ্যামবর্ণ গায়ের রং। বেশী বয়সে মাথার সমস্ত চুলগুলি সাদা হয়ে গিয়েছিল। চুলে বিশেষ তেল ব্যবহার করতেন না, তাই অবিন্যস্ত থাকত। পোশাক-পরিচ্ছদের বাহুল্য মোটেই ছিল না, অতি সাধারণ। ধুতি, ফতুয়া, পাঞ্জাবী ও প্রয়োজনে চাদর। পায়ে চটি। একেবারে গ্রাম্য সরল সাধারণ মানুষের মত। কিন্তু লেখার সরঞ্জামগুলি মূল্যবান। তিনি লিখন-বিলাসী ছিলেন, চমৎকার দামী কাগজ ও ঝর্ণা কলম ব্যবহার করতেন। হাতের লেখা ছিল মুক্তোর মত ঝরঝরে।

যখন বাড়ি গাড়ি হয়েছে তখনও তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ অতি সাধারণ এবং নিরহঙ্কারী। শহরের চেয়েও গ্রামে থাকতেই বেশী পছন্দ করতেন। কিন্তু ব্যঙ্গরসিক পুরুষ, টিপ্পনী কাটতে অদ্বিতীয় এবং কৌতুকপ্রিয় মজলিসী। যৌবনে দাড়ি কামাতেন কম কিন্তু বেশি বয়সে উল্টো। যৌবনে ছিলেন অনেকটাই উচ্ছৃঙ্খল, বয়সে প্রতিষ্ঠিত।

শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি খুব বড় ছিল না। কেবল বাঙলা, বিহার ও বর্মা এই তিন স্থানে তিনি ব্যাপকভাবে ঘুরেছিলেন। দেশ ঘুরলেই সমাজ এবং মানুষের উপর বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়। এই অভিজ্ঞতার বিচিত্র কাহিনী তিনি সুযোগ পেলেই বন্ধু-বান্ধবদের শোনাতেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব পরিক্রমা করেছিলেন কিন্তু শরৎচন্দ্রের তা ছিল না। তিনি ছিলেন বাঙালী শিল্পী, বিশ্বকবি নন। বাঙালী নর-নারীর হৃদয়-দৌর্বল্যের নিপুণ ব্যাখ্যাকার। যেটুকু দেখতেন, খুঁটিয়ে দেখতে জানতেন। তাঁর চোখ ছিল বুকে। ঠিক সেই কারণেই তাঁর সৃষ্টিতে শিল্পগত দিকের চেয়েও হৃদয়ের প্রাবল্য বেশী, অর্থাৎ বুদ্ধি-প্রধান না হয়ে হয়েছে হৃদয়-প্রধান।

মেয়েমানুষকে তিনি মেয়ে হিসাবে দেখেন নি, মানুষ হিসাবেই দেখেছেন। আর দরদ ছিল উচ্ছৃঙ্খল মানুষের প্রতি এবং জীব জন্তুর প্রতি। মনুষ্যত্বের প্রতি আস্থা হেতু তাঁর ছিল অসীম তেজ। জেদ ছিল বলেই কোথাও মাথা নত করেন নি ; কারও কাছে কখনও হাত পাতেন নি।

শরৎচন্দ্র খুব ভালো গল্প-বলিয়ে ছিলেন। অনেকেই তাঁর গল্প শুনে অভিভূত হয়েছিলেন। এদিক দিয়েও তিনি ছিলেন একজন উঁচুদরের আর্টিস্ট। শুধু গল্প বলার আশ্চর্য ভঙ্গীতেও তিনি ছিলেন ওস্তাদ শিল্পী, অনেকেরই মনে হয়েছে যে শরৎচন্দ্রের লেখা গল্পের থেকেও মৌখিক গল্প বা বৈঠকী গল্প এবং হাস্য পরিহাসে ভাবের সংক্রামতা আরও অব্যর্থ ছিল। কিন্তু এই মানুষটিই সভা-সমিতি একেবারে বর্জন করে চলার চেষ্টা করতেন, কারণ, সভা সমিতিতে বক্তৃতা দিতে গেলে প্রচণ্ডভাবে নার্ভাস হয়ে পড়তেন। যদিও বেশি বয়সে তা কিছুটা কাটিয়ে উঠেছিলেন।

প্রচণ্ড রবীন্দ্রভক্ত ছিলেন বলেই তাঁর প্রতি ছিল প্রচণ্ড অভিমান। প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন। "প্রমথ, একটা অহঙ্কার করব—মাপ করবে? যদি কর তো বলি। আমার চেয়ে ভাল Novel কিম্বা গল্প এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবে না।" আবার রবীন্দ্রনাথেরও ছিল তাঁর প্রতি অত্যন্ত স্নেহ ও প্রীতি কিন্তু তিনিও একদা বলতে ছাড়েন নি যে, "অনেকে গল্প রচনা সম্বন্ধে শরৎকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে থাকেন, তাতে আমার ভাবনার কারণ নেই এই জন্য যে, কাব্য রচনায় আমি যে শরতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এ-কথা অতি বড় নিন্দুকেও অস্বীকার করতে পারবে না।" উভয়েরই সহ্য করার শক্তি ছিল অসীম। এবং উভয়কেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে।

শরৎচন্দ্র গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ নিয়ে উনচল্লিশখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাছাড়া তিনি তিনখানি বারোয়ারি উপন্যাসের (বারোয়ারী উপন্যাস, রসচক্র, ভালমন্দ) কিছু অংশ এবং 'শেষের পরিচয়' নামে আর একখানি উপন্যাসের প্রথম পনেরো পরিচ্ছেদ রচনা করেন।

অধিক বয়সে 'হুঁকা' ছাড়া শরৎচন্দ্র বেশীক্ষণ থাকতে পারতেন না ; এমন কি যখন তিনি লিখতেন, তখনও এই বস্তুটির ব্যবহার বন্ধ থাকত না। সারাদিনে বহুবার চা পান করতেন।

তিনি কিছু কিছু হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমিক চিকিৎসা সম্বন্ধেও অভিজ্ঞ ছিলেন এবং নিজেই গ্রামের দরিদ্র মানুষদের প্রয়োজনমত ওষুধ দিতেন।

এই দুরন্ত ও দুঃসাহসী শিল্পী মানুষটির অন্তর ছিল দরদে ভরা। চিরকালই তাঁর ঐ দুঃসাহসিকতার মধ্যে একটি পরদুঃখকাতর দরদী মন লুকিয়ে ছিল। দেবানন্দপুরে, ভাগলপুরে, রেঙ্গুনে, হাওড়ায়, সামতাবেড়ে, বালিগঞ্জে—সর্বত্রই দরিদ্র, পীড়িত, দুঃখী মানুষের জন্ত তাঁর মনটি কেঁদে কেঁদে ফিরেছিল।

শুধু মানুষ কেন—পশুপক্ষীর উপরও শরৎচন্দ্রের ছিল অসীম দরদ। নানা-প্রকার পাখি, কাঠবিড়ালী, কুকুর প্রভৃতি তিনি পুষে ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার সফলতার মূলে কিছুটা ছিলেন তাঁর পিতা মতিলাল। পিতার সুন্দর হাতের লেখা খাতাটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন শরৎচন্দ্র আর অসমাপ্ত রচনাগুলির সম্ভাব্য পরিণতির কথা ভাবতেন। এমনি করেই বালক শরৎচন্দ্রের মধ্যে জেগে ওঠে সাহিত্যপ্রীতি। দেবানন্দপুরে গল্প লেখায় তাঁর হাতে খড়ি।

সাহিত্য ছাড়াও দর্শন, ইতিহাস, বায়োলজি ও বোটানির বইও তিনি পড়তেন। ডারউইন, মিল, হাক্সলি এবং হার্বার্ট স্পেন্সার ছাড়াও ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ডিকেন্স্, জোলা, অস্টেন, হেনরি উড, মেরি করেলি, টলস্টয় এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেরণাস্থল ছিল।

সাহিত্য প্রতিভার সঙ্গে ছিল চিত্রশিল্পের প্রতি ঝোঁক। তাঁর অঙ্কিত প্রথম ছবিটির নাম 'রাবণ-মন্দোদরী', পরের চিত্র 'মহাশ্বেতা'। সঙ্গীতেও ছিল তাঁর মনমোহিনী শক্তি। সুমিষ্ট সুরলহরী ছিল তাঁর অপূর্ব জনপ্রিয়তার কারণ। তাঁর কীর্তন ও মহাজন পদাবলী গান ছিল অপূর্ব। তবলা, বেহালা, এসরাজ, হারমোনিয়াম ও বাঁশি বাজাতে পারতেন। অভিনয়েও ছিলেন ওস্তাদ।

আর, বাল্যকাল থেকেই তাঁর ছিল ঈশ্বরে ভক্তি। ভাগলপুরে গঙ্গার ধারে নিমকামরাঙা লতার বনে তৈরি করেছিলেন 'তপোবন'। এই তপোবনে তিনি ঈশ্বরের ধ্যান করতেন।

তাঁর কথাতেই তাঁর জীবন-কথা শেষ করি, যা তিনি বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে, 'তোমার দিকে চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই'।

সমগ্র জীবনে বিভিন্ন স্থানে কাল-যাপন।

শরৎচন্দ্রের এক স্থানে জীবন অতিবাহিত করার সুযোগ ঘটেনি তা পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে; তবুও মোটামুটিভাবে এখানে তাঁর সমগ্র জীবনের অতিবাহিত

কালের একটা সময় সূচী নির্ণয় করার চেষ্টা করা হল। নির্ভুলভাবে এটি করা সম্ভব নয় এই জন্য যে, শরৎচন্দ্র শৈশবকাল থেকেই বারংবার স্থান পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছিলেন। নিম্নে বন্ধনীর মধ্যে যে সাল-তারিখ দেওয়া হল তার মধ্যেও শরৎচন্দ্রকে কখনও কখনও দেবানন্দপুর ও ভাগলপুরে স্থান পরিবর্তন করে বসবাস করতে হয়েছে, তাই নিম্নে সাকুল্যে বা একুনে তিনি কোথায় কত বছর কাটিয়েছেন তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে দেওয়া হল।

শৈশব—দেবানন্দপুর (১৮৭৬, ১৫ই সেপ্টেম্বর—'৮৫)।
বাল্যকাল—ডিহরী-ভাগলপুর (১৮৮৫-৮৯ জুন)।
কৈশোর—দেবানন্দপুর (১৮৮৯-'৯৩।
প্রথম যৌবন—ভাগলপুর (১৮৯৩-১৯০২, শেষার্ধ ছয় মাসের মত কলিকাতায় অতিবাহিত)।
যৌবন—রেঙ্গুন (১৯০৩, জানুয়ারী—১৯১৬, ৩রা এপ্রিল)।
প্রৌঢ় জীবন--বাজে শিবপুর ও শিবপুর (১৯১৬, এপ্রিল—১৯২৬, ফেব্রুয়ারী)।
প্রৌঢ় জীবন—সামতাবেড় (১৯২৬-'৩৪)।
শেষজীবন—সামতাবেড় ও কলিকাতা (১৯৩৫-১৯৩৮, ১৬ই জানুয়ারী)।

বিভিন্ন স্থানে অতিবাহিত কালের সময় তালিকা।

দেবানন্দপুর সাকুল্যে	বা	একুনে	১২	বৎসর।
ভাগলপুর ,,	,,	,,	১৩	,,
মজঃফরপুর-কলিকাতা ,,	,,		২	,,
রেঙ্গুন ,,	,,	,,	১৩	,,
শিবপুর ,,	,,	,,	১০	,,
সামতাবেড় ,,	,,	,,	৯	,,
সামতাবেড়-কলিকাতা ,,	,,		৩	,,
মোট—			৬২	বৎসর

কথাবস্তু

স্মৃতিরে আকার দিয়ে আঁকা

বোধে যার চিহ্ন পড়ে ভাষায় কুড়ায়ে তারে রাখা

কী অর্থ ইহার মনে ভাবি।

এই দাবি

জীবনের এ ছেলেমানুষি,

মরণেরে বঞ্চিবার ভাণ করে খুশি,

বাঁচা-মরা খেলাটাতে জিতিবার শখ

তাই মন্ত্র পড়ে আনে কল্পনার বিচিত্র কুহক।'

রবীন্দ্রনাথ।

বিষয়বস্তুর বিচারে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করলেও 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটিকে কোন শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। শরৎ-সাহিত্যে এর কোন দোসর নেই। পারিবারিক বা রোমান্টিক প্রেমমূলক এবং সামাজিক সমস্যা-মূলক ঘটনা 'শ্রীকান্তে' থাকলেও এটি একটি স্বতন্ত্র ধরণের গ্রন্থ। এর মধ্যে সামাজিক-সমস্যা-মূলক চিত্র আছে, সামাজিক দৃষ্টিতে আপত্তিকর মানবিক সম্পর্কের চিত্র আছে এবং চিত্র রচনা ও চরিত্র সৃষ্টিও আছে, কিন্তু কোন সামাজিক বক্তব্য উপস্থিত করার প্রতি লেখকের প্রবণতা নেই; উপন্যাসের মধ্যে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে ব্যক্তিরূপ।

আসলে, 'শ্রীকান্ত' আত্মজীবন-নির্ভর উপন্যাস। জীবনের কথা লিখতে বসে অদৃশ্য চিত্রকরের আঁকা অন্তর্জীবনের ছবিগুলিকে যেমন কেউ কেউ সাজিয়ে যান, সেই ভঙ্গিতেই শ্রীকান্ত তাঁর আত্মজীবনের গল্প বলে গেছেন। আর শ্রীকান্তের জবানীতে শরৎচন্দ্র নিজের অভিজ্ঞতার অস্পষ্ট ধারণাগুলিকে বাস্তবে না রেখে সৃষ্টির অনিবার্য কৌশলে তাকে 'সাহিত্যিক বাস্তবে' উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। এবং শরৎচন্দ্র যে সমস্ত চরিত্রগুলির সম্মুখীন হয়েছিলেন সেগুলিতে বাস্তবের উপরে অনেক রঙ ফলিয়ে, কল্পনার রমণীয় বর্ণ এবং অনুভূতির গাঢ় রসের সহযোগে সেই বাস্তব চরিত্রগুলিকে শিল্পমূর্তিরূপে সৃষ্টি

করেছেন। সেইজন্য প্রচলিত উপন্যাসের কাহিনী গ্রন্থনা বা Plot ‘শ্রীকান্তে’ পাওয়া যাবে না।

উপন্যাসটি চারিটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বের প্রকাশ কাল ১৩২৩ সালের মাঘ মাস; ইংরেজী ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৭। পৃষ্ঠা সংখ্যা—১৫৯। প্রথম পর্বটি ব্রহ্মদেশে লিখিত শরৎচন্দ্রের শেষ গ্রন্থ। ১৯১৬ সালের ১১ই এপ্রিল শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করেন। সুতরাং শরৎচন্দ্রের এ-দেশে আসার পর ‘শ্রীকান্তে’র কিছুটা অংশ ‘ভারতবর্ষে’ প্রকাশতি হয়। শরৎচন্দ্র অন্যান্য রচনায় প্রত্যক্ষ বর্ণনারীতি গ্রহণ করেছেন কিন্তু এখানে আত্মজীবনীমূলক রীতি অনুসরণ করেছেন।

একদা কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়েদের জীবন যে কি প্রকার অভিশপ্ত ছিল, প্রথম পর্ব পড়লে তা জানা যাবে। পণ নিয়ে বয়স্ক কুলীন বিয়ে করে বেড়াত অনেক। অন্নদাদিদি ও রাজলক্ষ্মীর সেই করুণ চিত্র এই পর্বে পাওয়া যায়।

খেলার মাঠের উত্তেজনা দিয়ে উপন্যাসের কাহিনী শুরু। তারপর ইন্দ্রনাথের নির্ভীকতা-সূচক একটি ঘটনা, শ্রীকান্তের পড়াশুনার কৌতুকময় ঘটনা ও বহুরূপীর আবির্ভাবের উত্তেজনা। গম্ভীর ও কৌতুকপূর্ণ ঘটনার প্রায় একান্তর সংস্থাপনে শরৎচন্দ্র প্রথম পর্বের প্রথম ভাগের কাহিনীকে জমিয়ে রেখেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগে যে কাহিনী রাজলক্ষ্মীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তাতে তিনটি শিথিল অংশ আছে। এক, শ্মশান দৃশ্যের বর্ণনা; দুই, টিকিট কেটে অজ্ঞাত এবং অখ্যাত স্টেশনে নেমে পড়া এবং তিন, সন্ন্যাসীর দলে ভিড়ে যাওয়া।

কিন্তু এই শিথিল অংশটুকু থাকা সত্ত্বেও ‘শ্রীকান্ত’-র চারটি পর্বের মধ্যে প্রথম পর্বটিই শ্রেষ্ঠ। আত্মজীবন-নির্ভর এই উজ্জ্বল স্মৃতিচিত্রমালা আত্মস্মৃতিমূলক উপন্যাসের নতুন ধরণের শিথিল-গ্রন্থিত গঠনভঙ্গিকে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে একেবারেই প্রথম আমদানি করেছে। উপন্যাস একটিমাত্র রীতি অনুসরণ করে না, সুসংবদ্ধবৃত্ত উপন্যাস যেমন আছে তেমনি শিথিল-বৃত্ত উপন্যাসও রয়েছে।

(প্রথম পর্বের প্রথম স্তর সপ্তম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরে শ্রীকান্তের কৈশোর লীলাই বর্ণিত। এই স্তরের নায়ক ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথের প্রভাবেই শ্রীকান্ত ঘরের শাসনের প্রতি উদাসীন, বিপদের কটাক্ষঘাতে চিরচঞ্চল, প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এবং অবজ্ঞাত মানুষের মূল্য আবিষ্কারে আগ্রহী। আবার ইতনাথের বিপরীত প্রভাব এসেছিল অন্নদাদিদির কাছ থেকে। অন্নদা-

দিদিকে দেখেই নারী সম্পর্কে তার অন্তরে চিরকালীন শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমবোধের সূচনা।

দ্বিতীয় স্তরের শুরু অষ্টম পরিচ্ছেদে; প্রথম স্তরের বৎসর দশেক পরে। দীর্ঘ ব্যবধানের পর কাহিনীর যবনিকা উঠেছে কুমার সাহেবের শিকার কাহিনীর যবনিকা উঠেছে কুমার সাহেবের শিকার কাহিনীকে উপলক্ষ করে, শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মী সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে। পরে অসুস্থ অচৈতন্য শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর ঐকান্তিক সেবা যত্নের মধ্যে তার আর এক মহিমময়ী পরিচয় লাভ করে। তবু শ্রীকান্তকে রাজলক্ষ্মীর সংস্পর্শে ত্যাগ করে চলে যেতে হল। দেশের উদ্দেশ্যে ফেরবার সময় শ্রীকান্তের মনে এই চিন্তাই উঁকি দিতে লাগল যে, 'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না— ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে।'

প্রথম পর্ব প্রকাশের দু'বছর পর ১৩২৫ সালের ভাদ্র মাসে (২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৮) দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৯ থেকে ৩১৮। এই পর্বটি শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন হাওড়া-শিবপুরে বাস করবার সময়ে। প্রথম পর্বে যেমন লেখকের ভাগলপুরের বহু ঘটনার উল্লেখ আছে তেমনি দ্বিতীয় পর্বে ব্রহ্মদেশ পর্বের নানা ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে এবং শেষ অংশে দেবানন্দপুরের পল্লী ভবনের স্মৃতিটুকু ফুটে উঠেছে। প্রথম পর্বে শ্রীকান্তের কৈশোর ও যৌবনের কাহিনী শেষ করে দ্বিতীয় পর্বে তাকে সংসারের পরিচিত চক্রের আবর্তনে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তাকে সামাজিক মানুষে পরিণত করা হয়েছে। তাই এই পর্বে সমাজের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ সম্পর্কে শাণিত প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে অভয়া চরিত্রটির মাধ্যমে। প্রথম পর্বে যে শরৎচন্দ্র অন্নদাদিদিকে দেখিয়েছেন তিনিই এই পর্বে অভয়াকে দেখালেন এবং অভয়ার মুখ দিয়ে এক লাঞ্ছিতা নারীর অকপট স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে তাঁরই অগ্নিময় বিদ্রোহ-বাণী শোনালেন।

রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের জীবনে অভয়ার সাহসী জীবনবোধ প্রেরণা দিলেও, শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর নিষিদ্ধ প্রেমে দুঃসাহসের বেগ কিছুটা আনলেও নানা বিছিন্ন ঘটনার সমষ্টি সাজিয়ে দ্বিতীয় পর্বটি গড়ে তোলা হয়েছে।

এই পর্বে প্রবাসী বাঙালীর জীবন যাত্রা এবং বর্মীদের জীবন যাত্রার কিছু পরিচয় মিলবে। জাহাজে ডেকের যাত্রীদের দুরবস্থার কথা—নন্দ মিস্ত্রী আর টগর বোষ্টমির ঝগড়া—সমুদ্রে সাইক্লোন—প্লেগ-মহামারির ভয়াবহ চিত্র- সাহেবের লাথি খেয়ে দেশীয় কুলিদের নির্লজ্জ হাসি—বর্মী মেয়ের সরল ভালবাসা আর, সর্বোপরি অভয়া-রোহিণীর গল্প পাওয়া যায়। এছাড়া, রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের

কথাও আছে—যারা কোনদিন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারল না বটে কিন্তু বিবাহের চেয়েও বড় বন্ধন চিরদিন তাদের জীবনে অক্ষুন্ন হয়ে রইল।

দ্বিতীয় পর্বের শেষে সমাজের প্রতিকূল দৃষ্টির মধ্যে শ্রীকান্ত তার 'লক্ষ্মী'কে স্বীকার করে নিল। শ্রীকান্ত বুঝল যে এই সর্বত্যাগী মেয়েটি কেবলমাত্র তার জন্যই এই দুঃখ-স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়েছে। গ্রামের ঠাকুরদাদা শ্রীকান্তের কাছে রাজলক্ষ্মীর পরিচয় চাইলে রাজলক্ষ্মীর মুখ মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তাই মিথ্যার আশ্রয় নিয়েই শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর হাতের উপর একটু চাপ দিয়ে বলল, 'তুমি স্বামীর সেবা করতে এসেছ, তোমার লজ্জা কি রাজলক্ষ্মী !'

কিন্তু তৃতীয় পর্বে শ্রীকান্তের গঙ্গামাটির জীবনে বিলম্বিত লয় এসেছে। তবে এখানে কাহিনী প্রথম দুই পর্বের মত অসংলগ্ন নয়, উপন্যাসের মতই অনেকটা ধারাবাহিক। বরং পূর্বের দুই পর্বের অসংলগ্ন ঘটনাগুলি আরও উজ্জ্বল ও গতিশীল। এখানে ধারাবাহিক কাহিনী এলেও ধারার মধ্যে ম্লান মন্থরতা কৃত্রিমতার বিস্বাদ এনেছে। অর্থাৎ এই পর্বটি পূর্বের দু'টি পর্বের মত সরস ও সুখপাঠ্য নয়।

গঙ্গামাটিতে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের বসবাসের সময়ে ধর্মের প্লাবনে রাজলক্ষ্মীর প্রেম গিয়েছে ভেসে, থেকেছে কেবল স্মৃতি। এই পর্বে যে নূতন নারী চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে, তার নাম সুনন্দা। সুনন্দা তেজস্বিনী, রাজলক্ষ্মীর ধর্মবাতিকের পিছনে তার প্রভাব আছে বটে কিন্তু সুনন্দা পাঠকের কাছে তেমন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারেনি। গঙ্গামাটির নিম্নশ্রেণীর মানুষদের সুখ-দুঃখ, অভাব-অনটন, হাসি-কান্নার কথা আছে। আর সন্ন্যাসী বজ্রানন্দর কথা এই পর্বের গুরুত্ব বাড়িয়েছে। বজ্রানন্দ শিক্ষা-দীক্ষা সেবা-চিকিৎসার ব্রত নিয়ে তাদের মধ্যে এসেছে।

এই সুনন্দা ও বজ্রানন্দের প্রভাবে রাজলক্ষ্মীর মন শ্রীকান্তের নিকট থেকে ক্রমশঃ সরে গিয়ে ধর্মের মাদকতায় বিভোর হয়ে পড়েছে। গঙ্গামাটি ছাড়বার পরও গঙ্গামাটির ধর্মীয় আবেগ রাজলক্ষ্মীকে ছাড়েনি, কাশীতে গিয়ে তা উৎকট আত্মনিগ্রহের রূপ ধারণ করেছে। শ্রীকান্ত বুঝেছে রাজলক্ষ্মীর জীবনে তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাই তৃতীয় পর্বে শ্রীকান্তের মর্মপীড়াই কাহিনীটির করুণ রসের প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে। শ্রীকান্তের বেদনাবিদ্ধ অন্তরের নীরব অভিমান অবিরল অশ্রুধারায় সকলের অগোচরে ঝরে পড়েছে।

তৃতীয় পর্বের প্রকাশকাল ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল (চৈত্র, ১৩৩৩)। পৃষ্ঠা সংখ্যা—৩১৯ থেকে ৪৮৫। দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশের প্রায় সাড়ে আট বৎসর

পর তৃতীয় পর্ব প্রকাশিত হয়। এই পর্বে তাই শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি আবেগধর্মী ও রসসন্ধানী না হয়ে অনেকটা যেন মননধর্মী, বিচারশীল ও তত্ত্ববিলাসী হয়ে পড়েছে। শরৎচন্দ্রের বয়স তখন প্রায় পঞ্চাশ-একান্ন বৎসর।

এতদিন শ্রীকান্তই রাজলক্ষ্মীকে কাঁদিয়েছে, এবার শ্রীকান্তের নিঃসঙ্গতার ফলেই এখানে তার মধ্যে একপ্রকার অন্তর্মুখীনতা ও নিভৃত দুঃখবিলাসের মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে। বর্মা যাবার প্রাক্কালে রাজলক্ষ্মীর কাছে শ্রীকান্ত বিদায় নিল। 'গাড়ী ছাড়িয়া দিলে দুই চোখ দিয়া আমার ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।' —এইভাবে শ্রীকান্তের চোখের জলের মধ্য দিয়ে তৃতীয় পর্বের সমাপ্তি ঘটেছে।

এর পাঁচ-ছয় বৎসর পরই চতুর্থ পর্ব, ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ, প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮৭ থেকে ৭০৬।

এই পর্বে কমললতাকে কেন্দ্র করে রোমান্টিক ভাবপ্রবাহ সৃষ্টি করে মন্থরতার কৃত্রিমতাকে কিছুটা চাপা দেবার চেষ্টা হয়েছে। কমললতাকে কেন্দ্র করে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের সম্পর্কও নতুন করে যাচাইয়ের চেষ্টা আছে; কিন্তু প্রেমের মধ্যে ধর্মীয় আবেগ চরিত্রের প্রাণশক্তি নষ্ট করেছে। এই পর্বের দৃশ্যগুলি সংলাপ-বহুল, ঘটনা-বৈচিত্র্যের অভাব। কমললতার প্রৌঢ় প্রেমে বাক্-মাধুর্য আছে, কিন্তু উচ্ছলতা নেই। বরং গহরের বিফল সাহিত্য প্রয়াসের করুণ কাহিনী মমতা জাগায়। কিন্তু প্রৌঢ় বয়সের বন্ধুত্বের চিত্রের সঙ্গে বালক ইন্দ্রনাথের বন্ধুত্বের চিত্রের তুলনা হয় না। অতঃপর কমললতার লক্ষ্যহীন ভাববিলাস প্রেমের দৃশ্যে রাজলক্ষ্মীর মঞ্চে প্রবেশ, এবং রাজলক্ষী কর্তৃক কমললতার হাত থেকে শ্রীকান্তর উদ্ধার।

তবে, গ্রাম্য কবি গহর এবং পদস্খলিতা ধনী কন্যা উষার পরিণতি বৈষ্ণবিনী কমললতার প্রেম যেন কাব্য-রূপ লাভ করেছে। লেখক, 'এ বইটি সত্যিই যত্ন করে মন দিয়ে' লিখেছিলেন; 'হৃদয়বান পাঠকের ভালো লাগার জন্য।' প্রথম পর্বে শ্রীকান্ত দার্শনিক, দ্বিতীয় পর্বে সমালোচক, তৃতীয় পর্বে নিঃসঙ্গ দেশপ্রেমিক এবং চতুর্থ পর্বে সে কবি—তার স্বপ্নালু দৃষ্টি সৌন্দর্যের মায়ালোকে নিবদ্ধ।

কমললতাকে বৃন্দাবনের ট্রেনে তুলে দিতে শ্রীকান্ত সাঁইথিয়া স্টেশনে গেল এবং গাড়িতে তুলে দিয়ে বলল, 'তোমার পথ, তোমার সাধনা নিরাপদ হোক—আমার বলে আর তোমাকে অসম্মান করবো না।'...

'শুধু মনে হইল হাত তুলিয়া সে যেন আমাকে শেষ নমস্কার জানাইল।'

শ্রীকান্ত এইভাবে কমললতাকে ঈশ্বরের নিকটে সমর্পণ করে শেষ বিদায় জানাল।

শরৎচন্দ্রের জন্মভূমি দেবানন্দপুর এবং তার সন্নিহিত অঞ্চল চতুর্থ পর্বের ঘটনা স্থল। কৃষ্ণপুরের আখড়া রূপ পেয়েছে মুরারিপুরের আখড়াতে। শরৎচন্দ্রের প্রথম যৌবনের বিচরণ-ভূমি ভাগলপুরের কথা পাওয়া গেছে প্রথম পর্বে। ভাগলপুরে শরৎচন্দ্র সাকুল্যে প্রায় ১৩ বৎসর অতিবাহিত করেন এবং রেঙ্গুনেও অতিবাহিত করেন ১৩ বৎসর। রেঙ্গুন পর্ব তাই দ্বিতীয় পর্ব। তৃতীয় পর্বের অধিকাংশ ঘটনা ঘটেছে বীরভূমের গঙ্গামাটি গ্রামে। শরৎচন্দ্রের পল্লীকেন্দ্রিক গল্প উপন্যাসের পটভূমি হল প্রধানত হুগলী হাওড়ার গ্রামাঞ্চল, কিন্তু তৃতীয় পর্বে তিনি বাঙলার একটি ভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও মানবিক পটভূমি গ্রহণ করেছিলেন। চতুর্থ পর্বে তিনি নিজ জন্মভূমিতে ফিরে এসেছেন। প্রথম পর্ব লেখার সতের বৎসর পরে, মৃত্যুর প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে, চতুর্থ পর্বটি তিনি লেখেন। ৩৯ বৎসর বয়সে 'শ্রীকান্ত' লেখা শুরু করেন, ৫৬।৫৭ বৎসর বয়সে শেষ করেন। তাই পরিণত বয়সে পূর্বেকার হৃদয়াবেগের প্রাবল্য ও দুঃসাহসিক ঘটনার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ স্বাভাবিক ভাবেই পরিবর্তিত হয়ে পরিণত জীবন দৃষ্টিই ফুটে উঠেছে। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' পঞ্চম পর্ব লেখার ইচ্ছা ছিল, এবং এতে অভয়া চরিত্রটির পূর্ণাঙ্গ একটি রূপ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, চতুর্থ পর্ব লেখার পাঁচ বৎসর পরই, তাঁর মৃত্যু হয়।

নিটোল কাহিনীবৃত্ত রচনার যে গুণটি শরৎচন্দ্রর সহজাত ছিল, শেষ বয়সে দার্শনিক ও আদর্শবাদী প্রচারকের ভূমিকা নেওয়ার দরুণ সে গুণটির অনেকটা তিনি হারিয়েছিলেন। এবং ঠিক সেই কারণেই দেখি, তাঁর অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে 'শ্রীকান্তে'র প্রথম দুই পর্ব যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, সুদীর্ঘ ৮।৯ বৎসর পর তৃতীয় পর্ব এবং আরও ৫।৬ বৎসর পর চতুর্থ পর্বে শরৎচন্দ্র অভিজ্ঞতার সক্ষেত্র লঙ্ঘন করে অনেকটা আদর্শবাদী কথক হয়ে বসেছেন। সেই কারণে তাঁর পরিণত বয়সের রচনা 'পথের দাবী' ও 'শেষ প্রশ্ন' নিয়েও এত বিতর্কের অবতারণা ঘটেছে।

'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে শ্রীকান্তের বয়স পনেরো, চতুর্থ পর্বে শ্রীকান্তের বয়স বত্রিশ এবং রাজলক্ষ্মীর বয়স সাতাশ বৎসর, কিন্তু শরৎচন্দ্রের বয়স তখন সাতান্ন সুতরাং শ্রীকান্তের সঙ্গে লেখকের বয়সের ব্যবধান আছে। লেখকের এই প্রৌঢ় বয়সের মানসিকতাই শ্রীকান্তের মধ্যে যৌবনোচিত উত্তাপ ও উত্তেজনা এনে

দেয়নি। পরিণত বয়সের ভাবুকতা ও অন্তর্মুখীনতাই প্রাধান্য পেয়েছে। শ্রীকান্তের মনে আসন্ন মৃত্যুর ছায়াপাত এবং বিষন্নতা এক বত্রিশ বৎসর বয়সের যুবকের পক্ষে স্বাভাবিক হয়নি। আসলে এখানে সাতান্ন বৎসর বয়সের বিদায়ী স্রষ্টার ভাবুকতা ও অন্তর্মুখীনতাই বত্রিশ বৎসর বয়সের যুবকের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত বয়সের সঙ্গে ভাবনার অসঙ্গতি ঘটিয়েছে। তবে মৃত্যুর যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হবার পূর্বে মানুষ বেদনাকরুণ আলোকে জীবনকে যে কত সুন্দর দেখে তা এই পর্বে প্রকাশ পেয়েছে। জীবনের শেষ পর্বে শরৎচন্দ্রের মনে যে ক্ষমাসুন্দর ও করুণাস্নিগ্ধ ভাব জন্মলাভ করেছিল তার প্রকাশ ঘটেছে এই চতুর্থ পর্বে। তাই 'শ্রীকান্ত' চারটি পর্বের মধ্যে এরূপ মাধুর্যময়, সৌন্দর্যময় ও সঙ্গীতময় অংশ আর পাওয়া যায় না।

'শ্রীকান্ত' অন্যান্য উপন্যাসের ভাষ্য

> 'শ্রীকান্তের ভাগ্যে যে সমস্ত বিচিত্র বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাহা শরৎচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসের মানসিক উদারতা ও সূক্ষ্ম নীতিজ্ঞানের মূল ; যে আলোক তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসে ছড়াইয়া পড়িয়াছে 'শ্রীকান্তে'ই তাহার আদি উৎস।'
>
> শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

শরৎচন্দ্র জীবনকে নানারূপে দেখেছিলেন। বহুরূপী জীবনপট-বিধৃত বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। তিনি জীবনে বহু মানুষ এবং বহু ঘটনার সংস্পর্শে এসেছেন। এই সমস্ত কিছুর প্রসাদ তাঁর উপন্যাসে মেলে। সাপুড়ের চরিত্র, জমিদারের মোসাহেবদের আচার-আচরণ, ইন্দ্রনাথের দুঃসাহসী নিশীথ অভিযান বর্ণনা, সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবন যাত্রা, ছিদাম বহুরূপীর কাহিনী, মেজদার অত্যাচার, টগরের জাত্যাভিমান, নতুনদার পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি বর্ণনা ও শ্মশান অধ্যায়ে শ্রীকান্তের উচ্চাঙ্গ কল্পনা, রাত্রিচর পাখিদের বিচিত্র সঙ্গীত, এছাড়া সমুদ্রবক্ষে সাইক্লোন—শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতার আশ্চর্য ফসল, শরৎ-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সুতরাং টলস্টয়ের ক্ষেত্রে যে রকম, শরৎচন্দ্রের

ক্ষেত্রেও 'Nothing seems to escape him. Nothing glances off him unrecorded, everything, every feather sticks to his magnet.' পর্যটক লেখকের অভিজ্ঞতা যে কী প্রচণ্ড শক্তির আধার, শরৎচন্দ্রের বর্ণনায় তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের গল্প বলার মনোরম ভঙ্গি তাঁর অভিজ্ঞতাকে পাঠকের সামনে রূপময় করে তুলেছে। এই কারণেই মনীষী রোমা রোঁলা 'শ্রীকান্ত' প্রথম ভাগের অনুবাদ পড়ে (১৯২৭) বলেছিলেন, 'নোবেল প্রাইজ পাওয়ার যোগ্য।'

'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের প্রধান উপন্যাসগুলির অন্যতম। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কালানুক্রমের বিচারে 'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের পরিণত জীবনের রচনা। 'শ্রীকান্ত' প্রথম দুই পর্ব (১৯১৭-১৮) 'চরিত্রহীন' ও 'গৃহদাহ' রচনার কাছাকাছি সময়ে রচিত। শেষের দুই পর্ব 'শেষ প্রশ্নে'র (১৯২৭, ১৯৩৩) সমসাময়িক। সুতরাং সহজেই অনুমেয়, একটি সচল সংবেদনশীল পর্যবেক্ষক মন দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ও মননের ভিতর দিয়ে শেষ জীবনে যে সকল সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলেন 'শ্রীকান্তে' তার প্রতিফলন ঘটেছে। গ্রন্থটি আপাতদৃষ্টিতে শ্রীকান্ত নামক একটি কাল্পনিক চরিত্রের স্মৃতি-চারণা হলেও শ্রীকান্ত আসলে লেখকেরই মানস-রূপ। কাহিনীতে বর্ণিত কাল্পনিক ঘটনাগুলির মধ্যে শরৎচন্দ্রের জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার মূল সত্যগুলি প্রতিফলিত।

গ্রন্থখানি প্রকাশ করবার পূর্বে শরৎচন্দ্রের মনে যথেষ্ট সংশয় ছিল যে, পাঠক সাধারণ হয়তো এ গল্প পড়ে খুশি হতে পারবে না। চারিটি পর্বে এই উপন্যাসটি শেষ (?) হয়েছে। অন্যান্য উপন্যাসের মত এর মধ্যে নিবিড়, অবিচ্ছিন্ন ঐক্য নেই। শ্রীকান্ত যেন ভারতের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কতকগুলি চরিত্রকে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে—যাদের পরস্পর যোগাযোগে কাহিনীর গ্রন্থন ও ঘনতা ঠিক উপন্যাসের নিবিড়তায় পৌঁছায়নি। কিন্তু উপন্যাসের এক একটি পরিচ্ছেদে মহামূল্য রত্ন লুকিয়ে আছে। প্রতিটি পরিচ্ছেদে অসাধারণ বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব সহজেই চোখে পড়ে, আর 'শ্রীকান্তে'র অন্যান্য পর্বের মধ্যে প্রথম পর্বই শিল্পসৃষ্টির দিক থেকে উন্নততর এবং শক্তিশালী চরিত্র অঙ্কনে সমৃদ্ধ। 'শ্রীকান্তে'র প্রথম পর্বেই এক নূতন ধরণের বাঙলা উপন্যাসের সূত্রপাত যার সাক্ষাৎ এই উপন্যাসের আদর্শে পরবর্তীকালে পাওয়া গেলেও, পূর্বে আমরা কখনও পাইনি। শরৎচন্দ্রই প্রথম আত্ম-কাহিনীর ছলে উপন্যাস লিখলেন।

প্রথম পর্বের এই মূল্যটুকু ছাড়া দ্বিতীয় পর্বে অভয়ার নির্ভীক বিদ্রোহ ও বর্মার পটভূমিকায় অনেক বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তৃতীয় পর্বে সুনন্দার দৃপ্ত তেজস্বিতা ও চতুর্থ পর্বে গহর, কমললতা ও শ্রীকান্তের সম্পর্কে কাব্যিক সৌন্দর্য শরৎচন্দ্রের মহৎ সৃষ্টি।

'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসগুলির ভাষ্য। এদের পশ্চাৎপটে লেখক মানসের অন্তরঙ্গ পরিচয় পেতে হলে এই উপন্যাসটি অপরিহার্য। বিভিন্ন বিচিত্র অভিজ্ঞতার আনন্দ-বেদনা-মিশ্রিত পরীক্ষায় কি ভাবে তাঁকে পোড় খেতে হয়, স্থূল সংস্কার বিশ্বাস বর্জন করে 'চোখে দেখা' জিনিসের সত্য-মূল্য কেমন করে গভীরভাবে অনুভব করবার শক্তি অর্জন করতে হয়—'শ্রীকান্তে'র মধ্যে শরৎচন্দ্রের শিল্পীসত্তার সেই গূঢ় ইতিহাসটি আমরা বুঝে নিতে পারি।

ইন্দ্রনাথের কাছে শ্রীকান্ত জীবন-সাধনার যে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল, তা শরৎচন্দ্রেরই দীক্ষা। দুরন্ত রামলাল, গাঁজাখোর নীলাম্বর, অশিক্ষিত রূঢ় প্রকৃতির গোকুল, নিষ্ঠুর অত্যাচারী জীবানন্দ, উচ্ছৃঙ্খল সতীশ কিংবা সুরেশ প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল এই দীক্ষার জন্যই। এদের সৃজনের মূলে যে মানবিক মূল্যবোধ রয়েছে ইন্দ্রনাথ-শ্রীকান্তেব সম্পর্কে তার উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে। ভদ্রবেশ পরিহিত নতুনদার নীচ স্বার্থপরতা কিংবা রামবাবু ও তার পত্নীর চরম কৃতঘ্নতা থেকে বুঝতে পারি, জীবনের কোন অভিজ্ঞতাই তাঁর অসম্পূর্ণ ছিল না।

যে নারী চরিত্রগুলি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সম্পদ বিশেষ, সেই বিরাজ বৌ, বড়দিদি, জ্ঞানদা, সবযূ, কিরণময়ী, শুভদা, অচলা, রমা ইত্যাদি ক্রুশবিদ্ধা চরিত্রগুলিব অন্তর্নিহিত ভাব প্রেরণাকে পাই অন্নদাদিদির চরিত্র ও অভিশপ্ত জীবনের অভিজ্ঞতায়। অন্নদাদিদিকে দেখেই তো শরৎচন্দ্র নারী চরিত্রের এই দিক সম্বন্ধেই নিঃসংশয় হন। শরৎচন্দ্র নিজের বুকের রক্ত দিয়ে এই চরিত্রের মহিমা ফুটিয়ে তুলেছেন। অবৈধ প্রেমের প্রকাশের ক্ষেত্রে রাজলক্ষ্মী, অভয়া ও কমললতা, 'চরিত্রহীনে'র সাবিত্রী ও কিরণময়ী এবং 'গৃহদাহে'র অচলার মধ্যে আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায় এবং বৈধ প্রেমের অপূর্ব প্রকাশ দেখাবার জন্য অন্নদাদিদির সঙ্গে সুরোবালা, সরোজিনী ও মৃণালের চরিত্র বিশেষ ভাবে আলোচনার দাবী রাখে। আর প্রেমের ক্ষেত্রে শ্রীকান্তর ছায়াতেই যেন অধিকাংশ পুরুষ চরিত্র গড়ে উঠেছে। দেখা যায়, অন্যান্য অনেকগুলি উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রই শ্রীকান্তের ছাঁচে তৈরি, অমনি বুদ্ধিমান, অমনি

নিষ্ক্রিয়, অনুভূতিশীল প্রেমিক, সৎ ও শান্ত।

অসামাজিক প্রেমের প্রকাশের ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের মধ্যে রাজলক্ষ্মীর মত সাবিত্রী, কিরণময়ী, মাধবী, রমা প্রভৃতি অনেকেই বিধবা। তবে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে এদের যেমন বহু ক্ষেত্রে মিল আছে তেমনি কিছু অমিলও আছে। কিন্তু সামাজিক প্রেমের মহত্ত্ব ব্যাখ্যানের দিক দিয়ে অন্নদাদিদির মত সুরোবালা ও মৃণালের মধ্যে সতীধর্মের সবচেয়ে বড় আদর্শ প্রকাশিত হয়েছে। এঁরা তিনজনেই যুক্তিতর্করহিত স্বামীপ্রেমের আদর্শে বিশ্বাসী।

শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মী প্রেমকাহিনীর প্রতিচ্ছায়াতেই শরৎচন্দ্রের অন্যান্য রোমান্টিক প্রেমমূলক কাহিনী আবিষ্কার করা শক্ত নয়। রাজলক্ষ্মীর বাল্যকালের কাহিনীর সঙ্গে 'বামুনের মেয়ে' বা 'চন্দ্রনাথে' উল্লিখিত সামাজিক সমস্যার কিছুটা সামঞ্জস্য আছে। পারিবারিক কাহিনী রচনায় শরৎচন্দ্রের দক্ষতা, 'রামের সুমতি', 'নিষ্কৃতি', 'বড়দিদি' প্রভৃতি গ্রন্থে মেলে; খুব সামান্য কয়েকটি দৃশ্যের মধ্যে হলেও শ্রীকান্তর পিসিমার বাড়ির যে চিত্র উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে তার সঙ্গে উক্ত কাহিনীগুলির যথেষ্ট সাদৃশ্য চোখে পড়ে। 'শ্রীকান্ত'র রতন যেমন অনেক ক্ষেত্রে রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের সংযোগ সাধন করেছে, 'চরিত্রহীনে'র বেহারী তেমনই সাবিত্রী ও সতীশের যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেছে। শ্রীকান্তের গোঁড়া ঠাকুরদা আরও বিস্তৃতভাবে 'গৃহদাহে'র রামবাবুর মধ্যে উপস্থিত। রেঙ্গুনগামী জাহাজের টগর বোষ্টমী ও নন্দ মিস্ত্রীর মধ্যে, 'চরিত্রহীনে'র আরাকানগামী জাহাজের কামিনী বাড়িউলী ও বাড়ি-অলাকে পাওয়া যাবে প্রায় একই অবস্থায়। 'শ্রীকান্তে'র রেঙ্গুনগামী জাহাজের অভয়া ও রোহিনীর কথা মনে পড়লে, 'চরিত্রহীনে'র আরাকানগামী জাহাজে প্রেমের কারণে দেশ থেকে পলাতক কিরণময়ী ও দিবাকরের কথা মনে পড়বে। রেঙ্গুনগামী জাহাজের মত আরাকানাগামী জাহাজও ঝড়ের কবলে পড়েছে। শ্রীকান্ত তার সন্ন্যাসী অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়লে রাজলক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়েছে; তার পাশেই সতীশের তান্ত্রিক আচারের সময় সে অসুস্থ হলে বেহারী সাবিত্রীকে এনে উপস্থিত করেছে। 'শ্রীকান্তে' বসন্ত মহামারীর মধ্যে যেমন অসুস্থ শ্রীকান্তের পাশে রাজলক্ষ্মী, 'গৃহদাহে' প্লেগ মহামারির মধ্যে তেমন রোগগ্রস্ত সুরেশের পাশে অচলা। শ্রীকান্তের গ্রামের পরিবেশও মহিমের গ্রামের অবস্থাকে মনে করিয়ে দেয়। প্রেমের ক্ষেত্রে দেহ বড়, না মন বড়? এই প্রশ্ন উঠেছে শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মী, মহিম-সুরেশ-অচলা, সতীশ-সাবিত্রী প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে। সুতরাং একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, 'শ্রীকান্ত'র মধ্যেই

সমগ্র শরৎ-সাহিত্যের অনেকটাই চুম্বকের মত ধরা পড়েছে।

জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্রের শিল্প-সৃষ্টির মূলসূত্র এই গ্রন্থ থেকেই খুঁজে পাওয়া যাবে। তাই শরৎচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসগুলিতেও এই দৃষ্টির অভ্রান্ত পরিচয় পেয়ে বুঝতে কষ্ট হয় না, এ শুধু শ্রীকান্তের নয় শরৎচন্দ্রের লেখক মানসেরও ইতিহাস। ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি ও রাজলক্ষ্মী তাই অমর হয়ে থাকবে। এই উপন্যাসে লেখককে চরিত্র ও ঘটনার ক্রমবিকাশের অনিবার্য প্রবাহকে অনুসরণ করতে হয়নি, বাস্তব অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে কল্পনার আকাশকে খুঁজে পেয়েছে। তাই এই উপন্যাসে গভীর সহানুভূতির রসে অভিসিক্ত বাস্তব জীবনের চিত্র ও চরিত্রকেই শুধু পাই না, লেখকের বাস্তবজীবননির্ভর হৃদয়সংবেদ্যতার সঙ্গে তাঁর কল্পনাকেও পাই। সেইজন্য শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'শ্রীকান্ত' অনন্য। এই গ্রন্থে শরৎচন্দ্র নির্বিরোধী মন নিয়ে নিরালায় বসে জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতাগুলিকে রস-মূর্তিতে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন। তবে, 'শ্রীকান্ত' কে শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বা শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে অভিহিত করা কঠিন। 'গৃহদাহ' বা 'চরিত্রহীন' কে কি উপেক্ষা করার মত ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঘটনা ও উপন্যাস (শরৎচন্দ্র ও শ্রীকান্ত)

উপন্যাসের সূচনা—শরৎচন্দ্রের কৈফিয়ৎ

> 'আমি বেশ জানি, এই যে কাহিনী আজ লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে লোকে দ্বিধা ত' করিবেই, পরন্তু, উদ্ভট কল্পনা বলিয়া মনে করিতেও হয় ত' ইতস্ততঃ করিবে না। তথাপি এতটা জানিয়াও যে লিখিলাম, ইহাই অভিজ্ঞতার সত্যকার মূল্য।'—শরৎচন্দ্র।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটি শরৎচন্দ্রের স্বপ্নদৃষ্ট আত্ম-প্রতিমূর্তির কহিনীতে ভরা। শরৎচন্দ্র বলতে চেয়েছেন, যে তাঁর মধ্যে ভগবান কল্পনা-কবিত্বের বাষ্পটুকুও দেননি। তাঁর দুটি পোড়া চোখ দিয়ে তিনি যেমনটি দেখেছেন তেমনটিই বলেছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সেই দেখাটুকু যতখানি সত্য হয়ে ঘটেছিল তা পরে লেখার সময় দূর অতীতের স্বপ্নরূপে কিছু কবিত্বময় হয়েছে, যা সামান্য তা অসামান্য বোধ হয়েছে। একদিন তার যে অর্থ ছিল না, পরে তা-ও লেখক নিজের প্রৌঢ় পরিপক্ক চিন্তা ও সাহিত্যিক মনোভাবের বশে তাতে যুক্ত করেছেন। অবশ্য এই অন্তর্জীবনের ও অন্তর্দর্শনের সবটাই শ্রীকান্তের জবানিতে শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনী নয়। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' বাস্তবে-কল্পনায় মেশানো ফিক্‌শন।

উপন্যাসের কাহিনীতে এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বহু স্থলে শরৎচন্দ্রের ভাবালুতা ও অতিরিক্ত সহানুভূতি বাস্তবের আকার-আয়তনকে অতিক্রম করেছে; কোথাও ছোটকে বড় করে দেখিয়েছেন, বড়কে ছোট করে দেখিয়ে-

ছেন। যেখানে সত্যই তা করেছেন তা আত্মকাহিনীর বাইরে চলে গেছে। শরৎচন্দ্র অবশ্য এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। কারণ আত্মকাহিনী হিসাবে শ্রীকান্তের মাধ্যমে শরৎচন্দ্রকে যাতে ধরা না যায় সে চেষ্টা করতেও তিনি কসুর করেননি। 'শ্রীকান্ত' গ্রন্থটিকে তিনি উপন্যাসের ছকে আনবারই চেষ্টা করেছেন।

'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব) ১৩২২ সালে 'ভারতবর্ষে'র মাঘ সংখ্যা থেকে ছাপা শুরু হয়। শরৎচন্দ্র এই সময়ে রেঙ্গুনে থাকতেন। প্রায় একবছর ধারাবাহিক ভাবে 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' নাম দিয়ে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'শ্রী শ্রীকান্ত শর্মা' এই ছদ্মনামে প্রকাশ হতে থাকে। শরৎচন্দ্রের এই নাম প্রকাশের এবং নিজের নাম গোপন করার কারণ কি? অবশ্য, শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' প্রথম দু'মাস ছদ্মনামে প্রকাশ করেছিলেন। এবং ১৩২৩ সালের মাঘ মাসেই যখন 'শ্রীকান্ত' নাম দিয়ে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশ পায় তখন দেখা গেল পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথমাংশের কিছুটা লেখা শরৎচন্দ্র পরিত্যাগ করেছেন।

'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী'র আরম্ভটা ছিল এইরূপ—"আরে যাঃ,—এই ত বটে! মনে মনে প্রায় হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলাম বুঝি বা ইহজন্মে হাতের লেখা অরে ছাপার অক্ষরে দেখা ঘটিল না।

না, তা' কেন? এই যে বেশ পথের সন্ধান মিলিয়াছে! আমি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিব। এ বুদ্ধি এতদিন আমার ছিল কোথায়? দেখি, সবাই লেখে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত,—মেয়ে-পুরুষে। ইহার আর অন্ত নাই, সমাপ্তি নাই। যে কোন একখানা মাসিকপত্র খুলিলেই চোখে পড়ে—আছে রে, আছে, আছে। ঐ যে!

কে গিয়াছে কাশী, কে গিয়াছে খুলনা, কে গিয়াছে সিমলা পাহাড়—অমনি ভ্রমণ-কাহিনী। যে পাহাড়ে পর্বতে উঠিয়াছে, তাহার ত কথাই নাই। আর যে জন জাহাজে চড়িয়া সমুদ্র দেখিয়া আসিয়াছে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখাও একেবারে অসাধ্য!

কিন্তু এ খেয়াল আমার হইল কেন? সে কৈফিয়ৎ ত আগেই দিয়াছি—তা ছাড়া আরও একটা কারণ ঘটিয়াছিল।"

এরপর শরৎচন্দ্র অনেকটা বঙ্কিমী ঢঙে শ্রী শ্রীকান্ত শর্মার আফিম খাওয়ার কথা বলেছেন যা কমলাকান্ত শর্মাকে মনে পড়িয়ে দেয়। তারপর আবার লিখেছিলেন, "থাক্ ইহাদের কথা। অকস্মাৎ সজাগ হইয়া দেখিলাম, হাতের

'ভারতবর্ষ' বুকের উপর আড় হইয়া পড়িয়া আছে এবং বুকের ভিতরে তাহারই উত্তর হইতে দক্ষিণ এবং পূর্ব হইতে পশ্চিম, সমগ্র ভূখণ্ডটাই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। না হইবেই বা কেন? হেন স্থান ত এই সীমাটুকুর মধ্যে নাই, যেখানে বাল্য ও যৌবনের এই চরণ জোড়াটি মাড়াইয়া বেড়ায় নাই।

সেটা ছেলেবেলার কথা। অর্থাৎ যখন এমন সুসিদ্ধ, সুপক্ক হইয়া উঠিতে পারি নাই—শুধু চেষ্টা করিতেছি মাত্র। সেই তরুণ দিনে একজামিন ফেল করার দরুণ একবার, এবং লুকাইয়া গাঁজা খাওয়াব তুচ্ছ অপরাধে কানমলা খাইয়া আর একবার—এই মায়ামোহময় অনিত্য সংসার ত্যাগ করিয়া সাধু-বাবাজী হইয়া গিয়াছিলাম। তারপর পাহাড়, জঙ্গল—সে অনেক কথা, কিন্তু সেসব এখন থাক।"

এই সকল (অপ্রাসঙ্গিক) কথা পুস্তকাকারে ছাপানোর সময়ে শরৎচন্দ্র পরিত্যাগ করেছিলেন। গ্রন্থে যেখানে আরম্ভ সেটুকুর পরও তিনি কিছু অংশ বাদ দিয়ে ছাপিয়েছিলেন। যেমন শরৎচন্দ্র নিজেই তারপর লিখেছিলেন, "কিন্তু এ-কি করিতেছি। কাঁদুনি গাহিতে বসিয়া গেলাম কিরূপে? 'ভ্রমণ-কাহিনী' যদি বা কেহ শোনে—এ সকল শুনিবেই বা কে, আর ইহার সমাপ্তি হইবেই বা কোথায়?"

এর পরেরও অনেকটা অংশ উপন্যাসে বাদ পড়েছে। তার দু-একটি কথা মাত্র আমরা এখানে উদ্ধৃত করব পাঠকের কৌতূহল নিরসনের জন্য এবং আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুটনের প্রয়োজনে।

"আচ্ছা, এক কাজ করি না কেন? বড় বড় লোকের ভ্রমণ-কাহিনীগুলো পড়িয়া লই না কেন? অতএব আর দ্বিধা নয়—ইহাই স্থির। তখন হইতেই ইহাই উল্টিয়া পাল্টিয়া অধ্যয়ণ করিয়া করিয়া আজ আমার এমনি সাহস বাড়িয়া গিয়াছে যে, সত্য-সত্যই লিখিতে বসিয়া গিয়াছি। শুধু তাই নয়, আমার নিশ্চয় মনে হইতেছে, কাহিনী লিখিবার গুপ্ত 'এলেম'টায় লায়েক হইয়া পড়িয়াছি।"

এরপর ধনী ব্যক্তিদের ভ্রমণ সম্পর্কে কিছু কিছু উক্তি করে শ্রী শ্রীকান্ত শর্মা লিখেছিলেন,

"অতএব, পাঠকবর্গের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ, শ্রীকান্তর কাছে আপনারা সে প্রত্যাশা রাখিবেন না। এ ত ভ্রমণ নয়, এ এক দুর্ভাগার ঘুরে বেড়ানো মাত্র। সঙ্গে থাকার ক্লেশ আছে। সঙ্গে গেলে, গতি ও স্থিতির জন্য 'ফার্ষ্ট ক্লাস সেলুন' ও 'স্লিপিং কার' দিতে পারিব না। আহারের জন্য 'ডিনার'

জোগাড় করিতে পারিব না। তবে চাহিলে এক-আধবিন্দু সর্বশ্রান্তিহারা কালাচাঁদ দিতে পারিব বটে, এ ভরসা দিতেছি। তাও কিন্তু একটু-আধটু এক-আধবার।"

শরৎচন্দ্র গ্রন্থ ছাপাবার সময়ে প্রথমাংশের অনেকটা কেন পরিত্যাগ করেছিলেন? প্রথমত, 'শ্রীকান্ত' গ্রন্থটিকে একটি উপন্যাসে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। ভ্রমণ-কাহিনী নয়। দ্বিতীয়ত, প্রথমাংশের লেখায় কিছু কটাক্ষ বা শ্লেষ ছিল, তা বাদ দিতে চেয়েছেন। এই সময়ে 'ভারতবর্ষে' দেবীপ্রসাদ সর্বাধিকারীর—'য়ুরোপে তিনমাস', বর্ধমানের মহারাজার 'আমার য়ুরোপ ভ্রমণ' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্র এঁদের রচনাকে বিশ্বস্ত মনে না করার জন্যই শ্লেষাত্মক আক্রমণ চালিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে তাঁর অধিকাংশ পুস্তকের প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স নামক প্রতিষ্ঠানের এবং 'ভারতবর্ষের' অন্যতম স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে একটি পত্রে (১৫. ১১. ১৫) লিখেছিলেন, "শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী" যে সত্যই ভারতবর্ষে ছাপিবার যোগ্য, আমি তাহা মনে করি নাই—এখনও করি না। তবে যদি কোথাও কেহ ছাপে এই মনে করিয়াছিলাম। বিশেষ তাহাতে গোড়াতেই যে শ্লেষ ছিল সে সকল যে, কোন মতেই আপনার কাগজে স্থান পাইতে পারে না, সে ত জানা কথা। তবে, অপর কোন কাগজের হয়ত সে আপত্তি না থাকিতে পারে, এই ভরসা করিয়াছিলাম। সেই জন্যই আপনার মারফৎ পাঠানো।"—এই চিঠিতে 'গোড়াতেই যে সকল শ্লেষ' কথাটির অর্থ, এই সময় ভারতবর্ষে উপরিউক্ত বিখ্যাত ব্যক্তিদের ভ্রমণ-কাহিনী বার হচ্ছিল। শরৎচন্দ্র কারও নাম না করেই তাঁর লেখার প্রথমেই এঁদের প্রতি একটু কটাক্ষ করে লিখেছিলেন। স্বভাবতঃই এই কটাক্ষ উপন্যাসের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক।

হরিদাসবাবুকে আর একটি চিঠিতে লিখেছিলেন (৭-১২-১৫), 'তবে চন্দরকান্তের কাহিনী-স্বতন্ত্র। এ সম্বন্ধে একটা কথা যদি নির্ভয় দেন ত বলি। এই কাহিনীটাকে সম্পাদক মহাশয়রা দয়া করিয়া যেন নেহাৎ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করেন। আমার বড় আশা আছে—ইহা অন্ততঃ যে সকল লেখা ছাপা হয় এবং হইয়াছেও তাহাদের নিতান্ত নীচের আসনের যোগ্যও নয়। অনেক সামাজিক ইতিহাস ইহার ভবিষ্যৎ জঠরে প্রচ্ছন্ন আছে। আমার অনেক চেষ্টা ও যত্নের জিনিস, অন্ততঃ বন্ধু-বান্ধবদের কাছেও একটু খাতির পাইবার মত হইবেই। প্রথমটা অবশ্য খুবই খারাপ—তা অনেক সত্যকার ভাল জিনিসেরও প্রথমটা মন্দ—এমন দেখাও যায় ত। এই আমার কৈফিয়ৎ। এবার ছাপা-

হ'বে কি ? হাতের লেখা ছাপার অক্ষরে দেখার আশাতেই ওটা দেওয়া সে ত ভূমিকাতেই লেখা আছে।'

এখানে 'চন্দরকান্ত' যে শ্রীকান্ত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং শরৎচন্দ্রের 'চেষ্টা ও যত্নের জিনিস'-এর 'প্রথমটা অবশ্য খুবই খারাপ' তাই 'ভূমিকা' হিসাবে এটিকে উপন্যাসে বাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও, উপন্যাস অংশের আরম্ভেও তিনি কৈফিয়ৎ দিতে ভোলেননি। শ্রীকান্তের পিছনে দাঁড়িয়ে শরৎচন্দ্রের কিছু কৈফিয়ৎ এই গ্রন্থে আছে। শ্রীকান্ত বার বার বলছে— যেমনটি দেখেছি তেমনই বলব, কোন বিচার বা সমালোচনা নয়, কেবল সেই দেখার বিস্ময় এবং তজ্জনিত জিজ্ঞাসা মাত্র আছে।

তাই আবার হরিদাসবাবুকে লেখা ঐ পত্রটির আরও কিছু অংশ উদ্ধৃত করি. 'আমার নামটা যেন কোনমতেই প্রকাশ না পায়। এমন কি আপনি ছাড়া উপেনবাবু ছাড়া (তাঁর ত মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না—তা ভালই হোক আর মন্দই হোক) আর কেহ না জানে ত বেশ হয়। ওটা কি ? অবশ্য শ্রীকান্তর আত্মকাহিনীর সঙ্গে কতকটা সম্বন্ধ ত থাকিবেই, তাছাড়া ওটা ভ্রমণই বটে।...রবিবাবু নিজের আত্মকাহিনী লিখিয়াছেন, কিন্তু নিজেকে কেমন করিয়াই না সকলের পিছনে ফেলিবার সফল চেষ্টা করিয়াছেন।...যাই হোক, শ্রীকান্ত পড়ে লোকে কি রকম ছি ছি করে দয়া করে তা জানাবেন, ততদিন শ্রীকান্ত একটি ছত্রও আর লিখবো না।'

রবীন্দ্রনাথ আত্মকাহিনী লিখেছেন তা তাঁর মনে এসেছে, কিন্তু নিজের আত্মকাহিনী লেখায় তাঁব যথেষ্ট সংকোচ। তাঁর শৈশব থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত জীবনকাহিনীটুকু সকলকে জানাবার মত কি না তাতে তিনি সংশয় প্রকাশ করেন। তাই উপন্যাসে শ্রীকান্তের ছদ্মবেশে নিজেরই আত্মপ্রকাশ। একসময়ে 'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনী কি না এই নিয়ে পাঠকদের মধ্যে নানা কৌতুহল, জিজ্ঞাসা ও বিশ্বাস বাসা বেঁধে উঠেছিল। তবে শরৎচন্দ্র নিজে কিন্তু 'শ্রীকান্তে'র বাস্তব ভিত্তি বারবার অস্বীকার করবার চেষ্টা করেছিলেন। লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন, 'সব কল্পনা, সব কল্পনা, বেবাক মিথ্যে।' কিন্তু সেদিন এবং আজও শ্রীকান্তের কাহিনী কাল্পনিক ও মিথ্যা বলে আমরা মেনে নিতে রাজি নই। তবে ঐ প্রথমেই বলেছি, উপন্যাসটি শরৎচন্দ্রের স্বপ্নদৃষ্ট আত্ম-প্রতিমূর্তির কাহিনীতে ভরা। জীবনের রহস্যকে প্রত্যক্ষ-বাস্তবের জবানীতে এক রূপ-রূপ দান করেছেন। তিনি এতে এমন সকল ঘটনা, চরিত্র ও পরিবেশ বর্ণনা করেছেন যেগুলির সঙ্গে তাঁর নিজের জীবন ও অভিজ্ঞতার

সম্পর্ক ছিল। যে জীবনদৃষ্টি ও মতবাদ ব্যক্ত করেছেন তা শুধু শ্রীকান্তের নয়, তা নিজেরও। এই সকল কারণে পাঠক-সমাজ খুব সঙ্গত ভাবেই শ্রীকান্তের সঙ্গে তাঁর জীবনের সাযুজ্য লক্ষ্য করে থাকেন।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথমেই শরৎচন্দ্র এই বলে শুরু করেছেন, "আমার এই 'ভবঘুরে' জীবনের অপরাহ্ন বেলায় দাঁড়াইয়া, ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে।' অন্যত্র লিখেছেন, 'লিখিতে বসিয়া আমি অনেক সময়েই আশ্চর্য হইয়া ভাবি, এই-সব এলোমেলো ঘটনা আমার মনের মধ্যে এমন করিয়া পরিপাটিভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছিল কে?" যেমন করিয়া বলি, তেমন করিয়া ত তাহারা একটির পর একটি শৃঙ্খলিত হইয়া ঘটে নাই! আবার তাই কি সেই শিকলের সকল গ্রন্থিগুলিই বজায় আছে? তাও ত নাই। কতক হারাইয়া গিয়াছে টের পাই, কিন্তু তবু ত শিকল ছিঁড়িয়া যায় না! কে তবে নূতন করিয়া এ-সব জোড়া দিয়া যায়?' (পৃঃ ৮২) এই উক্তিগুলির মধ্যে শ্রীকান্ত-বেশী শরৎচন্দ্রকে খুঁজে পাওয়া যাবে। কারণ, বৈচিত্র্যময় জীবন ছিল শরৎচন্দ্রের। উপন্যাসের প্রথমেই যে 'ভবঘুরে' কথাটি ব্যবহার করেছেন তা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। জীবনের প্রথম দিকটা কেটেছে বেপরোয়া ও ছন্নছাড়া ভাবে আর যৌবনে তিনি সত্যই উচ্ছৃঙ্খল, ভবঘুরে হয়ে পড়েছিলেন। আনুমানিক চল্লিশ বৎসর বয়সে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্ব প্রকাশ পায়। সুতরাং 'জীবনের অপরাহ্ন বেলায়' কথাটি সংশয়পূর্ণ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু শরৎচন্দ্র ঐ বয়সেই নিজেকে বৃদ্ধের পর্যায়ে ফেলতেন। রেঙ্গুন থেকে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠির অংশ,—'এইবার সত্যই বুড়া হইলাম ভাই—চল্লিশের উদিকে যে পা দিলাম তা বেশ টের পাচ্ছি।' অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের 'শরৎচন্দ্রের সঙ্গে' গ্রন্থের সাত পৃষ্ঠায় আছে, "সকলেই জানেন, শরৎচন্দ্রের মাথার সমস্ত চুল পেকে একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছিল। যখন তাঁর মাথার চুলগুলো 'বুড়ো' হয়ে গিয়েছিল, তখন কিন্তু তাঁর দেহ 'বুড়ো' হয়নি। আমি নিজে যতদূর বুঝেছি এবং সেই হিসেবে আমার যা বিশ্বাস, তাতে মনে হয়, সাধারণের কাছে তাঁর 'বুড়ো' হবার আগ্রহটা ছিল খুব বেশী। 'শ্রীকান্ত'র শুরুতেই তিনি নিজেকে বুড়ো বলেছেন।··· সত্যিকারের বুড়ো হবার আগেই তাঁর বুড়ো হবার আগ্রহটা, তাঁর অনেক লেখা, বক্তৃতা ও চিঠির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।"

শ্রীকান্তের পাঠাভ্যাসের বিবরণ শরৎচন্দ্রের মামার বাড়িতে পাঠাভ্যাসেরই অনুরূপ, শুধু কেবল কোন কোন চরিত্রের নাম এবং নায়ক চরিত্রের সঙ্গে তার

অবশ্য বাস্তব সত্য থেকে একটু পরিবর্তন করে রাখার চেষ্টা হয়েছে। শরৎচন্দ্র যে ছোট থেকেই নানারূপ নেশা করতেন তার উল্লেখ তো ভূমিকা অংশেই মিলেছে। ইন্দ্রনাথের মত রাজেন্দ্রনাথও একদিন সত্যই সংসার বিবাগী হয়ে চলে গিয়েছিল। শ্রীকান্তের কুমার সাহেবের দলে গিয়ে পড়া, বাইজীর সান্নিধ্য লাভ করা, সন্ন্যাসী হওয়া প্রভৃতি উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে মিল আছে। এরপর বর্মা যাওয়া, বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে সংস্পর্শ লাভ করা, মুরারিপুরের আখড়া-জীবন প্রভৃতি বহু ঘটনা এবং চরিত্রের সঙ্গে বাস্তবের অনেক মিল এই উপন্যাসে মিলবে। তাই এই উপন্যাসের প্রথমেই তিনি লিখলেন, "ছেলেবলা হইতে এম্‌নি করিয়াই ত বুড়া হইলাম। আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের মুখে একটা একটানা 'ছি-ছি' শুনিয়া শুনিয়া, নিজেও নিজের জীবনটাকে একটা মস্ত 'ছি-ছি-ছি' ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারি নাই। কিন্তু কি করিয়া যে জীবনের প্রভাতেই এই সুদীর্ঘ 'ছি-ছি'-র ভূমিকা চিহ্নিত হইয়া গিয়াছিল, বহু কালান্তরে আজ সেইসব স্মৃত ও বিস্মৃত কাহিনীর মালা গাঁথিতে বসিয়া যেন হঠাৎ সন্দেহ হইতেছে, এই 'ছি-ছি' টা যত বড় করিয়া সবাই দেখাইয়াছে, হয়ত ঠিক তত বড়ই ছিল না।"

শরৎচন্দ্রের জীবনের প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে শ্রীকান্তের এবং অন্যান্য চরিত্রের যে অনেক মিল রয়েছে তা ক্রমান্বয়ে দেখাবার চেষ্টা করা হবে। এতৎ সত্ত্বেও আমাদের মনে রাখতে হবে 'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের জীবনকাহিনী নয়, উপন্যাস। সেজন্য এতে বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার, সত্যের সঙ্গে মিথ্যার, তথ্যের সঙ্গে সৌন্দর্য ও রসের মিলন ঘটেছে। উপন্যাসের একজন নায়ককে অখণ্ড, পরিপূর্ণ ও সুসমঞ্জস হতে হবে কিন্তু শরৎচন্দ্রের জীবন-ধারা কি চিরকাল একই সূত্রে আবদ্ধ ছিল? ছিল না। বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত জীবনযাত্রা শরৎচন্দ্রের। তাই শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রের জীবনের অভিজ্ঞতার উপকরণে গঠিত হয়েছে এবং শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তে আত্মগোপনও করেছেন।

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিসত্তাও শ্রীকান্তের বাসনা ভাবনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। শ্রীকান্তের মনোজগৎ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সে নিরাসক্ত প্রেমিক, উদাসীন আবেগপ্রবণ অথচ বিপ্লবী পুরুষ। শরৎচন্দ্রও অনেকটা তাই। শ্রীকান্তের মধ্যে দিয়ে শরৎচন্দ্রের আত্মদর্শন ঘটেছে। তবে শ্রীকান্ত থেকে শরৎচন্দ্র নিজেকে কিছুটা ভিন্ন করে শ্রীকান্তের শৈল্পিক রূপ দিয়েছেন এবং কিছুটা অভিন্ন করে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। শ্রীকান্ত কিছুটা নিষ্ক্রিয় বটে, কিন্তু তার চরিত্র সুপরিণত ও সুনির্ধারিত। ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ সম্পর্কে

তার স্বচ্ছ চিন্তাধারা আছে বলেই সে সেই অনুযায়ী জগৎ ও জীবনকে দেখে এবং বিচার করে। এদিকে শরৎচন্দ্রের প্রখর ব্যক্তিত্বের এমনি পছন্দ-অপছন্দের নিরিখ অত্যন্ত ঋজু ছিল এবং তা শ্রীকান্তের নিরিখের সঙ্গে বেশ মিলে যায়। সুতরাং পরিস্কার যে, শরৎচন্দ্রের ভাবরূপ শ্রীকান্তে অনেকটা আভাসিত হয়েছে।

মোহিতলালের কথায়, "শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের সেই আত্মকাহিনী—উহা কেবল উপন্যাসই নহে। এইরূপ আত্মকাহিনীও উপন্যাস হইয়া উঠে, তার কারণ, ইহার নায়ক একাধারে 'আত্ম'ও বটে, 'পর'ও বটে। লেখক যেন আপনাকেই বাহিরে একটু তফাতে ধরিয়া দেখিতেছেন, ভাল করিয়া দেখিবার জন্য যেরূপ সংস্থান ও পশ্চাৎ-পট আবশ্যক তাহা উত্তমরূপে সংযোজন করিয়া লইয়াছেন।"

এইভাবে আত্মকাহিনীর ছলে এই উপন্যাসটি লেখা বলেই সমালোচক একে খাঁটি উপন্যাস বলতে চাননি। মূল ঐক্যসূত্র নেই বলে এবং বিচ্ছিন্ন অনেক ঘটনা ও চরিত্র এসে পড়েছে বলে অর্থাৎ শিথিল কাঠামোর কথা ভেবে এর মধ্যে অনেকে অসঙ্গতি খুঁজে পেয়েছেন, আবার কোন সমালোচক বিক্ষিপ্ত ঘটনা ও চরিত্র থাকলেও শ্রীকান্তের মূল উপন্যাস ধর্ম নষ্ট হয়ে যায়নি বলে মন্তব্য করেছেন। তবে আমরা টলস্টয়ের কথা জানি, Every great artist necessarily creates his form.'

সুতরাং দেখা গেল 'শ্রীকান্ত' ভ্রমণ-কাহিনী নয়, অন্তর্জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ক্রমোন্মোচন, অন্তর্লোকের পথ পরিক্রমার কাহিনী। শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনের অনেক অভিজ্ঞতাই শ্রীকান্তের মধ্যে রূপ পেয়েছে, অভিজ্ঞতার সাংসারিক বাস্তবতা যেভাবে শৈল্পিক বাস্তবতায় রূপ পেয়ে থাকে। যে অর্থে **'Every artist writes his own autobiography'** সেই অর্থেই শ্রীকান্তে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব অনেকটাই আরোপিত। তাই আমি ক্রমান্বয়ে, এই অধ্যায়ে, শ্রীকান্তকে ও শরৎচন্দ্রকে পাশাপাশি রেখে তাদের সাজুয্যটুকুই দেখাতে সচেষ্ট হব।

লেখাপড়া-খেলাধুলা-সঙ্গীতচর্চা ও অভিনয়

"Ignorance is the curse of God ; Knowledge the wing wherewith to fly to heaver.'

—Shakespeare.

দেবানন্দপুরেই শরৎচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ। পাঁচ বৎসর বয়সে প্যারী পণ্ডিতের (বন্দ্যোপাধ্যায়ের) পাঠশালায় ভর্তি হন; গুরুমহাশয়ের পুত্র কাশীনাথও শরৎচন্দ্রের সহপাঠী ছিল এবং খুব সম্ভবতঃ একটি কায়স্থ পরিবারের কন্যার সঙ্গে (মতান্তরে কালীদাসী নামে যাজক ব্রাহ্মণ কন্যা) তাঁর খুব ভাব হয়। শরৎ-জীবনীকারগণ তাঁর শৈশবের এই মেয়েটির একটি খেয়ালের প্রসঙ্গে বৈঁচিফল তুলে মালা গেঁথে শরৎচন্দ্রকে দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

কিশোরকালে লেখাপড়ার কথা উপন্যাসে যেটুকু আছে তা ভাগলপুরের ঘটনার কথাই বিশেষ করে স্মরণ করিয়ে দেয়। কেবলমাত্র বৈঁচিফলের মালা দেওয়া প্রসঙ্গটি শরৎচন্দ্রের বাল্যকালের দেবানন্দপুরের খেলার সঙ্গিনীটিকেই মনে করিয়ে দেয়।

শ্রীকান্তের পড়াশুনার বিবরণ শরৎচন্দ্রের মামার বাড়িতে পড়াশুনা করারই অনুরূপ। শুধু কেবল কোন কোন চরিত্রের নাম এবং শ্রীকান্তের সঙ্গে তার সম্বন্ধ বাস্তব সত্য থেকে একটু পরিবর্তন আনা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শরৎ-পরিচয়' গ্রন্থের ১২৬ পৃষ্ঠা থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

'ক্যাম্বিসের খাটের উপর শুয়ে আছেন পিশেমশাই নয়—দাদামশাই এবং বৃদ্ধ রামকমল ভট্টাচার্য—রামচন্দ্র ভট্টাচার্য। ছোড়দা এবং যতীনদা—দু'জনেই মামা—গল্পের খাতিরে দাদা হয়েছেন। এই সময় দেউড়িতে গৌরী সিং তুলসীদাসের রামায়ণ পড়তো সুর করে।

টিকিট বিলির গল্প সত্য। ছিনাথ বউরূপীর অভিযানও সত্য। তবে সবটাতেই কল্পনার রসান আছে।

বউরূপীর ল্যাজ কাটাটি শরৎচন্দ্রের অধিকন্তু দোবায়। সেদিন ইন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিল না। শরৎচন্দ্রও না। এই গল্প কুসুমকামিনীর সান্ধ্য বৈঠকে

শোনা—শরৎচন্দ্র তাকে এমন অদ্ভুতভাবে রূপায়িত করেছেন এইখানে তাঁর কৃতিত্ব।'

ইন্দ্রনাথ হচ্ছে রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার—যে শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরের বন্ধু। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নিজেও শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় মামা, যিনি শরৎচন্দ্রের বাল্যসঙ্গী এবং বন্ধুর মত। শরৎচন্দ্র ভাগলপুর থেকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ বৎসর বয়সে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার সময় শরৎচন্দ্রের মামাদের আর্থিক অবস্থাও বিশেষ ভাল ছিল না। তাঁর মাতামহ কেদারনাথের মৃত্যুর পরই একান্নবর্তী পরিবারটি ভেঙে গিয়েছিল।

গৃহে মামাদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের এই বিদ্যাভ্যাসের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে উপন্যাসের প্রথম দিকেই। সকালে বাড়ির রোয়াকে বসে কয়েকটি বালক তারস্বরে দোলায়িত দেহে পড়ত। অপেক্ষাকৃত বড়রাই তাদের গাইড করত আর কেদারনাথ বসে থাকতেন চণ্ডীমণ্ডপের সামনে। গল্পগুজবের জন্য নানান ধরনের লোক আসাতে ছেলেদের পড়ার প্রতি একনিষ্ঠতা যেত নষ্ট হয়ে। ছুটির দিনেও দুপুরের পড়ার ভার পড়ত একজন বয়োজেষ্ঠ্যের উপর। শরৎচন্দ্র উপন্যাসে তাকে 'মেজদা' রূপে চিত্রিত করে গিয়েছেন। এর বেশী লেখাপড়ার কথা উপন্যাসে বিশেষ বলা হয়নি অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের কলেজ জীবনের কোন ঘটনাকে উপন্যাসে টেনে আনা হয়নি। তবে বাল্যকালে লেখাপড়ায় শরৎচন্দ্রের অনেক বিঘ্ন এবং দুঃখ কষ্টের মধ্যে কেটেছিল বলে প্রৌঢ় জীবনে সামতাবেড়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন। ছাত্রদের তিনি অত্যন্ত স্নেহও করতেন এবং তাদের জন্য তাঁর নানান উপদেশাবলীও আছে।

শিশুকালে সমবয়সীদের সঙ্গে মার্বেল খেলা, লাট্টু ঘোরানো, ঘুড়ি ওড়ানো প্রভৃতিতে শরৎচন্দ্র ছিলেন দক্ষ। একটু বয়সে সাঁতার কাটতে, কুস্তি করতে ও গাছে উঠতে খুব ভালবাসতেন। ভাগলপুরেই যমুনিয়া নদীতে মামা মনীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে অভিভাবকদের লুকিয়ে খুব সাঁতার কাটতেন। আর দেবানন্দপুরের পাশেই সরস্বতী নদীতে ফেরিঘাটের পারাপারের ডোঙায় চেপে অথবা স্থানীয় জেলেদের নৌকা তাদের অজ্ঞাতসারে খুলে নিয়ে শরৎচন্দ্র অনেক সময়ে একা অথবা বন্ধুসহ ঘুরে বেড়াতেন। এইভাবে কৃষ্ণপুর গ্রামে রঘুনাথ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত আখড়া পর্যন্ত অথবা সপ্তগ্রামের পুল অবধি বেড়িয়ে আসতেন।

উপন্যাসের প্রথম পর্বে যেটুকু খেলাধূলা প্রসঙ্গে এসেছে তা কেবলমাত্র ফুটবল খেলার একটি মারামারির ঘটনা—যেখান থেকে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে

শ্রীকান্তের প্রথম মিলন ঘটে। এই ইন্দ্রনাথের সঙ্গেই শ্রীকান্ত নৌকা চেপে মাছ চুরি করা, মরা পোড়ানো এবং দুঃস্থদের সাহায্য করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। এই ইন্দ্রনাথ অর্থাৎ রাজেন্দ্রনাথ ফুটবল খেলায় খুব দক্ষ ছিল, তার নিজস্ব একটি দলও ছিল। প্রথম পর্বের মধ্যে খেলাধূলা প্রসঙ্গে কেবলমাত্র একটি ফুটবল ম্যাচের পর মারামারির কথা রয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই মারামারির সময়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'ভাগলপুর টয়েন বি স্পোর্টসের একটি খেলার শেষে এ ব্যাপারটি ঘটে এবং ইন্দ্রনাথের (রাজুর) দল লাঠির জোরে বিপক্ষ পক্ষকে তাড়িয়ে দেয়।' 'শ্রীকান্তে' লিখিত আছে যে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীকান্তের প্রথম পরিচয় ঘটেছিল একটি ফুটবল ম্যাচের মারামারির মধ্যে দিয়ে। এই মারামারিটা সত্য ঘটনা, সে মাঠও এখন ভাগলপুরে বর্তমান, পূর্বেই শরৎচন্দ্র ও রাজেন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটেছিল। শরৎচন্দ্র ইন্দ্রনাথ চরিত্রটিকে আরও উজ্জ্বল করে দেখাবার জন্যই শ্রীকান্তকে ভীরু ও পলায়নতৎপর দেখিয়েছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র কম সাহসী ছিলেন না।

শরৎচন্দ্র সুগায়ক ছিলেন। ছেলেবেলায় ভাগলপুর থাকাকালীন কিছুদিন গান-বাজনার চর্চা করেছিলেন। রেঙ্গুনে থাকাকালীনও এই চর্চা থাকে। কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত তাঁর বড় প্রিয় ছিল। কণ্ঠস্বরও ছিল সুমিষ্ট। তিনি একবার সন্ন্যাসীর বেশে ঘুরতে ঘুরতে মজঃফরপুরে হাজির হন। সেখানে অনুরূপা দেবী ও তাঁর স্বামী শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে শরৎচন্দ্রের স্থান হয়েছিল ঐ গান শোনাবার জন্যই। এই মজঃফরপুরেই স্থানীয় জমিদার মহাদেব সাহুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় গায়ক ও বাদক হিসাবে। আমন্ত্রিত হয়ে তিনি কিছুদিন এই জমিদারের কাছেও ছিলেন। মহাদেব সাহু অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় লোক ছিলেন।

কিন্তু 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শ্রীকান্ত গান জানত তা লেখা হয়নি কিন্তু গান যে বোঝে তার অবশ্য উল্লেখ আছে,—

'আমি প্রবেশ করিতেই গানটা থামিয়া গিয়াছিল। তারপর সময়োচিত বাক্যালাপ ও আদব-কায়দা সমাপন করিতে কিছুক্ষণ গেল। রাজপুত্র অনুগ্রহ করিয়া আমাকে গান ফরমাস করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজাজ্ঞা শুনিয়া প্রথমটা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলাম; কিন্তু অল্প কিছুক্ষণেই বুঝিলাম, এই সঙ্গীতের মজলিসে আমিই যা-হোক একটু ঝাপ্সা দেখি, আর সবাই ছুঁচোর মত কানা। বাইজী প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। পয়সার লোভে অনেক কাজই পারা যায় জানি। কিন্তু এই নিরেটের দরবারে বীণা বাজানো বাস্তবিকই

এতক্ষণ তাহার একটা সুকঠিন কাজ হইতেছিল। এইবার একজন সমঝদার পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল। তারপরে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত যেন শুধুমাত্র আমার জন্যই তাহার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সৌন্দর্য্য ও কণ্ঠের সমস্ত মাধুর্য্য দিয়া আমার চারিদিকের এই সমস্ত কদর্য্য মদোন্মত্ততা ডুবাইয়া অবশেষে স্তব্ধ হইয়া আসিল।' (পৃঃ ৮৪-৮৫)

এরপরও গানের প্রসঙ্গ উপন্যাসের বহু স্থানে আবার এসেছে। চতুর্থ পর্বেও গানের প্রসঙ্গ বাদ পড়েনি। রাজলক্ষ্মী আনন্দকে গান শুনিয়েছে এবং শ্রীকান্ত যে গান জানে না তা নিম্নোদ্ধৃত কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে শরৎচন্দ্র কৌশলে প্রকাশ করেছেন—

'—দিদির কি এ বিদ্যেও আছে নাকি ?

সামান্য একটুখানি। তারপরে আমাকে দেখাইয়া কহিল, ছেলেবেলায় ওঁর কাছেই হাতে খড়ি।

*   *   *   *

পুত্রশোকাতুর ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপের দুর্যোধনের গানটা জানি, কিন্তু রাজলক্ষ্মীর পরে এ আসরে সেটা মানানসই হইবে না।

হারমোনিয়ম আসিলে প্রথমে সচরাচর প্রচলিত দুই-একটা 'ঠাকুরদের' গান গাহিয়া রাজলক্ষ্মী বৈষ্ণব-পদাবলী আরম্ভ করিল, শুনিয়া মনে হইল সেদিন মুরারিপুর আখড়াতেও বোধ করি এমনটি শুনি নাই। আনন্দ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল, আমাকে দেখাইয়া মুগ্ধ চিত্তে কহিল, এ-কি সমস্তই ওঁর কাছে শেখা দিদি ?

*   *   *   *

আমি বলিলাম, যাঁরা অর্থের পরিবর্তে বিদ্যা দান করেন তাঁদের কাছে, আমার কাছে নয় হে ; দাদা কখনো এ বিদ্যের ধার দিয়েও চলেন নি।' (পৃঃ ৬৮৭-৮৮)

এখানে শ্রীকান্ত 'এ বিদ্যার ধার দিয়ে' না গেলেও শরৎচন্দ্রের এ বিদ্যে রীতিমত আয়ত্ব ছিল। সমগ্র উপন্যাসটি পড়লে দেখা যায়, শুধু রাজলক্ষ্মী নয়, কমললতাও শ্রীকান্তকে বার বার গান শুনিয়েছে এবং কমললতার কাছে গিয়ে রাজলক্ষ্মীও গান করেছে। শ্রীকান্তর কীর্তনের প্রতিও যে গভীর অনুরাগ ছিল তা নিম্নলিখিত অংশটুকুতে প্রকাশ পাবে।

'পদ্মা কহিল, নতুন গোঁসাই, কেত্তন শুনতে তুমি ভালোবাসো, আজ মনোহর দাস বাবাজীর গান শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। কি চমৎকার !

বস্তুতঃ বৈষ্ণব-কবিদের পদাবলীর মত মধুর বস্তু আমার আর নেই, বলিলাম. সত্যিই বড় ভালোবাসি পদ্মা। ছেলেবেলায় দু-চার ক্রোশের মধ্যে কোথাও কীর্ত্তন হবে শুনলে আমি ছুটে যেতাম, কিছুতে ঘরে থাকতে পারতাম না। বুঝি-না-বুঝি তবু শেষ পর্যন্ত বসে থাকতাম।' (পৃঃ ৬৩৯)

শরৎচন্দ্র যে সুগায়ক ছিলেন, এ কথা যোগেন্দ্রনাথ সরকার, গিরীন্দ্রনাথ সরকার ও অন্যান্য ব্যক্তিও লিখে গেছেন। শরৎচন্দ্র অনেক যন্ত্রসঙ্গীতই রাজেন্দ্রনাথের কাছে শিখে নেন। উপন্যাসে আছে, 'তারপরে একটুখানি হাসিয়া কহিল, তোমাকে নিয়ে আমি কি করব? তুমি বাঁয়া-তবলা বাজাতেও পারবে না, সারেঙ্গী বাজাতেও পারবে না আর—

বলিলাম, আর-টা কি? পান-তামাক জোগানো? না, সেটা কিছুতেই পেরে উঠবো না।

কিন্তু আগের দুটো?

বলিলাম, ভরসা দিলে পারলেও পারি। বলিয়া নিজেও একটু হাসিলাম।

হঠাৎ রাজলক্ষ্মী উৎসাহে উঠিয়া বসিয়া বলিল, ঠাট্টা নয়, সত্যি পারো?

বলিলাম, আশা করতে ত দোষ নেই।' (পৃঃ ৩২৬)

এখানে প্রকাশ হয়ে পড়েছে যে শ্রীকান্ত বাজনায় সিদ্ধহস্ত তবে আত্মপ্রকাশ সে মোটেই পছন্দ করে না। আর, আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করা গেছে সাহিত্যিক হিসাবে সুখ্যাত হবার পর শরৎচন্দ্রও প্রৌঢ় বয়সে গান-বাজনার দিকে মোটেই নজর দিতেন না। অথচ গান-বাজনা, ছবি আঁকা, অভিনয় প্রভৃতিতে তিনি সুনাম অর্জন করতে পারতেন। কৈশোর যৌবনের এই সকল গুণগুলিই তিনি প্রৌঢ় জীবনে ত্যাগ করেছিলেন। যৌবনে অভিনয় অপেক্ষা সঙ্গীতের উপরই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। একবার যে গান শুনতেন, পরমুহূর্তেই সেই গানটি অবিকল সেই সুরেই গাইতে পারতেন। ভাগলপুরে মামার বাড়ির নিকটে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়িতে গানের ও সাহিত্যের আসরে শরৎচন্দ্র যোগ দিতেন। এই সুরেন্দ্রনাথের ছোট ভাই হচ্ছে রাজু—রাজেন্দ্রনাথ—যাকে উপন্যাসে ইন্দ্রনাথ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই রাজুও সুন্দর বাঁশী হারমোনিয়াম, তবলা, বেহালা প্রভৃতি বাজাতে পারত। শরৎচন্দ্রের বাঁশী বাজানো ও গান গাওয়া সম্বন্ধে নিরুপমা দেবী লিখেছেন—

'সেই উদাসী কবি-স্বভাববিশিষ্ট লেখকটিকে আমাদের বাসার পশ্চিমদিকে যে প্রকাণ্ড মসজেদ্ ছিল (শুনা যাইত তাহা নাকি শাজাহানের আমলের) তাহার বৃক্ষছায়াময় পথে কখনো কখনো দেখা যাইত। কোন গভীর রাত্রে

সেই মসজিদের সুউচ্চ প্রাঙ্গণ চত্বর হইতে গানের শব্দ, কখনো 'যমানিয়া' নদীর (গঙ্গার ছাড়) তীর হইতে বাঁশীর আওয়াজ ভাসিয়া আসিলে মেজদা মেজ-বৌদিকে শুনাইয়া বলিতেন—'এ ন্যাড়াচন্দ্রের কাণ্ড।'......ইহার পর দাদাদের বৈঠকখানায় তাঁহার কণ্ঠের আরও গান আমরা ভিতর হইতে শুনিয়াছি।'

ভাগলপুরে থাকার সময়ে সঙ্গীতে শরৎচন্দ্রের যে অশেষ অনুরাগ দেখা গিয়েছিল তারই পূর্ণ পরিণতি ঘটেছিল রেঙ্গুনে। যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখে-ছেন, 'রেঙ্গুনের বাঙালী সমাজে তিনি একজন গায়ক বলিয়াই শুধু পরিচিত ছিলেন।' শরৎচন্দ্রের সঙ্গীত-শিল্পী রূপে প্রকাশ্য প্রতিষ্ঠা বোধ করি কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের সম্বর্ধনা-সভায় ঘটেছিল। পর্দার আড়ালে আত্মগোপন করে লাজুক শরৎচন্দ্র গান করেছিলেন। পরে যখন নবীন সেনের সঙ্গে এই লোক-ভীরু শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎ ঘটে তখন তাঁর গান আবার শুনে কবি যা বলেছিলেন (?) তা গিরীন্দ্রনাথ সরকারের 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থ থেকে তুলে দিলাম, 'আপনার গানের ভাব উদ্দীপনায় সেই চিরসুন্দরকে মনে করাইয়া দেয়, রেঙ্গুন শহরে রত্ন লুকান ছিল জানতাম না। আমি আজ আপনাকে 'রেঙ্গুন রত্ন' উপাধি দিলাম।'

শরৎচন্দ্র যে গান গাইতেন তার মধ্যে ভক্তিমূলক বৈষ্ণব পদ ও ভাবোচ্ছ্বাস-পূর্ণ অধ্যাত্মিক গানগুলিই প্রাধান্য পেত। বলা বাহুল্য, উপন্যাসেও রাজলক্ষ্মী ও কমললতাকে দিয়ে এই সমস্ত গান গাওয়ানো হয়েছে। রেঙ্গুনে থাকাকালীন শরৎচন্দ্র একটি কীর্তন দলও করেছিলেন। সঙ্গীতের প্রতি এরূপ অনুরাগের ফলে তাঁর অঙ্কিত কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে এই সঙ্গীত-প্রীতি দেখিয়েছেন। তার মধ্যে 'চরিত্রহীন'-এর সতীশ এবং 'শেষপ্রশ্নে'র শিবনাথ পাকা সঙ্গীত-শিল্পী। আমি আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যেও দেখিয়েছি নিজের চরিত্রের অনুরূপতা অবলম্বনে অঙ্কিত শ্রীকান্ত চরিত্রকেও তিনি সঙ্গীত সমঝদার হিসাবে দেখিয়েছেন এবং সেইজন্যই ঐ চরিত্রটি পিয়ারী বাঈজীর গানের মজলিসে সাদরে গৃহীত হয়েছিল। শ্রীকান্তের তথা শরৎচন্দ্রের বৈষ্ণব-সঙ্গীত-প্রীতি আত্মপ্রকাশের পূর্ণ সুযোগ পেয়েছে চতুর্থ পর্বে। মুরারীপুরের আখড়ায় কমল-লতার কণ্ঠে বৈষ্ণব পদাবলীর সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত ভক্তিভাবোচ্ছ্বাস ঢেলে দিয়েছেন।

অভিনয়ের কথা প্রসঙ্গক্রমে শরৎচন্দ্র কেবল একস্থানেই বলেছেন। শ্রীকান্ত সেখানে সাধারণ দর্শক মাত্র। কিশোর শ্রীকান্ত যখন মেঘনাদের 'এক বিপর্যয় কাণ্ড' দেখছে, সেই সময় ইন্দ্রনাথ এসে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছে অন্নদা-

দিদির কাছে।

তবে অভিনয়ের কথা উপন্যাসে বিশেষ না থাকলেও শরৎচন্দ্র অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মাত্র দুই পৃষ্ঠাতেই যেটুকু পল্লীগ্রামের অভিনয়ের কথা বলেছেন, তাতে তাঁর অভিজ্ঞতার নিখুঁত চিত্রটুকুই ফুটে উঠেছে।

দত্তদের বাড়িতে কালীপূজা উপলক্ষে যে মেঘনাদ বধ অভিনয় হবে সেখানে বালক শ্রীকান্ত বহুপূর্ব থেকেই উপস্থিত। 'সারাদিন আমার নাওয়া-খাওয়া নাই, বিশ্রামও নাই; স্টেজ বাঁধার সাহায্য করিতে পাইয়া একেবারে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি। শুধু তাই নয়, যিনি রাম সাজিবেন, স্বয়ং তিনি সেদিন আমাকে একটা দড়ি ধরিতে বলিয়াছিলেন। সুতরাং ভারি আশা করিয়াছিলাম, রাত্রে ছেলেরা যখন কানাতের ছেঁড়া দিয়া গ্রীন-রুমের মধ্যে উঁকি মারিতে গিয়া লাঠির খোঁচা খাইবে, আমি তখন শ্রীরামের কৃপায় বাঁচিয়া যাইব। হয়ত বা আমাকে দেখিতে এক-আধবার ভিতরে যাইতেও দিবেন। কিন্তু হায়রে দুর্ভাগ্য! সমস্তদিন যে প্রাণপাত প্ররিশ্রম করিলাম, সন্ধ্যার পর আর তাহার কোন পুরস্কারই পাইলাম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গ্রীন-রুমের দ্বারের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলাম, রামচন্দ্র কতবার আসিলেন, গেলেন, আমাকে কিন্তু চিনিতে পারিলেন না। একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না, আমি অমন করিয়া দাঁড়াইয়া কেন? অকৃতজ্ঞ রাম! দড়ি-ধরার প্রয়োজনও কি তাঁহার একেবারেই শেষ হইয়া গিয়াছে!'—এ যেন একেবারে বাস্তব চিত্র। বাস্তবিকই সকলেরই এমনটি হয়ে থাকে।

তারপর সেই 'ছয় হাত উঁচু দেহ', পেটের 'ঘেরটা সাড়ে-চার হাত' স্বয়ং মেঘনাদ ঘোর নাদ করে একলাফে স্টেজের সম্মুখে এসে ফুট-লাইটের গোটা পাঁচ-ছয় ল্যাম্প উল্টিয়ে দিয়ে এবং নিজের পেট-বাঁধা জরির কোমরবন্ধটা পটাস্ করে ছিঁড়ে ফেলে একহাতে পেণ্টুলানের মুট চেপে ধরে আর এক হাতেই তীর দিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল, তখন কৌতুকরসে পাঠক একান্তই মজে যায়।

উপন্যাসে এই সামান্য অভিনয়ের কথা থকেলেও আমরা জানি শরৎচন্দ্র নিজেও ভাল অভিনয় করতে পারতেন। নিজেই ছেলেবেলার কথা-প্রসঙ্গে বলেছেন' 'বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাগরেদি করি।' ভাগল-পুরের খঞ্জরপুরে তিনি একটা ছোট থিয়েটারের দল গঠন করেছিলেন। তিনিই এই দলের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। অভিভাবকদের লুকিয়ে রিহার্সাল চলত। গুরুজনদের অজ্ঞাতে যমুনিয়ার তীরে, ভাঙ্গা-পরিত্যক্ত দেবালয়ে অথবা মুসলমান

-দের কবরস্থানে তাদের রিহার্সালের ব্যবস্থা হত। ভাগলপুরে আসার পূর্বেও শরৎচন্দ্র কিছুদিনের জন্য একটি যাত্রার দলে ভর্তি হয়েছিলেন। ভাগলপুরে যে থিয়েটার দলটি ছিল সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী বিভূতি ভূষণ ভট্ট লিখেছেন, 'আমরা যে পাড়ায় থাকিতাম, তাহার নাম খঞ্জরপুর। সেই পাড়ার প্রতিবেশী বালক ও যুবকগণ শরৎচন্দ্রের নায়কত্বে আমাদের লইয়া একটা ছোট থিয়েটার পার্টি গঠন করিয়াছিল। তাহাতে যে অভিনয় হইত শরৎচন্দ্র ছিলেন তাহার প্রযোজক এবং শিক্ষক।......এই থিয়েটারের রিহার্সাল অনেক সময় অদ্ভুত অদ্ভুত স্থানে হইত—নদীর ধার (তখনকার যমুনিয়া এখন নাই) হইতে মুসলমানের কবর স্থান, দেবস্থান—কোন স্থানই বাদ যাইত না।' আদমপুর ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে যাঁরা যাঁরা শরৎচন্দ্রের অভিনয় সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ রেখে গেছেন, তাঁদের মধ্যে বিভূতিভূষণ একজন। তিনি তাঁর 'শরৎ দা' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রের অভিনয় একস্থানে উল্লেখ করেছেন, 'শরৎচন্দ্রের রসস্রষ্টা রূপই শেষ জীবনে প্রকটিত—কিন্তু যৌবনে একাধারে নট, সঙ্গীতজ্ঞ, যন্ত্রী এবং কাব্যরসজ্ঞ কবি—কত না নূতন নূতন রূপে তাঁহাকে দেখিয়াছি। মনে পড়ে ভাগলপুরের আদমপুর ক্লাবের ৺গিরীশচন্দ্র ঘোষের লিখিত 'জনা'র অভিনয়। 'জনা'র পার্টের অভিনয়ে তরুণ শরৎচন্দ্র যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন পরবর্তীকালে কলিকাতার প্রসিদ্ধ অভিনেত্রীর—(তিনকড়ি কি ?) অভিনয়ের মধ্যে তাহা দেখিলাম কি না সন্দেহ।'

শরৎচন্দ্র 'আদমপুর ক্লাবে'ও যোগ দিয়েছিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই সেখানকার একজন বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী সদস্য হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন। এই ক্লাবই বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করেছিল এবং শরৎচন্দ্র মৃণালিনীর ভূমিকায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। এ ছাড়াও এই ক্লাব যখন 'জনা' ও 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের অভিনয় করে, শরৎচন্দ্র তখন এই নাটকে যথাক্রমে জনা ও চিন্তামণির ভূমিকায় অভিনয় করে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

তরুণ বয়সে নানান্ ধরণের অভিনয় দেখে এবং করে, থিয়েটার সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা শরৎচন্দ্রের সঞ্চয় হয়েছিল 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের 'মেঘনাদ বধ' অভিনয়ের প্রেরণা তার থেকে বলেই অনুমেয়। তবে শরৎচন্দ্র অভিনয় বেশী করেননি কিন্তু গান তারও পর বহুদিন গেয়েছিলেন। শেষ জীবনে গান একেবারেই ছেড়েছিলেন কিন্তু পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। প্রথম জীবনের অভিনেতা শেষ জীবনে নাট্যকাররূপেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত

করেছিলেন। প্রথম জীবনের সেই অভিজ্ঞতা শেষ জীবনে কাজে লেগেছিল। তাঁর নাটকগুলি অভিনয় গুণে সমৃদ্ধ হয়েছিল। রঙ্গমঞ্চে তাঁর নাটক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্র আর কোনদিন পাব্লিক স্টেজে নামেননি, অভিনয় জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও। বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর এই পরিবর্তন এসেছিল। তবে, অন্তরে অভিনয় সম্পর্কে তাঁর অনুরক্তি পূর্বের মতই ছিল।

সন্ন্যাস জীবন ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন

'Adversity is the trial of principle. —Without it a man hardly knows whether he is honest or not. —Fielding

শরৎ-জীবনের কিয়দংশ আজও পর্যন্ত আমাদের কাছে অনুদ্ঘাটিত; তাঁর সন্ন্যাস জীবন ও বর্মা জীবনের কথা আজও অন্ধকারেই রয়েছে। তবে ঐ রহস্যাচ্ছন্ন জীবনের যতটুকু পরিচিত জনের সান্নিধ্য লাভ করেছিল তা উদ্ঘাটিত হয়েছ। পঁচিশ বৎসর বয়সে (১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে) পিতার উপর অভিমান বশতঃ তিনি নিরুদ্দেশ হন এবং সন্ন্যাসীর বেশে ঘুরে বেড়াতে থাকেন; কয়েক মাস নাগা সন্ন্যাসীদের সাথেও ঘুরেছিলেন। নিরুদ্দেশ হওয়ার পর তাঁর সংবাদ প্রথম পাওয়া গিয়েছিল যখন তিনি মজঃফরপুরে অনুরূপা দেবীর স্বামী শিখরনাথ বন্দ্যোপাধায়ের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিলেন। কিন্তু পূর্বের কয়েক মাস সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর সংবাদ আমরা অন্য কোন জীবনীকারের নিকট না পেলেও স্বয়ং শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের মাধ্যমে কিছু সন্ন্যাস জীবনের সংবাদ আমাদের জানাতে কসুর করেননি। তাই, উপন্যাসের সন্ন্যাস-জীবনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা মোটেই অবাস্তব বা অতিরঞ্জিত নয় বলেই মনে করি; তবে উপন্যাসের প্রয়োজনে কিছু রদবদল করতে পারেন।

পাটনার টিকিট কেটে গাড়িতে চড়ে বসার পর শ্রীকান্ত কি মনে করে 'বাড়' স্টেশনে নেমে একেবারে খাঁটি সন্ন্যাসীর আশ্রমে উপস্থিত হল। শ্রীকান্তর মন ভক্তিতে 'বাবার' শ্রীচরণে লুটিয়ে পড়ল। 'বাবার' প্রশ্নের

উত্তরে শ্রীকান্ত বলল: 'আমি গৃহত্যাগী মুক্তিপথান্বেষী হতভাগ্য শিশু; আমাকে দয়া করিয়া তোমার চরণ-সেবার অধিকার দাও।

সাধুজী মৃদু হাস্য করিয়া বার-দুই মাথা নাড়িয়া হিন্দী করিয়া সংক্ষেপে বলিলেন, বেটা, ঘরে ফিরিয়া যাও—এ পথ অতি দুর্গম।' (পৃঃ ১৩১)

শ্রীকান্ত তাঁকে অপরিসীম পৌরাণিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে বলল যে, বশিষ্ঠকে ধরে জগাই-মাধাই স্বর্গে গিয়েছিল। সুতরাং বাবার পা ধরে সে-ও মুক্তি লাভ করতে পারবে। তারপর চা-সেবা হল। সন্ধ্যাবেলায় ভাঙ্ সেবা হবে। তখনও বেলা আছে দেখে বাবা গঞ্জিকার কলিকাটি দ্বিতীয় চেলাকে দেখিয়ে দিলেন। সর্বদর্শী বাবার কৃপায় শ্রীকান্ত তৃতীয় চেলারূপে ভর্তি হল। একপ্রস্থ গেরুয়া কাপড়, জোড়াদশেক ছোট-বড় রুদ্রাক্ষ মালা, একজোড়া পিতলের তাগা পরে, মাথায়-মুখে ছাই মেখে শ্রীকান্তের যেন জন্মান্তর হল। একটি ছোট আয়নায় তার রূপের নব-সংস্করণ দেখে সে প্রীত হল। বাবা তাকে সন্ন্যাস-জীবনের বৈরাগ্য ও সাধনা সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন ও এই মার্গে থেকে 'বৃক্ষজাতীয় শুষ্ক বস্তুবিশেষের ধূম ঘন ঘন মুখ-বিবর দ্বারা শোষণকরতঃ নাসারন্ধ্রপথে শনৈঃ শনৈঃ বিনির্গত' করবার মহিমা ব্যাখ্যা করলেন। সন্ন্যাসের গুহ্য রহস্য শ্রীকান্ত শিখল। আর এর সঙ্গে চলল চা, রুটি, ঘি, দই-দুধ, চিড়ে-চিনি প্রভৃতি আহার্য দ্রব্য ও এদের জীর্ণ করবার জন্য অনুপান। 'ফলে আবার শুকনো কাঠে ফুল ধরিয়া গেল—একটুখানি ভুঁড়ির লক্ষণও দেখা দিল।'

এভাবে শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের মাধ্যমে বাস্তব 'দৃষ্টি নিয়ে সন্ন্যাস জীবনের রস-মধুর একটি চিত্র এঁকেছেন। কাহিনীর দিক দিয়ে এই অধ্যায়ের সামান্য মূল্য আছে। পাটনার সন্নিকটে অসুস্থ হয়ে না পড়লে শ্রীকান্ত্র ও রাজলক্ষ্মী পরস্পরের সান্নিধ্যে আসতে পারত না ও একে অপরের হৃদয়ের পরিচয়ও পেত না। এই অধ্যায়টি তাদের মধ্যে পারস্পরিক অনুরাগের সেতুটি প্রস্তুত করেছে। শ্রীকান্তর সন্ন্যাস ব্রত শরৎচন্দ্রেরই বৈচিত্র্য-পিয়াসী জীবনের একটি অধ্যায় বিশেষ।

বিঠৌরা গ্রামে ভিক্ষা করতে বেরিয়ে পথিমধ্যে শ্রীকান্তর সঙ্গে যে মেয়েটির সাক্ষাৎ ঘটেছিল সে হচ্ছে, গৌরী তেওয়ারীর মেয়ে এবং ছোটবাঘিয়া গ্রামে যে মহাপ্রাণ (?) বাঙালী পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁরা হলেন রামবাবু ও তাঁর স্ত্রী। শ্রীকান্ত তথা শরৎচন্দ্র সন্ন্যাসী না হলে এই দুটি চরিত্রের সঙ্গে পাঠকেরও পরিচয় ঘটত না। আমাদের সমাজে জাতিভেদ প্রথা যে কি নির্মম আকার ধারণ করতে পারে—তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বিঠৌরা গ্রামের দশ-এগার

বৎসরের এই মেয়েটির কথা ভাবলেই বোঝা যায়। সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে রামবাবুর স্ত্রীর মত এমন স্বার্থপর মহিলা আর নেই।

শ্রীকান্তর মন কিছুটা অনাসক্ত কিন্তু তাই বলে সে সংসার-বৈরাগী নয়, সচেতনভাবে কামনা, বাসনা ত্যাগ করে, সমস্ত সামাজিক বন্ধন সজোরে ভেঙ্গে ফেলে সে পালিয়ে যেতে চায় না। শরৎচন্দ্র সংসারী মানুষ হলেও তাঁর মনেও ছিল নিরাসক্তি এবং বৈচিত্র্যমুখী চিন্তা।

একস্থানে লিখেছেন, তাঁদের বংশের অনেকেরই সংসারের উপর অনাসক্তি ছিল—'ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের বংশের একটা খ্যাতি আছে। 'আমাদের বংশে আটপুরুষ ধরে একজন করে সন্ন্যাসী হয়ে আসছে। আমার মেজ ভাই সন্ন্যাসী। আমার মাতুল বংশ ধর্মভীরু বংশ। মাতামহ খুব গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। আমিও .. এমন কি চার পাঁচবার সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি।' উপন্যাসেও কি শ্রীকান্তকে একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হিসাবে দেখতে পাই না? কারও উপর তার তেমন আকর্ষণ নেই। রাজলক্ষ্মীর ডাকে একবার করে সাড়া দিয়েছে আবার কখন কোথায় চলে গিয়েছে তার কোন ঠিক ঠিকানা রাখেনি। ছন্নছাড়া জীবনের এলোমেলো ঘটনা মাত্র। শ্রীকান্তও যে চারবার (?) সন্ন্যাসী হয়ে ঘরছাডা হয়েছিল তা নিম্নলিখিত কথোপকথন থেকেই পাঠক জানতে পারবেন,

'সাধুজী···যথাসম্ভব গাম্ভীর্য্যের সহিত আমাকে প্রশ্ন করিলেন, আপনি বুঝি তা'হলে একবার সন্ন্যাসী—

আমার মুখে লুচি ছিল, বেশী কথার জো ছিল না, তাই ডান হাতের চারটে আঙুল তুলিয়া ধরিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম,—উঁহু হুঁ, একবার নয়, একবার নয়—

এবার সাধুজীর গাম্ভীর্য আর বজায় রহিল না, সে এবং রাজলক্ষ্মী দুজনেই খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে সাধু কহিলেন, ফিরলেন কেন?

লুচির ডেলাটা তখনও গিলিতে পারি নাই, শুধু রাজলক্ষ্মীকে দেখাইয়া দিলাম। রাজলক্ষ্মী তর্জ্জন করিয়া উঠিল, হাঁ, তাই বই কি! আচ্ছা একবার না হয় আমারি জন্তে—তাও ঠিক সত্যি নয়, আসলে ভয়ানক অসুখে পড়েই.— কিন্তু আর তিন বার?

কহিলাম, সেও প্রায় কাছাকাছি,—মশার কামড়ে। ওটা কিছুতেই চামড়ায় সইল না।' শরৎচন্দ্রের জীবনের এই ধরণের উদাসীনতা, খামখেয়ালি-

পনা এবং অন্যমনস্কতা তাঁর সৃষ্ট অধিকাংশ পুরুষ-চরিত্রেরও বৈশিষ্ট্য, 'বড়দিদি'র সুরেন্দ্রনাথ থেকে 'দত্তা'র নরেন্দ্রনাথ, 'শ্রীকান্ত'র গহর থেকে 'চরিত্রহীনে'র সতীশ—সর্বত্র প্রায় একই ধারার অনুবর্তন।

ছেলেবেলা থেকে শরৎচন্দ্র নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। উপন্যাসের প্রথম দিকেই ইন্দ্রনাথ বীরা শ্রীকান্তের সিগারেট ও সিদ্ধিপাতা খাওয়ার কথা আছে এবং পরবর্তী বহু স্থানে গড়গড়ায় তামাক সেবন করা ও চা-পানের কথা আছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র, বোধহয় এমন নেশা নেই যা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছিলেন। সিগারেট, চা-তামাক, এমন কি মদ ও আফিমও তিনি খেয়েছেন। অবশ্য উপন্যাসের নায়ক শ্রীকান্তকে ততদূর নেশাগ্রস্ত দেখানো মোটেই সম্ভব নয়।

শরৎচন্দ্র সন্ন্যাস জীবনে যে নেশাসক্ত ছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। চন্দননগরে প্রবর্তক সংঘের কর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় তিনি নিজেই বলেছিলেন, 'ভাল ভাল সন্ন্যাসীরা যা করে থাকেন—অর্থাৎ গঞ্জিকা সেবনাদি—তা অনেক করেছি। এখন একেবারে উল্টো।...অভিজ্ঞতা না থাকলে ভাল কিছুই লেখা যায় না। অভিজ্ঞতা লাভের জন্য অনেক কিছুই করতে হয়। অতি ভদ্র, শান্তশিষ্ট জীবন হবে, আর সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ হবে—তা হয় না। তখন এমন অনেক কিছু করতে হত, যাকে ঠিক ভাল বলা যায় না। তবে সুকৃতি ছিল, ওর মধ্যে একেবারে ডুবে পড়িনি। সত্যিকারের জীবন দেখতে গেলে শুচিবাইগ্রস্থ হলে চলবে না।.. কঠোর সমালোচনা আমি খুবই পেয়েছি। গালাগালির বন্যা বয়ে গেছে। দেশ বুঝে না, গ্রন্থকার, কবি, চিত্রকর এঁদের জীবন সাধারণ থেকে ভিন্ন। এখানকার লোক তা জানে না। জানে না যে, এঁদের স্নেহের প্রশ্রয় দিয়েই বাঁচিয়ে রাখতে হয়। মানুষ চায়—এঁদের অভিজ্ঞতা লাভও হোক, আর আমাদের মত শান্ত-শিষ্ট জীবনও যাপন করুক। তা হয় না।'

শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলালও নেশাগ্রস্ত ছিলেন। তাই শরৎচন্দ্রও ছেলেবেলা থেকেই নেশা করাটাকে দারুণ অপরাধ বলে মনে করতেন না। কিন্তু প্রথম যৌবনেই প্রেমে ব্যর্থতা আসার পর এবং জীবনে প্রতিকূল ঘটনা ও দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা বিপর্যয় তাকে আরও উচ্ছৃঙ্খল করে তুলেছিল। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত কালে বহু নেশা থেকেই নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন, কেবল আফিং খাওয়া বাদে। তবু মনের দিক থেকে তিনি অনেক শক্ত ছিলেন বলে জীবনে একদিন প্রতিষ্ঠার মুখ দেখেছিলেন কিন্তু একটা না পাওয়ার বেদনাকে তিনি আজীবন বহন করে বেড়িয়েছেন। তাই উদাসীন, বিশৃঙ্খল

ভাবটি তাঁর কোনদিনই যায়নি, অবহেলার মধ্যে দিয়ে জীবনটি অকালেই শেষ করেছেন। গ্রাম্যজীবন পছন্দ করতেন, শিথিল বিলাসী ছিলেন, হুঁকো-তামাক সেবন করে আর দাবা খেলে তাঁর জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করেছেন। যে ত্রুটিটুকু না থাকলে জীবনে আরও সফলতা আসত তার দিকে তাঁর নজরই ছিল না। অথচ বহু গুণেরই অধিকারী ছিলেন তিনি। এত সমস্ত কাজের মধ্যেও জীবনে ছিল স্ফূর্তি, অসীম মমতা আর প্রেম। জীবন-প্রেমিক, জীবন-রস-রসিক বলেই সততা থেকে কোনদিন নিজেকে তিনি সরিয়ে নেননি। এবং এ কথা হরিদাস শাস্ত্রীকে একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেও ছিলেন। আমাদের ধনীশাসিত সমাজব্যবস্থায় অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিরা অবাধে মদ্যপান এবং উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করেও সমাজ-সংস্কারক ধর্ম-সংস্কারক সাজতে পারেন, কিন্তু 'বড় দরিদ্র', 'বিশটি টাকার জন্য' যিনি একসময়ে একজামিন দিতে পারেননি—তেমন মধ্যবিত্ত সাধারণ কেরাণী মানুষের পক্ষে মদ্যপান একসময়ে জঘন্য চরিত্রহানিকর বলে নিন্দনীয় হয়েছে। মদ্যপানের আনুষঙ্গিক মেয়েমানুষের ব্যাপারটাও এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে।

"নারীজাতি সম্বন্ধে আমার চরিত্র কোনকালেই উচ্ছৃঙ্খল ছিল না, এখনও নয়। নেশার চূড়ান্ত করেছি। অনেক অস্থানে কুস্থানে গিয়েছি, কিন্তু তুমি সে সব জায়গায় খবর নিয়ে জানতে পার, তারা সকলেই আমায় শ্রদ্ধা করতো। কেউ দাদাঠাকুর, কেউ বাবাঠাকুর বলতো। কারণ অত্যন্ত মাতাল অবস্থায়ও তাদের দেহের উপর আমার কখনো লালসা হয়নি। তার কারণ এ নয় যে, আমি অত্যন্ত সংযমী, সাধু, নীতিবাগীশ,—কারণ এই যে, ওটা চিরদিনই আমার রুচিতে ঠেকেছে। যাকে ভালবাসতে পারিনে, তাকে উপভোগ করবার লালসা আমার দেহে জেগে ওঠেনি কখনও।'(২)

ঠিক এই কারণেই কি শ্রীকান্ত নিম্নলিখিত কথাগুলি বুক ফুলিয়ে বলতে পেরেছিল, 'স্ত্রীলোককে কখনো আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারিলাম না।' 'নারীর কলঙ্কে অবিশ্বাস করিয়া সংসারে বরঞ্চ ঠকাও ভাল, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া পাপের ভাগী হওয়ায় লাভ নাই'। মনে হয় কথাগুলি শ্রীকান্তর নয়, শরৎচন্দ্রের—একটি মহৎ মানুষের।

উৎস নির্দেশ

(১) শরৎচন্দ্র—২য় খণ্ড—গোপালচন্দ্র রায়—পৃঃ ১১৮

(২) শরৎ স্মৃতি—বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত—পৃঃ ২৮৯

বর্মাযাত্রা ও বিভিন্ন চরিত্রের সংস্পর্শে

'জ্যোৎস্নারিক্ত ইরাবতী তটে একদা অন্ধকারে
ক্ষুব্ধ নগর-জীবনে শ্রান্ত ক্লান্ত পান্থ তুমি
সুদূর ব্রহ্মদেশের বক্ষে আর্ত অশ্রুধারে
বেদনার ছবি এঁকেছিলে কবি স্বর্ণতুলিকা চুমি।'

বিমলচন্দ্র ঘোষ।

শরৎচন্দ্রের মধ্যে ভবঘুরে, বন্ধন-অসহিষ্ণু, অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় সত্তা চিরকাল বিরাজমান ছিল। কাজেই তাঁর এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনের জন্য তিনি আত্মীয়-স্বজনদের বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন না, অথচ নিজের আত্মমর্যাদাবোধ ছিল প্রবল। উপরন্তু, জীবনে অসহনীয় দারিদ্র এবং প্রথম প্রেমের ব্যর্থতায় তিনি সেই সময়ে দূরে কোথাও চলে যেতে চাইছিলেন। তাই তাঁর মেসোমশাই অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পূর্বে যে ব্রহ্মদেশের চমকপ্রদ গল্প শুনেছিলেন তা মনে পড়ায় নতুন করে এ্যাডভেঞ্চারের নেশা জেগে উঠেছিল। যে মানুষটি দেবানন্দপুর ও ভাগলপুরে অ্যাডভেঞ্চারের সন্ধানে সর্বদা ঘুরে বেড়াতেন, যিনি একদিন ঘরের মায়া ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর বেশে আত্মপরিচয় গোপন করে পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তিনি যে ইরাবতী তীরবর্তী সেই স্বপ্ন রঙীন দেশের আশ্চর্য মানুষগুলিকে জানবার বাসনায় ঘর ছাড়বেন তাতে আর আশ্চর্য কি।

বর্মাদেশ সম্পর্কে তৎকালে এদেশে নানা গল্পও প্রচলিত ছিল। উপন্যাসেও শরৎচন্দ্র তা কিছু কিছু দিয়েছেন। শ্রীকান্ত তার গঙ্গাজল মা'র কাছে শুনেছে, 'তাঁর কোন এক আত্মীয় বর্মা মুলুকে চাকরি করিয়া 'লাল' হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ অতিশয় ধনবান হইয়াছে। সেখানকার পথে-ঘাটে টাকা ছড়ানো আছে—কুড়াইয়া লইবার অপেক্ষা মাত্র। সেখানে জাহাজ হইতে নামিতে না নামিতে বাঙালীদের সাহেবরা কাঁধে করিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়া চাকরি দেয়—এইরূপ অনেক কাহিনী।'

শ্রীকান্তের বর্মা যাওয়ার কথা শুনে রাজলক্ষ্মীও বলেছিল, 'বর্মায় গেলে মানুষ আর ফেরে না সে খবর জানো?'

শ্রীকান্ত অর্থাৎ শরৎচন্দ্র তা জানতেন। তবু তখনকার দিনে অনেক

আশাহত মানুষ উপায়ান্তর না দেখে বর্মায় গিয়ে হাজির হত। কিন্তু শরৎচন্দ্র এত দেশ থাকতে বর্মাতে, অত দূরেই বা গেলেন কেন? এই সূত্রে শরৎচন্দ্রের অর্ধ বৈরাগী পিতার বৈরাগ্যের উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গ ওঠে, আদমপুর ক্লাবের আবহাওয়ার প্রভাবের কথাও উঠতে পারে অথবা দারিদ্র ও লেখাপড়া না শিখতে পারার দুঃখের কথাও উঠতে পারে। এছাড়া কোন একজন বিধবা যুবতী তাঁকে দেশত্যাগী হবার নির্দেশ দেন কী? আর দিলেও, এ নির্দেশ তিনি মানবেন কেন? আসলে, শরৎচন্দ্রের মনে একটা যন্ত্রনা ছিল ঠিকই এবং তার সঙ্গে ছিল জীবিকা অনুসন্ধান। এই দুইয়ে মিলে তাঁকে দেশ ছাড়া করেছিল এবং বর্মার গল্প পূর্বেই শুনেছিলেন বলে সুদূর ব্রহ্মদেশেই যাত্রা করেছিলেন।

তাই দেখি রাজলক্ষ্মী যখন শ্রীকান্তকে জিজ্ঞেস করে, 'কিসের জন্য বর্মায় যেতে চাচ্ছ শুনি?' তার উত্তরে শ্রীকান্ত স্পষ্ট করেই জানায়, 'চাকরি করতে, ঘুরে বেড়াতে নয়।' আসলে এইটাই সত্য।

২৭বৎসর বয়সে নতুন করে ভাগ্যান্বেষণে শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশে গিয়েছিলেন। আত্মীয়-স্বজনদের না জানিয়ে, একরূপ গোপনেই ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যাত্রা করেছিলেন। তখনকার দিনে বিলাতের মেল নিয়ে যে জাহাজ ছাড়ত, সেই জাহাজ তিন দিনে রেঙ্গুনে পৌছাত; আর কেবলমাত্র ভারতের মেল নিয়ে যে জাহাজ কলিকাতা থেকে ছাড়ত তার সময় লাগত চার দিন। শরৎচন্দ্র ভারতের মেল নেওয়া জাহাজে চড়ে ব্রহ্মদেশ যাত্রা করেন। 'একদিন ভোরবেলায় একটা লোহার তোরঙ্গ এবং একটা পাতলা বিছানা মাত্র অবলম্বন করিয়া কলিকাতার কয়লাঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।' (পৃঃ ১৭৮)

শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে যান, তখন সেখানে প্লেগ রোগ দেখা দিয়েছিল এবং ঐ রোগের বীজ নাকি বোম্বাই শহর থেকে যায়। তাই, রেঙ্গুনের তখনকার ডাক্তার ও সাহেবদের ধারণা হয়েছিল, কুলীদের মধ্যেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। তারা এই রোগ রেঙ্গুনে ছড়িয়ে দেবে। আর সাহেবদের ধারণা জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে ডেকের যাত্রীরাই কুলীশ্রেণীভুক্ত। অতএব তাদের উপযুক্তভাবে পরীক্ষার প্রয়োজন। শরৎচন্দ্র উপন্যাসে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন, 'জাহাজ যে কখন আসিয়া ঘাটে ভিড়িবে, সে জাহাজই জানে;—সহসা চাহিয়া দেখি, এই চোদ্দ-পনর শ' লোক ইতিমধ্যে কখন ভেড়ার পালের মত সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া গেছে। একজন হিন্দুস্থানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাপু বেশ ত সকলে বসেছিলে,—হঠাৎ এমন কাতার দিয়ে দাঁড়ালে কেন? সে কহিল, ডগ্দরি হোগা।

ডগ্‌দরি পদার্থটি কি বাপু?

লোকটি পিছনের একটা ঠেলা সামলাইয়া কহিল, আরে, পিলেগকা ডগ্‌দরি।

জিনিষটা আরও দুর্বোধ্য হইয়া পড়িল। কিন্তু বুঝি না বুঝি, এতগুলো লোকের যাহা আবশ্যক, আমারও ত তাহা চাই।.........বর্মায় এখনো প্লেগ যায় নাই, তাই এই সতর্কতা। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া পাস করিলে তবেই সে জাহাজে উঠিতে পাইব। অর্থাৎ রেঙ্গুন যাইবার জন্য যাহারা উদ্যত হইয়াছে, তাহারা প্লেগের রোগী কি না, তাহা প্রথমে যাচাই হওয়া দরকার। ....ক্রমশঃ 'পিলেগকা ডগ্‌দরি' আসন্ন হইয়া উঠিল—সাহেব ডাক্তার স-পেয়াদা দেখা দিলেন।' (পৃঃ ১৭৯)

এইভাবে শরৎচন্দ্র তাঁর জাহাজে যাত্রার বাস্তব অভিজ্ঞতা উপন্যাসে কাজে লাগিয়েছেন। হয়তো সেই সময়ে সমুদ্রে সাইক্লোন হয়েও থাকবে। এই বর্মা যাত্রা যেন শরৎচন্দ্রের কল্পনা ও বর্ণনা শক্তির নতুন বিজয়-অভিযান। সমুদ্র-যাত্রার বর্ণনায় একাধারে কবিত্ব, জীবন-সমালোচনা, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, প্রভৃতি সকল প্রকার মানসিক শক্তিরই সার্থকতা হয়েছে।

এরপর উপন্যাসে 'ক্যোয়রাণ্টিন' (Quarantine)-এর ব্যাপার আছে। কোন বন্দরে সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে সেই বন্দর থেকে জাহাজ অন্য বন্দরে গেলে, বন্দরে ভিড়বার পূর্বে জাহাজকে বন্দর থেকে কিছু দূরে একটা স্থানে কয়েক দিনের জন্য আটক থাকতে হয়। সতর্কতামূলক ঐ আটক থাকার সময়টাকেই ইংরাজীতে বলে Quarantine. উপন্যাসের ২০৩ পৃষ্ঠায় লেখকের বর্ণনায় পাই, 'কেরেণ্টিন্ কারাবাসের আইন কুলিদের জন্য,—ভদ্রলোকের জন্য নহে; এবং যে কেহ জাহাজের ভাড়া দশ টাকার বেশী দেয় নাই, সে-ই কুলি। চা বাগানের আইনে কি বলে, জানি না, তবে জাহাজী আইন এই বটে; এবং কর্তৃপক্ষরাও প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে কি জানেন, তা তাঁরাই জানেন; কিন্তু অফিসিয়েলি তাঁহাদের ইহার অধিক জানার রীতি নাই। অতএব সে-যাত্রায় আমরা সকলেই কুলি ছিলাম। ..... আমরা তিনটি প্রাণী মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য এবং পদতলে ততোধিক উগ্র উত্তপ্ত বালুকারাশির উপরে, এক অপরিচিত নদীকূলে, এক রাশ মোট-ঘাট সুমুখে লইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে পরস্পরের মুখোমুখি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।' এই অভিজ্ঞতা শরৎচন্দ্রের সত্য সত্যই হয়েছিল। বঙ্গোপসাগর থেকে যে নদী দিয়ে জাহাজ রেঙ্গুন শহরে গিয়ে পৌঁছায়, সেই ইরাবতী ধরে ২৮ মাইল গেলে দেখা যায়, তিন দিক থেকে

এই নদীর উৎপত্তি। নদীর এই চতুষ্কোণ জায়গার একদিকে রেঙ্গুন শহর, অন্যদিকে চৌটাঙ্, আবার এক পারে সিরিয়াম ও টঙ্গিন, অন্য পারে ডালা। 'কেরেন্টিন্' যাত্রীদের ঐ 'ডালা'র সীমান্তে একটা জঙ্গলঘেরা স্থানে সাত দিন নামিয়ে রাখা হয়েছিল। শরৎচন্দ্র ডেকের যাত্রী ছিলেন, সুতরাং তাঁকেও Quarantine যাত্রী হিসাবে ঐখানে সাতদিন আটক থাকতে হয়েছিল। সাতদিন সেখানে থেকে একপ্রকার শূন্যহস্ত হয়ে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন শহরে গিয়েছিলেন। (১) "তারপরে একদিন মিয়াদ ফুরাইল। দাদাও ভাল হইলেন, আমরাও সরকারি ছাড়-পত্র পাইয়া আর একবার পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া রেঙ্গুনে যাত্রা করিলাম।" (পৃঃ ২০৭)

রেঙ্গুনে সেই সময়ে কোন বাঙালী হোটেল না থাকায় শরৎচন্দ্র 'দাঠাকুরের হোটেল' নামে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণের হোটেলে উঠে তাঁর মেসোমশাইয়ের খোঁজ করেন। উপন্যাসেও এই দা'ঠাকুরের হোটেলের উল্লেখ আছে এবং শ্রীকান্ত সেখানেই প্রথম আশ্রয় নেয়। এই হোটেলেই কল-কারখানার মিস্ত্রীরা খাওয়া-দাওয়া করত এবং তারা বামুন ঠাকুরকে দা'ঠাকুর বলেই ডাকত। অভয়া, নন্দ মিস্ত্রী, টগর, দা'ঠাকুরের হোটেল প্রভৃতির কথা চিন্তা করলে শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের অভিজ্ঞতার কথাই মনে হয়। উপন্যাসে রেঙ্গুনের অনেক ঘটনা ও চরিত্রই শরৎচন্দ্র নিজের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার স্মৃতি থেকে বর্ণনা করেছেন।

উপন্যাসে একস্থানে শরৎচন্দ্রের চাকরি পাওয়া সম্পর্কে আছে, 'বাসায় আসিয়া একখানি লেফাফার পত্র পাইলাম। খুলিয়া দেখি, চাকরীর দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছে। সেগুন কাষ্ঠের প্রকাণ্ড ব্যয়সায়ী—অনেক আবেদনের মধ্যে ইহারাই গরীবের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। ভগবান তাঁহাদের মঙ্গল করুন।' (২২৫ পৃঃ) শরৎচন্দ্র এক ধান্য ব্যবসায়ীর সহকারী হিসাবে কিছুদিন কাজ করেছিলেন। রেঙ্গনে থাকাকালীল তিনি বহু স্থানেই চাকরির সন্ধান করেন এবং ছোটখাট কাজও অনেক স্থানে করেন। পরে এক সাহেবের সঙ্গে বিবাদ করে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলিকাতায় চলে আসেন। এই সকল কথা তিনি উপন্যাসে স্থান দেবার প্রয়োজন বোধ করেননি। তবে দারিদ্র মেটাবার জন্য একটি ছোট চায়ের দোকান তিনি করেছিলেন। তাঁর খাম-খেয়ালী স্বভাবের জন্য তা-ও তিনি বেশী দিন টেঁকাতে সক্ষম হননি। দোকান দেওয়ার আভাস আছে উপন্যাসে অন্য পরিপ্রেক্ষিতে। রাজলক্ষ্মী যখন শ্রীকান্তকে তাঁর শেষ জীবনের পাথেয় হিসাবে সঞ্চিত টাকা দিয়ে দোকান

করতে বলেছিল, তখন শ্রীকান্তের জবাব ছিল এই, 'কিন্তু মনোহারী দোকান চালাতেও ত আমি পেরে উঠবো না।

কেন পেরে উঠবে না ?

প্রথম কারণ, জিনিসের দাম আমার মনে থাকে না, দ্বিতীয় কারণ, দাম নেওয়া এবং দ্রুত হিসেব করে বাকি ফিরিয়ে দেওয়া সে আরও অসম্ভব। দোকান উঠবেই, খদ্দেরের সঙ্গে লাঠালাঠি না বাধলে বাঁচি।

তবে একটা কাপড়ের দোকান করো।

তার চেয়ে একটা জ্যান্ত ভালুকের দোকান করে দাও, সে বরঞ্চ চালানো সহজ-হ'বে।' (পৃঃ ৬৬৮)

বর্মায় থাকাকালীন শরৎচন্দ্র অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছিলেন। মদ খেতেন। বর্মার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। নারীর প্রণয়প্রার্থী হয়ে ব্যর্থ হয়েছেন বলেও শোনা যায়। কিন্তু সেগুলির পিছনে 'নারীর ইতিহাস' সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য ছিল কিনা বলা কঠিন। এই নারীর কথা জানবার জন্য বহুদিন বহু পতিতালয়ে পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন ; এজন্য দুর্নামের ভাগী হয়েছেন। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে এইভাবে। শরৎচন্দ্রকে অনেকে 'নারী দরদী' বলে থাকেন। এই অভিজ্ঞতাই তাঁর উপন্যাসের নারীচরিত্রের মধ্যে প্রাণ এনে দিয়েছে।

গ্রামের লম্পট জমিদার থেকে মুসলমান কৃষকের পর্ণকুটির এবং সন্ন্যাসী ফকির, আফিঙের চোরা চালানদার ও বারবনিতা, রাজনৈতিক মঞ্চের উচ্চ-সারির নেতা ও আত্মগোপনকারী সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী—জীবনে কত পরস্পর-বিরোধী মানুষই না শরৎচন্দ্র দেখেছেন !

বর্মায় শরৎচন্দ্র যে পল্লীতে বসবাস করেছেন সেখানে বাঙালী মিস্ত্রীদের প্রাধান্য থাকলেও ভারতের অন্যান্য অঞ্চল ও নানা দেশের মানুষই সেখানে থাকত। মিস্ত্রীশ্রেণীর এই মানুষগুলির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের জীবন যুক্ত হয়ে পড়েছিল বলে সমাজে মান-সম্ভ্রম বিশেষ লাভ করতে পারেননি বটে কিন্তু তাদের জীবনের সত্য ও বাস্তব রূপ তাঁর সম্মুখে অনাবৃত হয়ে গিয়েছিল। জীবনের এই মহামূল্য অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টিতে কাজে লেগেছিল। কারণ, এই বাস্তব অভিজ্ঞতাই কথাসাহিত্য রচনার মূল উপাদান।

'শ্রীকান্ত' (২য় পর্ব), 'চরিত্রহীন', 'পথের দাবী' প্রভৃতি যেখানেই তিনি ব্রহ্মদেশের চিত্র এঁকেছেন সেখানে তাঁর চেনা সমাজের পরিচিত লোকগুলিই এসেছে। যদিও চরিত্রগুলির অধিকাংশই বাঙালী রূপ পেয়েছে, ব্রহ্মদেশীয় নয়।

নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলির মধ্যে ব্রহ্মদেশীয় একটা পরিবেশের কথা ভাবলেও, ব্রহ্মদেশের উচ্চ ও অভিজাত শ্রেণীর মানুষের চিত্র তাঁর সাহিত্যে খুব কমই পাওয়া যায়, কারণ ঐ উচ্চশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ তাঁর ছিল না। কেবল, 'ছবি' গল্পের ঘটনাস্থল ব্রহ্মদেশ এবং সকল চরিত্রও ব্রহ্মদেশের, তাই এই গল্পেই কিছুটা ব্রহ্মদেশীয় আবহাওয়া বা জীবনের ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়। তবে, 'শ্রীকান্তে'র অভয়া-শ্রীকান্ত কাহিনী বা টগর বোষ্টমীর কথা ব্রহ্মদেশের পটভূমিতে রচিত বটে কিন্তু তাঁরা ব্রহ্মদেশের মানুষ হিসাবে চিহ্নিত নন। 'চরিত্রহীন'-এর কিরণময়ী ও দিবাকর কামিনী বাড়িউলীর যে নোংরা পরিবেশের মধ্যে এসে পড়েছিল তা শরৎচন্দ্রের নিজস্ব জীবনে একান্ত পরিচিত। তবে কিরণময়ী দিবাকরকে নিয়ে ব্রহ্মদেশের আরাকানে পালিয়েছে মাত্র। সেই বাড়িউলী বা এরা দুজন ব্রহ্মদেশীয় নয়। নিম্নশ্রেণীর পরিবেশ চিত্রই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাসেও এই সকল হতভাগ্য লোকগুলিকে দিয়ে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করার চেষ্টা হয়েছে। অপূর্ব ও ভারতীকেও শরৎচন্দ্র তাই কদর্য পরিবেশের মধ্যে ঘুরিয়েছেন। ব্রহ্মদেশের মানুষ বলে চিহ্নিত না করেও, ব্রহ্মদেশের পটভূমিতে, ভাগ্যহীন, মদ্যপায়ী মানিক, হাতভাঙ্গা, নিরুপায় অবস্থায় পতিত পাঁচকড়ি, নীচাশয় কালাচাঁদ প্রভৃতি মিস্ত্রী ও মজুর চরিত্রের সঙ্গে তিনি দিনরাত বাস করেছিলেন বলেই তো তাদের কথা এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবতার সঙ্গে প্রকাশ করতে পেরেছেন।(২)

চরিত্র পরিস্ফুটনে ও পটভূমিকায় শরৎচন্দ্র নিজের পরিচিত গণ্ডীর বাইরে যেতে চাননি। যে সমস্ত বিষয় তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে ছিল সেখানে তিনি নিজেকে গুটিয়ে রাখতেই চেষ্টা করতেন। ব্রহ্মদেশের পটভূমিতে, ব্রহ্মদেশের মানুষের স্বরূপে আঁকবার সুযোগ পেয়েও তিনি কৌশলে উপরিউক্ত গল্পের চরিত্রগুলিকে দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর চরিত্র রূপেই প্রকাশ করেছেন। বলা বাহুল্য, এগুলি তাঁর ঐ কদর্য পল্লীর ঘৃণিত মানুষগুলির মধ্যে বাসা বেঁধে থাকার যে অভিজ্ঞতা তারই উপযুক্ত ফসল। শরৎচন্দ্র ঘৃণিত জীবন স্তর থেকে পতিত নরনারীর চিত্র এঁকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার স্পর্শে চরিত্রগুলিকে এত জীবন্ত করে তুলেছেন। শরৎচন্দ্র তাই বলতে চাইতেন যে, মানুষ ও মানুষের সমাজই শিল্পের উপজীব্য—যাঁরা তা দেখেননি, জানেননি, ভাবের তাত্ত্বিকতা বা কথার ফুলঝুরি দিয়ে কথাসাহিত্য রচনার অধিকার তাঁদের নেই।

'পথের দাবী'-র দুটি পরিচ্ছেদে রেঙ্গুনের উপকণ্ঠবর্তী ভারতবর্ষীয় কুলি-

লাইনের বস্তুনিষ্ঠ ছবিও তাই পাওয়া গেছে। এখানে শরৎচন্দ্র অভিজ্ঞতা ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করেছেন, সবরকম আবেগ, রোমাণ্টিক ভাবাকুলতা, মধ্যবিত্তসুলভ সংস্কার ও অভিমান পরিহার করেছেন। তাই মজুরদের ভীরুতা, নীচুতা, রুক্ষতা ও সুবিধাবাদ এমন বাস্তব। এই গ্রন্থের দু-তিনটি পরিচ্ছেদ বস্তিজীবন ও শ্রমিক-জীবনের বস্তুনিষ্ঠ আলেখ্য বলা চলে।

উৎস-নির্দেশ

(১) শরৎচন্দ্র (১ম খণ্ড)—গোপাল চন্দ্র রায়। পৃঃ ৬৪
(২) শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ। পৃঃ ৯৩

জীবন স্বভাবে পথিক

'শরৎচন্দ্র' বাঙালী-মানসের এক নাম,
ধূলি ধূসরিত ভবঘুরের প্রতি প্রণাম।
—লেখক।

শৈশব-কৈশোর ও যৌবন—যে বয়সে জীবনে পা-ফেলা মনকে বিস্ময়ে করে তোলে চঞ্চল, অস্থির ও উৎসুক ; শরৎচন্দ্র সেই বয়সে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন বার বার অজানা জীবনের দুর্মদ স্বাদ গ্রহণ করতে। দেবানন্দপুর থেকে তার শুরু হয়েছিল এবং শেষ করেছিলেন ভাগলপুর-ডিহরী-মজঃফরপুর -কলিকাতা-ব্রহ্মদেশ-শিবপুর-পানিত্রাস হয়ে আবার কলিকাতায়। দেবান্দপুরের সরস্বতী নদীর তীর ছেড়ে গিয়েছেন ভাগলপুরের গঙ্গার তীরে, সেখান থেকে পিতার সঙ্গে শোন-নদীর তীরস্থ ডিহরীতে ; তারপর মজঃফরপুর-কলিকাতা হয়ে সুদূর ইরাবতীর তটে ব্রহ্মদেশে। আবার সেখান থেকে ফিরে আসেন, বাসস্থান নির্মিত হয় রূপনারায়ণের তীরে। গঙ্গা ও রূপনারায়ণের তীরে জীবনের শেষ অধ্যায় রচিত হয়—এই পথিক শিল্পী, জন্ম-ভবঘুরে শিল্পী—শরৎচন্দ্রের।

তাঁর সমগ্র জীবন তাই অতিবাহিত হয়েছে এক বিচিত্র পরিবেশে। দেবানন্দপুর-ভাগলপুরের যৌথ-পরিবারে আকৈশোর অবস্থিতি, উপরন্তু

ভাগলপুরের গাঙ্গুলীবাড়ির শৈশব-কৈশোরের অভিজ্ঞতা এবং ভট্ট পরিবারের সাহিত্যিক পরিবেশ, খ্যাতনামা উকিল শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র সতীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'আদমপুর ক্লাবে'র সাংস্কৃতিক আবহাওয়া, সর্বোপরি দুর্ধর্ষ বন্ধু রাজেনের উদ্দাম সাহচর্য ও রাজেন-ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সাহিত্য ও সঙ্গীতের সান্ধ্য বৈঠক, তাঁর অভিজ্ঞতার দ্বার খুলে দিয়েছে। কিন্তু ব্যর্থ প্রেমিক একদিন নিঃসঙ্গ পথিক-শরৎচন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তাঁর পথিক সত্তা ব্রত নিল শুধু চলার। সন্ন্যাস-জীবন অতিবাহিত হল বিহারের এখানে-সেখানে। মজঃফরপুরের বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে হল ঘনিষ্ঠতা, লেখিকা অনুরূপা দেবীর গৃহে এবং পরে স্থানীয় জমিদার মহাদেব সাহুর মজলিসী আবহাওয়ায় নিজেকে মজিয়ে দিলেন।

নিত্যভ্রমণকারী সন্ন্যাসী হচ্ছে পরিব্রাজক, আর ভ্রমণকারী হচ্ছে পর্যটক। শরৎচন্দ্র সন্ন্যাসী ছিলেন না, কিন্তু সন্ন্যাসীর মতই কয়েক মাস বিহারের এখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছেন, যা অনুরূপাদেবীর লেখায় কিছুটা ধরা পড়েছে। শ্রীকান্তও ঠিক তেমন করেই একবার সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরেছে।

কিন্তু একদিন ডাক দিল সুদূর ইরারতীর নির্জনতা এবং সেই হাতছানিতে পাড়ি জমালেন সেখানে, শুরু হল বিশৃঙ্খল জীবন-যাপন, ভবঘুরে বৃত্তি। আবার ফিরলেন শিবপুরের শহর জীবনের সামাজিকতায়, সাহিত্যিক পরিবেশে। রাজনীতির সঙ্গে ঘটল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, মনে এল প্রচণ্ড স্বদেশ চেতনা; তাই পানিত্রাসের পল্লীবাসে সামাজিক সংকীর্ণতায়, কু-সংস্কার ও জাতিগত ভেদ-প্রবণতায়ও তিনি হাঁপিয়ে পড়লেন না। পথিক মন অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞতায় ভরিয়ে তুললেন তাঁর সৃষ্টির পাতা। শরৎচন্দ্র তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধিকে এইভাবে প্রসারিত করে তুলেছেন তাঁর পথিক সত্তায় এবং এইভাবেই তাঁর লেখক-চরিত্রটিও গড়ে উঠেছে।

ভবঘুরে মানুষ হয় নিরাসক্ত, উদাস, নিঃসঙ্গ। শরৎচন্দ্রও সেই অর্থে ছিলেন নিঃসঙ্গ পথিক। একজন নিঃসঙ্গ পথিক-শিল্পীর আত্মপ্রকাশই এই 'শ্রীকান্ত'। শরৎচন্দ্রের জীবনের প্রায় সাতাশ বৎসরের নানা ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে প্রথম পর্বে। স্বাভাবিক কারণেই ভাগলপুরের পরিবেশ, ঘটনা ও চরিত্র এই পর্বে প্রাধান্য পেয়েছে এবং মাঝে মাঝে দেবানন্দপুরের স্মৃতিও কিছু মিশে গেছে। এইভাবে ভাগলপুরে যে কাহিনী শুরু হয়েছে তা প্রধানতঃ বিহারের নানা অঞ্চলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে ব্রহ্মদেশ পরিক্রমা শেষ করে গঙ্গামাটি ঘুরে অবশেষে দেবানন্দপুরে শেষ হয়েছে। চতুর্থ পর্বে শরৎচন্দ্র

কাহিনীর স্থচনা ও পরিণতি একস্থত্রে গেঁথে দিয়েছেন। প্রথম পর্ব রচনার সতেরো বৎসর পরে চতুর্থ পর্ব রচনা করে জীবনের অভিজ্ঞতার স্মৃতি তাঁর চলার পথের কথা বলে এই আত্মজীবন-নির্ভর উপন্যাসের সমাপ্তি টানলেন। 'শ্রীকান্ত' তাই শরৎচন্দ্রের পথিক সত্তারই স্মৃতিকথা হয়ে রইল। শ্রীকান্তও দেবানন্দপুর, ভাগলপুর, মজঃফরপুর ও বর্মামুল্লুকে ঘুরে বেড়াল। এবং উপন্যাসের প্রতিটি পর্বেই শরৎচন্দ্রও শ্রীকান্তের মাধ্যমে তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশীল, কৌতুক-সন্ধানী ও নিরাসক্ত দৃষ্টি নিয়ে জীবনের বিচিত্র পথে বিচরণ করেছেন।

দক্ষ সাঁতারু

'Ability is a poor man's wealth.'—M. Wren

শরৎচন্দ্র নদী, বোধ করি, অত্যন্ত ভালবাসতেন। কারণ, একদিন দেবানন্দপুর গ্রামের সরস্বতী নদীর তীরে যাঁর জন্ম ও শৈশব কাটে, ভাগলপুরের গঙ্গার তীরে কৈশোর ও যৌবনের চঞ্চল জীবনের প্রারম্ভ ঘটে, ব্রহ্মদেশের তের বৎসর ইরাবতীর তীরে থেকে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়, তিনি প্রৌঢ়ে ইরাবতীর ধারা শেষ করে এসেও গঙ্গা ও রূপনারায়ণের তীরে জীবনের শেষ অধ্যায়ের শুরু করেছিলেন। স্থতরাং যে মানুষটির দেবানন্দপুরের সরস্বতী নদীর তীরে জন্ম, ভাগলপুরের গঙ্গার তীরে প্রতিভার উন্মেষ, রেঙ্গুনে ইরাবতীর তীরে সেই প্রতিভার পরিপুষ্টি এবং বাঙলাদেশের গঙ্গার তীরে তার পরিণতি—এক কথায়, নদীর তীরে তীরেই যে মানুষটির জীবন অতিবাহিত হয়েছে—সে মানুষটি নদীকে ভাল না বেসে থাকতে পারেন না।

নদীকে যিনি এত ভালবাসতেন তিনি নদীর শীতল জলে অবগাহন করতেও নিশ্চয়ই পছন্দ করতেন। শুধু তাই নয়, ছেলেবেলায় দুরন্ত শরৎচন্দ্র দুরন্ত নদীতে তোলপাড় করে সাঁতার দিতেও অভ্যস্ত ছিলেন। দেবানন্দপুরের সেকালের সরস্বতী নদীতে (বর্তমানে মজে গেছে) এবং ভাগলপুরের গঙ্গায় সাঁতার ছিল তাঁর নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাস। ভাগলপুরের নদীর কথা প্রসঙ্গে স্থরেন্দ্রনাথ 'শরৎ-পরিচয়'-এ লিখেছেন, "সেই শনিবার বিকেলে যমুনীয়াতে

"বোহা"—অর্থাৎ চানন নদীর গেরুয়া রং এর জলের ঢল নেমেছে। তখন গঙ্গা সরে সহর থেকে মাইলটাক দূরে—মাঝখানে শুকনো খাতটার নাম যমুনীয়া। ওপারের চড়ায় ভুট্টা গাছ উঠেছে মানুষের মাথা ছাড়িয়ে। তারা যেন, ডাকে ছেলেদের হাতছানি দিয়ে—তার খস্-খসে পাতার শব্দ শোনা যায়—আয় আয় ··· বহুদূর থেকেই।

এ-পাড়ে মণি-শরৎ আর নিজেদের কিছুতেই এঁটে রাখতে পারে না। মালকোঁচা মেরে গঙ্গার কাঁকড়ের পাড় থেকে দুজনে উল্কার মত ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই যমুনীয়ার লাল জলে।

ডুববে না নিশ্চয় ; ওরা জলের পোকা।" (পৃঃ ৬৯)

ভাগলপুরের এই গঙ্গার কথা এবং সাঁতার কাটার কথা 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে নানা স্থানে আছে। যেমন—

"অনতিকাল পরে গোঁসাইবাগানের সেই ভয়ঙ্কর বনপথের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং ইন্দ্রকে অনুসরণ করিয়া, স্বপ্নাবিষ্টের মত তাহা অতিক্রম করিয়া গঙ্গার তীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

খাড়া কাঁকড়ের পাড়। মাথার উপর একটা বহু প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ।"

* * *

"হঠাৎ সে কথা কহিল,—'কি রে শ্রীকান্ত, ভয় করে?'

আমি বলিলাম, 'নাঃ—'

ইন্দ্র খুসী হইয়া কহিল, এই ত চাই—সাঁতার জানলে আবার ভয় কিসের!

প্রত্যুত্তরে আমি একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিলাম—পাছে সে শুনিতে পায়। কিন্তু, এই গাঢ় অন্ধকার রাত্রিতে এই জলরাশি এবং এই দুর্জয় স্রোতের সঙ্গে সাঁতার জানা এবং না-জানার পার্থক্য যে কি, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না।

* * *

ঝপাৎ করিয়া দাঁড় জলে ফেলিয়া প্রাণপণে টান দিলাম। ইন্দ্র খুসী হইয়া বলিল, এই ত চাই। কিন্তু আস্তে ভাই—ব্যাটারা ভারি পাজী। আমি ঝাউবনের পাশ দিয়ে মক্কা খেতের ভেতর দিয়ে এমনি বার করে নিয়ে যাবো যে, শালারা টেরও পাবে না। একটু হাসিয়া কহিল, আর টের পেলেই বা কি? ধরা কি মুখের কথা। ছাখ শ্রীকান্ত, কিছু ভয় নেই—ব্যাটাদের চারখানা ডিঙি আছে বটে, কিন্তু যদি দেখিস্ ঘিরে ফেললে বলে—আর পালাবার যো নেই, তখন ঝুপ ক'রে লাফিয়ে পড়ে' এক-ডুবে যতদূর পারিস্ গিয়ে ভেসে উঠলেই হ'ল। এ অন্ধকারে আর দেখবার জো-টি নাই—তারপর মজা করে

সতুয়ার চড়ায় উঠে ভোরবেলায় সাঁতরে এপারে এসে গঙ্গার ধারে ধারে বাড়ী ফিরে গেলেই বাস্! কি করবে ব্যাটারা?

চড়াটার নাম শুনিয়াছিলাম; কহিলাম, সতুয়ার চড়া ত ঘোর নালার সুমুখে, সে ত অনেক দূর!

ইন্দ্র তাচ্ছিল্যভরে কহিল, কোথায় অনেক দূর? ছ-সাত ক্রোশও হ'বে না বোধ হয়। হাত ধরে গেলে চিৎ হয়ে থাকলেই হ'ল। তা ছাড়া মড়া পোড়ানো বড় বড় গুঁড়ি কত ভেসে যাবে দেখতে পাবি।"

* * *

"সেদিন শনিবার। স্কুল হইতে সকাল সকাল ফিরিয়াছি। গঙ্গার জল মরিতে সুরু করিয়াছে। তাহারই সংলগ্ন একটা নালার ধারে বসিয়া ছিপ দিয়া ট্যাঙরা মাছ ধরিতে বসিয়া গিয়াছি।"

উপরের উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে গঙ্গার তীরের খাড়া কাঁকরের পাড়, শ্রীকান্তের সাঁতার জানা, ইন্দ্রনাথের মাঝিদের ফাঁকি দিয়ে ছয় সাত ক্রোশ গঙ্গায় সাঁতার দিয়ে, সতুয়ার চড়ায় পালানোর দুঃসাহসিক কথা এবং শ্রীকান্তের গঙ্গায় ছিপ ফেলে ট্যাংরা মাছ ধরার কথা আছে। বলা বাহুল্য, এর প্রতিটি ঘটনাই সত্য। রাজেন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র উভয়েই গঙ্গায় সাঁতার কাটত, জেলেদের মাছ চুরি করত এবং ছিপ দিয়ে মাছ ধরত। আর, ইন্দ্রনাথের ঐ 'ছ-সাত কোশ' গঙ্গায় সাঁতার দেওয়া—পাঠকের কাছে অবাস্তব বলে মনে হতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় শরৎচন্দ্র এই স্থানে অতিরঞ্জিত করে লেখেননি। কারণ, শরৎচন্দ্র একদিন কথা প্রসঙ্গে সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে কথা বলেছিলেন তা থেকে একথা বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হতে পারে।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি লেখা ('জন্মদিনের উপহার' ১৩৩৪, ৩১শে ভাদ্র) থেকে জানা যায় যে, শরৎচন্দ্র বাজেশিবপুরে থাকাকালীন একবার কাশী যান। সেখানে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পথে চলতে চলতে কেদারনাথ শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করলেন, "আপনাকে বড় কাহিল দেখছি। সম্প্রতি অসুখ থেকে উঠেছেন বুঝি?"

শরৎচন্দ্র উত্তর দিলেন,—'না, আমি বরাবরই এই রকম। একবার ভাগলপুরের গঙ্গায় পড়ে এই শরীরেই কাহাল গাঁয়ে গিয়ে উঠি।'

ভাগলপুরের গঙ্গা থেকে কাহালগাঁয়ের দূরত্ব আনুমানিক প্রায় দশ-বার মাইল। নিজের সাঁতার দেওয়া সম্পর্কে কেদারবাবুর কাছে অকারণ মিথ্যা কথা বলার প্রয়োজন শরৎচন্দ্রের নিশ্চয়ই ছিল না। এই থেকেই বোঝা যায়

শরৎচন্দ্র সাঁতার কাটতে কত ভালবাসতেন। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে অবশ্য শরৎচন্দ্র ইন্দ্রনাথকে শ্রীকান্তের তুলনায় সাহসী এবং শক্তিশালী দেখাবার জন্যই এইরূপ কথা লিখেছেন কিন্তু বাস্তবে শরৎচন্দ্র নিজেও রাজেন্দ্রনাথের চেয়ে কম সাহসী ও দুরন্ত ছিলেন না। উপন্যাসের প্রয়োজনেই এখানে ইন্দ্রনাথকে দুঃসাহসী সাঁতারু হিসবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে।

বেশি বয়সেও যে শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরের ঐ গঙ্গায় সাঁতার দেওয়ার একটা টান ছিল তা সুরেন্দ্রনাথের 'শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক' গ্রন্থতে মেলে,—

"এখনও সেই কথা বলিতে শুনি। এখনও সে (শরৎচন্দ্র) বিনা আহ্বানে—কেবলমাত্র প্রাণের টানে এক একবার ভাগলপুরে ছুটিয়া আসে। এখন বয়স হইয়াছে, তবুও সেই পথের ঘাটের ভগ্নস্তূপের চূড়া হইতে ঝাঁপ খাইয়া জলে পড়িয়া সাঁতার দিবার ইচ্ছা তাহার তরুণ বয়সের মতই আছে। গঙ্গার ওপারের ঝাউবনের ডাক—আজিও তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে।"

(পৃঃ ৫৩)

জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই শরৎচন্দ্র এমন ব্যাকুল হায় উঠতেন বলেই অমন দরিদ্র মানুষ একদিন খ্যাতির মুখ দেখেছিলেন। অক্ষমতাই দারিদ্রের মূল। অক্ষমতা যে তাঁর মোটেই ছিল না তার প্রমাণ তিনি বহু দিয়েছেন।

সর্প বিশারদ

"প্রতি রবিবারের সন্ধ্যাবেলায় আমাদের রসচক্রের বৈঠকে (শরৎচন্দ্র) যোগ দিতেন। হাতে একটা অত্যন্ত পুরাতন শ্রীহীন লাঠি থাকত। আমরা বলতাম, 'ও লাঠিগাছটা ফেলে দিয়ে একটা ভদ্রগোছের লাঠি ব্যবহার করুন।' তিনি বলতেন—'আমি তো বুড়ো হয়েছি শ্রীহীন হয়েছি আমাকেও তোমরা তবে ফেলে দেবে? জানো এ লাঠি আমার বন্ধু, এতে আমি কত যে সাপ মেরেছি, তার ইয়ত্তা নেই। একে কি ফেলতে পারি?" ('রসচক্র ও শরৎচন্দ্র' —শ্রীকালিদাদ রায়)

আমাদের মনে প্রশ্ন উঁকি দিতে পারে যে, শরৎচন্দ্র কি তাঁর বোহেমিয়ান

জীবনের কোন এক সময়ে সাপুড়ে হয়েছিলেন? এ প্রশ্ন হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কারণ শরৎ-জীবনী নিয়ে নাড়াচাড়া করলে জানা যায়, তিনি জীবনে বহু বিষধর সাপ নিজে হাতে বহুবারই ধরেছিলেন এবং বিভিন্ন সাপ সম্বন্ধে তাঁর অসীম কৌতূহলও ছিল। শরৎ-সাহিত্যেও তার প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী রূপেই এসেছে। শরৎ-সাহিত্যে সাপের যে সকল তথ্য আমরা পেয়েছি তাতে মনে হয় তা কেবলমাত্র বই-পড়া বিদ্যে দ্বারা সম্ভব হয়নি। দূর থেকে দেখে জ্ঞান সঞ্চও করেননি, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও পরীক্ষা দিয়েই তিনি অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। বাস্তবিকই তিনি তাঁর প্রথম জীবনে অতি উৎসাহের সঙ্গে সাপুড়ে-পরিবারে মিশে সাপ ধরার কলা-কৌশল ইত্যাদি শিখেছিলেন এবং পরবর্তীকালে প্রকারান্তরে তিনি তা নিজেই স্বীকার করে গেছেন।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসখানিতেও তাই সর্প-প্রসঙ্গ বাদ পড়েনি। শ্রীকান্ত -ইন্দ্রনাথ গভীর রাতে যখন ডিঙি নিয়ে জেলেদের মাছ চুরি করে পালিয়ে আসে তখন ভুট্টাগাছে জড়ানো বিষধর সাপের কথা আছে।—"প্রায়ই দেখিতেছি, কাছাকাছি এক একটা জনার ভুট্টাগাছের ডগা ভয়ানক আন্দোলিত হইয়া 'ছপাৎ' করিয়া শব্দ হইতেছে। একটা প্রায় আমার হাতের কাছেই। সশঙ্কিত হইয়া সেদিকে ইন্দ্রের মনোযোগ আকৃষ্ট করিলাম। ধাড়ী শূয়ার না হইলেও বাচ্চা-টাচ্ছা নয় ত?

ইন্দ্র অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, ও কিছু না—সাপ জড়িয়ে আছে; তাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়চে।

কিছু না—সাপ! শিহরিয়া নৌকার মাঝখানে জড়সড় হইয়া বসিলাম। অস্ফুটে কহিলাম, কি সাপ, ভাই?

ইন্দ্র কহিল, সব রকম আছে। ঢোঁড়া, বোড়া, গোখরো, করেত—জলে ভেসে এসে গাছে জড়িয়ে আছে—কোথাও ডাঙা নেই দেখ্‌চিস্‌নে?

সে ত দেখচি। কিন্তু ভয়ে যে পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত আমার কাঁটা দিয়া রহিল। সে লোকটি কিন্তু ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না, নিজের কাজ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, কিন্তু কামড়ায় না, ওরা নিজেরাই ভয়ে মরচে —দুটো-তিনটে ত আমার গা-ঘেঁষে পালালো। এক একটা মস্ত বড়— সেগুলো বোড়া-টোড়া হবে বোধ হয়। আর কামড়ালেই বা কি ক'রব। মরতে একদিন ত হবেই ভাই!" (পৃঃ ২০-২১)

শঙ্খচূড়-জাতীয় কয়েকটি বড় আকারের বিষধর সাপ ব্যতীত অন্যান্য বহু

সাপই সাধারণতঃ মানুষকে এড়িয়ে চলে। তাদের গায়ে পা মাড়িয়ে দিলে অথবা ভীত হলেই তারা মানুষকে দংশন করে থাকে, নচেৎ সচরাচর পালিয়ে যায়। উপরের উদ্ধৃতিতে স্পষ্টতঃই জানা যাচ্ছে যে, ভুট্টা-ক্ষেতের মধ্যে তারা বিপদগ্রস্ত—চারিদিকেই কেবল জল; তাই ভুট্টা-জনার গাছের উপরই তারা আশ্রয় নিয়েছে। এক্ষেত্রে বিষধর সাপও সাধারণতঃ পালিয়ে যেতেই চায়। তবে ইন্দ্রনাথ সাহসী পুরুষ। জেলেদের হাত থেকে পালিয়ে যাবার তাড়া, উপরন্তু দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তকে যে কোন উপায়েই জেলেদের হাত থেকে বাঁচাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এছাড়া, অন্নদাদিদির বাড়িতে বড় অজগর সাপের কথাও আছে। "সুমুখে চাহিয়া দেখি—ওরে বাবা! একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রায় সমস্ত উঠান জুড়িয়া আছে। চক্ষের নিমেষে অস্ফুট চিৎকারে মুরগী-গুলোকে আরও ত্রস্ত-ভীত করিয়া দিয়া আঁচড়-পিঁচড় করিয়া একেবারে সেই বেড়ার উপর চড়িয়া বসিলাম। ইন্দ্র খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, ও কিছু বলে না রে, বড় ভাল মানুষ; ওর নাম রহিম। বলিয়া, কাছে গিয়া তাহার পেটটা ধরিয়া টানিয়া উঠানের ওধারে সরাইয়া দিল।" (পৃঃ ৪৬)

বলা বাহুল্য, সমস্ত সাপ পোষ মানে না, কিন্তু অজগর সাপ বহু সাপুড়ের কাছেই থাকে এবং তারা নির্জীব ভাবেই থাকে। কেবল কিছু খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া তারা সকল সময় সাপুড়েকে উত্যক্ত করে মারে না।

উপন্যাসে শাহজীকে সাপুড়ে হিসাবে দেখানো হয়েছে। ছেলেবেলা থেকেই শরৎচন্দ্র বহু সাপুড়ের কাছে যেতেন এবং সাপের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট হতেন। পরিণত বয়সেও এই কৌতূহল তাঁর দেখা দিয়েছিল। কোথাও কেউ সাপ ধরেছে অথবা সাপ খেলাচ্ছে জানতে পারলে শরৎচন্দ্র তাকে ডেকে পাঠাতেন এবং বেশি বকশিস দিয়ে তিনি তাঁর কাছ থেকে সাপ সম্বন্ধে নানান্ কথা জেনে নিতেন।

ছেলেবেলায় শরৎচন্দ্রকে একবার সাপে দংশন করেছিল। বহু কষ্টে সেবার তাঁর প্রাণ রক্ষা হয় এবং ইন্দ্রনাথ ওরফে রাজেন্দ্রনাথই সেবার তাঁর প্রাণ রক্ষা করার জন্য ওঝা ডাকতে ছুটেছিল। বাড়ির সকলে যখন দিশেহারা হয়ে কান্নাকাটি করছেন তখন বন্ধুর প্রাণ রক্ষা করতে রাজেন্দ্রনাথের তৎপরতার চিত্র সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎ-পরিচয়' গ্রন্থে তুলে ধরেছেন, "আজানুলম্বিত হাত দু'খানি নেড়ে রাজু মতিলালকে জিজ্ঞেস করলে—মায়াগঞ্জে আছে খুব ভালো রোজা—নিয়ে আসবো তাকে ডেকে?

—যাও তো। লক্ষ্মীটি আমার, কিসে যাবে? আমার ডিঙি আছে—যাবার সময় স্রোত পাব, আসার সময় পাল।

রাজু ঝড়ের মতোই এসেছিল, ঝড়ের মতোই বার হয়ে গেল।"

প্রাণ রক্ষা পাওয়ার পর থেকে শরৎচন্দ্রের সাপের ওপর আরও কৌতূহল বেড়েছে বই কমেনি। এর পর থেকেই সাপের ওপর তাঁর কেমন একটা রাগও জন্মায়। সাপ ধরা এবং মারা তাঁর কাছে একটা বড় কাজ হয়ে দাঁড়ায়। তাই সাপ ধরার কৌশল বইতে পড়ে বেলগাছের শিকড় নিয়ে বাড়ির পিছন দিকে ইটের গাদাতে গোখরো সাপের একটি বাচ্চার সন্ধান করে, শিকড়টি একটি লাঠির আগায় বেঁধে, যেই তার কাছে ধরলেন, তখনই সাপের বাচ্চাটি সেই শিকড়ের উপরই ছোবল মারতে লাগল। বইতে পড়ার বিদ্যায় শরৎচন্দ্রের ধারণা জন্মেছিল যে, বিষধর সাপ বেলগাছের শিকড়ের গন্ধে মাথা নুইয়ে ঝিমিয়ে পড়বে। তাই সর্প শিশুটিকে রাখার জন্য হাঁড়ি এবং সরারও ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু বইতে পড়া বিদ্যা যখন বাস্তবে কাজে লাগল না তখন অগত্যা লাঠির আঘাতেই সর্প-শিশুটির পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছিল। এই ঘটনাটি সুরেন্দনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক' গ্রন্থের ৩৮ পৃষ্ঠাতেও লিখেছেন।

ঠিক এমন একটি চিত্র শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসেও এঁকেছেন। ৪৮ পৃষ্ঠায় আছে,—

"সাপ খেলাবো দেখবি, শ্রীকান্ত?

তাহার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম—তুমি সাপ খেলাবে কি? কামড়ায় যদি?

ইন্দ্র উঠিয়া গিয়া ঘরে ঢুকিয়া ছোট ঝাঁপি এবং সাপুড়ের বাঁশি বাহির করিয়া আনিল এবং সুমুখে রাখিয়া ডালার বাঁধন আলগা করিয়া বাঁশিতে ফুঁ দিল। আমি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিলাম, ডালা খুলো না ভাই, ভেতরে যদি গোখরো সাপ থাকে! ইন্দ্র তাহার জবাব দেওয়াও আবশ্যক মনে করিল না; শুধু ইঙ্গিতে জানাইল যে, সে গোখরো সাপই খেলাইবে; এবং পরক্ষণেই মাথা নাড়াইয়া-নাড়াইয়া বাঁশী বাজাইয়া ডালাটা তুলিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাণ্ড গোখরো এক হাত উঁচু হইয়া ফণা বিস্তার করিয়া উঠিল এবং মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া ইন্দ্রের হাতের ডালায় একটা তীব্র ছোবল মারিয়া ঝাঁপি হইতে বাহির হইয়া পড়িল। বাপ্‌রে! বলিয়া ইন্দ্র উঠানে লাফাইয়া পড়িল। আমি বেড়ার গায়ে চড়িয়া বসিলাম। ক্রুদ্ধ সর্পরাজ বাঁশীর লাউয়ের উপর

আর একটা কামড় দিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া ঢুকিল। ইন্দ্র মুখ কালি করিয়া কহিল,—এটা একেবারে বুনো। আমি যাকে খেলাই, সে নয়।

ভয়ে, বিরক্তিতে, রাগে আমার প্রায় কান্না আসিতেছিল; বলিলাম, কেন এমন কাজ করলে? ও বেরিয়ে যদি শাহজীকে কামড়ায়?

ইন্দ্রের লজ্জার পরিসীমা ছিল না। কহিল, ঘরের আগড়টা টেনে দিয়ে আসব? কিন্তু যদি পাশেই লুকিয়ে থাকে?

আমি বললাম, তা হ'লে বেরিয়েই ওকে কামড়াবে।

ইন্দ্র নিরুপায়ভাবে এদিকে-ওদিকে চাহিয়া বলিল, কামড়াক্ ব্যাটাকে। বুনো সাপ ধরে রাখে—গাঁজাখোর শালার এতটুকু বুদ্ধি নেই।"

এ একেবারে বাস্তব ছবি। শরৎচন্দ্রের সর্প-বিষয়ক অভিজ্ঞতার নিখুঁত চিত্র। নতুন ধরা বিষধর সাপ নিস্তেজ হয়ে ডালার ভিতর পড়ে থাকে না। কিন্তু কিছুদিন সাপটিকে ডালার মধ্যে বন্ধ করে রাখলে সে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। শরৎচন্দ্রের ভাষাতেই বলি, "ধরা সাপ দুই চারি দিন হাঁড়িতে পুরিয়া রাখার পরে তাহার বিষদাঁত ভাঙাই হোক আর নাই হোক কিছুতেই কামড়াইতে চাহে না। চক্র তুলিয়া কামড়াইবার ভান করে, ভয় দেখায়, কিন্তু কামড়ায় না।"

এই উদ্ধৃতিটুকু শরৎচন্দ্রেরই লেখা 'বিলাসী' গল্প থেকে নেওয়া। গল্পটি লিখতে গিয়ে শরৎচন্দ্র কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, রচনাটি "জনৈক পল্লী বালকের ডায়েরি হইতে নকল। তার আসল নামটা কাহারও জানিবার প্রয়োজন নাই;—নিষেধও আছে। ডাকনামটা না হয় ধরুন, ন্যাড়া।" —এই ন্যাড়া নামটি কিন্তু আমাদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। ন্যাড়ার জীবনের কাহিনী মূলতঃ তরুণ শরৎচন্দ্রেরই জীবনের কোন এক সময়ের ঘটনা। তার আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায় দেবানন্দপুর নিবাসী দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সির একটি প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন, "শরৎচন্দ্রের 'বিলাসী' গল্পের মৃত্যুঞ্জয়ের চিত্রটিও অনেকাংশেই দেবানন্দপুরের ৺মৃত্যুঞ্জয় মজুমদারের কাহিনী হইতে গৃহীত।"

মৃত্যুঞ্জয় 'বিলাসী' গল্পের নায়কের নাম। সে সাপুড়ের মেয়ে বিলাসীকে 'নিকে' করে ঘরে তোলে এবং পরবর্তীকালে সাপুড়েদের মতই জীবন যাপন করে। ন্যাড়া অর্থাৎ শরৎচন্দ্র এই মৃত্যুঞ্জয়েরই সাকরেদ হয়ে তার কাছ থেকে 'সাপ-ধরার মন্ত্র' এবং 'হিসাব' অর্থাৎ কৌশল শিখতে থাকেন। ন্যাড়ার মুখ থেকেই আমরা জানতে পারি, "ছেলেবেলা হইতেই দুটো জিনিষের উপর আমার প্রবল সখ ছিল। এক ছিল গোখরো কেউটে সাপ

ধরিয়া পোষা, আর ছিল মন্ত্র-সিদ্ধ হওয়া।" শরৎচন্দ্রের জীবন-কথা পর্যালোচনা করেও আমরা দেখতে পাই ন্যাড়ার মত তাঁরও এই দু'টি শখ ছেলেবেলায় ছিল। এদিক দিয়েও প্রমাণ পাই, ন্যাড়াই শরৎচন্দ্র। এছাড়াও 'বিলাসী' গল্পের আরও একটি ছত্রে রয়েছে, "মশার কামড় আর সহ্য করিতে না পারিয়া সবেমাত্র সন্ন্যাসীগিরিতে ইস্তফা দিয়া ঘরে ফিরিয়াছি।" পাঠক স্মরণ করতে পারেন যে, 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসেও আনন্দ, রাজলক্ষ্মী এবং শ্রীকান্তের কথোপকথনের মধ্যে আমরা জানতে পারি যে, শ্রীকান্ত মশার কামড় সহ্য করতে না পেরেই সন্ন্যাস জীবন ত্যাগ করেছিল।

বিলাসী জাত-সাপুড়ের মেয়ে। সে জানত, সাপ ধরার মন্ত্র-তন্ত্র সবই মিথ্যা। এসব ফাঁকির কথা তার জানা ছিল বলেই, "বিলাসী মাঝে মাঝে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিত, ঠাকুর এসব ভয়ঙ্কর জানোয়ার, একটু সাবধানে নাড়া-চাড়া কোরো।" আমরা শেষ পর্যন্ত দেখলাম বিলাসীর স্বামী মৃত্যুঞ্জয়েরও করুণ পরিণতি ঘটল ঐ সর্প দংশনেই। তখন তন্ত্র-মন্ত্রে এবং শিকড়-মাদুলিতে কোন কাজই হল না।

সম্ভবতঃ, শরৎচন্দ্র এই সময়েই পাকা সাপুড়েব মত বিষধর সাপের বিষ দাঁত ভাঙতে এবং সাপের মুখ থেকে বিষ বার করতে শিখেছিলেন, পরিণত বয়সেও শরৎচন্দ্র নিজের হাতে বিষধর সাপ ধরেছেন বলে কেউ কেউ লিখে গেছেন।

'বিলাসী' গল্পটি থেকে আর একটি উদ্ধৃতির দ্বারাই প্রমাণিত হবে যে, শরৎচন্দ্রের সর্প-বিষয়ক অভিজ্ঞতা কতটা ব্যাপক ছিল। গল্পে আছে, "মাঝে মাঝে আমাদের গুরু-শিষ্যের সহিত বিলাসী তর্ক করিত। সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা হইতেছে শিকড় বিক্রি করা,—যা দেখাইবামাত্র সাপ পলাইতে পথ পায় না। কিন্তু তার পূর্বে সামান্য একটু কাজ করিতে হইত যে সাপটা শিকড় দেখিয়া পলাইবে, তাহার মুখে একটা লোহার শিক পুড়াইয়া বারকয়েক ছ্যাঁকা দিতে হয়। তার পরে তাহাকে শিকড়ই দেখান হোক আর একটা কাঠিই দেখান হোক, সে যে কোথায় পলাইবে ভাবিয়া পায় না। এই কাজটার বিরুদ্ধে বিলাসী ভয়ানক আপত্তি করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে বলিত, দেখ, এমন করিয়া মানুষ ঠকাইয়ো না।" অন্নদাদিদির মুখেও কি আমরা শেষ পর্যন্ত ঐ একই কথা শুনতে পাইনি? 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের মধ্যেও সাপের সম্পর্কে অনেক কুসংস্কারপূর্ণ কথাবার্তা আছে। ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তকে বলেছে, "কড়ি-চালা কখনও দেখেছিস্ শ্রীকান্ত? দু'টি কড়ি মন্তর পড়ে ছেড়ে দিলে

তারা উড়ে গিয়ে যেখানে সাপ আছে, তার কপালে গিয়ে কামড়ে ধরে সাপটাকে দশদিনের পথ থেকে টেনে এনে হাজির করে দেয়।” অন্যত্রও তাকে বলতে শুনি, “শাহজী গাঁজা-টাঁজা খান বটে শ্রীকান্ত, কিন্তু তিন দিনের বাসি মড়া আধ ঘণ্টার মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন—এত বড় ওস্তাদ উনি।” শাহজীকে ওস্তাদ সাপুড়ে ভেবেই ইন্দ্রনাথ প্রায়ই তাঁর কাছে ঘোরাঘুরি করত। সাপকে বশীভূত করার জন্য গাছের শিকড়, বিষ-পাথর, সাপ ধরার মন্ত্র প্রভৃতি শাহজীর কাছ থেকে পাবে এই আশায় সে অর্থ ব্যয় পর্যন্ত করেছে। শেষ পর্যন্ত শাহজীও সাপের কামড়েই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। অন্নদাদিদির মুখে বিলাসীর মতই শেষ পর্যন্ত শুনতে পেলাম, “আমাদের আগাগোড়া সমস্তই ফাঁকি।……আমরা মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই জানি নে, মড়াও বাঁচাতে পারি নে; কড়ি চেলে সাপ ধরে আনতেও পারিনে।” অন্নদাদিদির মুখ থেকে আমরা একথাও জানতে পারি, সাপ ধরাটা শুধু হাতের কৌশল, কোন মন্ত্রই সেখানে খাটতে পারে না।

এ শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতার মধ্যেই ছিল। গ্রাম্য পরিবেশে শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের এই অভিজ্ঞতা অবাস্তব তো নয়ই বরং পাঠকের কৌতূহলকে অতি মাত্রায় সচেতন করে তোলে। সাপ ধরা যে একটা কৌশল শরৎচন্দ্র সেটা ভাল রকমই জানতেন। ‘বিলাসী’ গল্পই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। মৃত্যুঞ্জয় নিঃশঙ্ক, জীবন তার কাছে তুচ্ছ। একদিন সাপ ধরতে গিয়েই এই দুঃসাহসী যুবক সর্প-দংশনে নিজের জীবন সাঙ্গ করল। তার বাপ-মায়ের দেওয়া নাম, শ্বশুরের মন্ত্রৌষধি সবই মিথ্যা প্রমাণিত হল। এর সাতদিন পর বিলাসীও আত্মহত্যা করল। গল্পটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু শাহজী-অন্নদাদিদিকেও এই গল্পতেই খুঁজে পাওয়া গেছে। বরং বলা যেতে পারে শাহজী এবং অন্নদাদিদির কাহিনী মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসী কাহিনীর পরিপূরক।

সর্প-দংশন করলে মন্ত্রের পরিবর্তে যে আধুনিক চিকিৎসার প্রয়োজন আছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে যখন শরৎচন্দ্রেরই ভৃত্য ননীকে সাপে কামড়েছিল। শরৎচন্দ্র বুঝেছিলেন যে বিষধর সাপেই কামড়েছে। ননীর জ্ঞাতিরা যথারীতি ওঝা ডাকাল এবং সাপে কামড়ানোর মন্ত্র আওড়াতে শুরু করল। শরৎচন্দ্র নিরুপায়; কারণ দেউলটি থেকে কলকাতায় যাবার ট্রেন ভোরবেলায়। শরৎচন্দ্র তাঁর দিদি অনিলা দেবীর সেজো দেওর পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুক্তি করে, পাঁচকড়ি বাবুর বড় ছেলে ব্রজদুর্লভ এবং ননীর দুজন আত্মীয়কে সঙ্গে দিয়ে, ননীকে পাল্কীতে চাপিয়ে দেউলটি স্টেশনে

পাঠিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু ননীকে বাঁচানো যায়নি, পথেই তার মৃত্যু ঘটে।

ননীর বাড়ি ছিল গোবিন্দপুরে, শরৎচন্দ্রের দিদির বাড়ির পাশেই। এই গোবিন্দপুরেই 'ভোগোডোম' অর্থাৎ ভগবান ডোম নামে এক ওঝা ছিল। শরৎচন্দ্র তাকে প্রায়ই বাড়িতে ডেকে আনতেন এবং বকশিস দিয়ে তার কাছ থেকে সাপ সম্পর্কে নানান্ তথ্য সংগ্রহ করতেন। তাঁর কাছে একটা পুরানো লাঠি ছিল, বৃদ্ধ বয়সে সেই লাঠি দেখিয়ে অনেককে বলতেন, "ঐ লাঠিটা দিয়ে আমি অনেক সাপ মেরেছি। সেজন্য ওটাকে ছাড়তে পারি না।"

আর আশ্চর্যের বিষয় যে, মানুষের কালশত্রু এই বিষধর সাপের উপরও শরৎচন্দ্রের কেমন একটা মমতা জন্মে গিয়েছিল। সামতাবেড়ের বাড়ির আশে-পাশে অনেক বিষধর সাপ ছিল; সেই সকল সাপগুলিকে তিনি মারতে চাইতেন না; এমন কি তারা যাতে বিরক্ত না হয় তার চেষ্টাও করতেন। কেউ যদি সেই সাপগুলিকে তাড়া করত তাদের তিনি নিষেধ করতেন।

মানুষের ভীষণ শত্রু সাপের উপরও শরৎচন্দ্রের দরদ ছিল এবং ছিল প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা। বাংলা সাহিত্যে সাপের কথা খুব কমই লেখা হয়েছে। শরৎচন্দ্রের পরবর্তী দুইজন সাহিত্যিক, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'বনফুল'—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের লেখায় কিছু সাপের কথা পাওয়া গেছে।

পশুপ্রীতি

……'a Christ-like all-embracing compassion'

The Journal of Arnold Bennett (1931)

জীব-জন্তুর প্রতি শরৎচন্দ্রের যে কি অপরিসীম মায়া মমতা ছিল সে প্রসঙ্গে প্রথমেই নরেন্দ্র দেবের লেখা একটি অংশ তুলে ধরছি—

বালীগঞ্জে তাঁর (শরৎচন্দ্রের) নূতন বাড়ী তৈরি হবার কিছুদিন পরে তিনি একখানি মোটর গাড়ী কিনেছিলেন। তাঁর ড্রাইভারের নাম ছিল কালী। কালী ছিল এক গোঁয়ার গোবিন্দ হুঁদে জোয়ান। কিন্তু শরৎচন্দ্রের অমায়িক ব্যবহারে এই দুর্দান্ত কালী হয়ে উঠেছিল তাঁর একান্ত ভক্ত

গোলাম! তাকে যেদিন শরৎচন্দ্র তাঁর রথের সারথীরূপে নিযুক্ত করেন সেদিন এই কথাটি বলে দিয়েছিলেন যে, আমি যতদিন বাঁচবো কালী তোমার কোন অভাব রাখবো না; কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলে রাখি—যেদিন তুমি গাড়ী চালাতে গিয়ে পথে কোনও মানুষ কেন একটা কুকুর, বিড়াল বা হাঁস-মুর্গীও চাপা দেবে সেইদিনই তৎক্ষণাৎ তোমার চাকরি যাবে। আমার এই কথাটা মনে রেখো। (১)

এতেই বুঝে নেওয়া উচিত শরৎচন্দ্র কত কোমল-হৃদয় দরদী মানুষ ছিলেন। সত্যই, পশুপ্রীতি তাঁর চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই, 'বাটু' নামে একটি পাখি, 'স্বামীজী' নামে একটি খাসি ও 'বাঘা' ও 'ভেলু' নামে দু'টি কুকুর তাঁর জীবনের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর এই পশুপ্রীতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বাজেশিবপুরে বসবাস-কালীন 'ভেলু' নামে এবং সামতাবেড়ে 'বাঘা' নামে একটি করে কুকুর পুষেছিলেন। এদের তিনি প্রাণাধিক ভালবাসতেন। ৭ই ভাদ্র '২৬, বাজে শিবপুর থেকে লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে আছে, 'তোমার বড় ছেলেটি ভাল হয়েচে ত'? ছোটটি? আমি ছেলেপিলে ভারি ভালবাসি।...এখন আমার ছেলে হচ্ছে আমার 'ভেলু' কুকুরটি, একে সবাই চেনে,—সবাই জানে কুকুরটিই শরৎবাবুর প্রাণাধিক প্রিয়।' শরৎচন্দ্র হাস্য পরিহাসের মধ্যে ও বৈঠকী গল্প করার সময়েও কুকুরের প্রতি তাঁর দুর্বলতার কথা প্রায়ই বলতেন। তাঁর 'দেওঘর স্মৃতি'তে কুকুরের প্রতি তাঁর অসীম মমতার কথা অত্যন্ত করুণরূপে চিত্রিত হয়েছে। শুধু কুকুরই নয়, ছাগল, গরু, পাখি প্রভৃতি মূক জীবজন্তুর প্রতিও তাঁর অসীম মমত্ববোধ ছিল। তিনি সি. এস. পি. সি. এ-র হাওড়া শাখায় কিছুকাল সভাপতি ছিলেন। শরৎচন্দ্রের এমন পশুপ্রীতির প্রকাশ 'শ্রীকান্তে'ও ঘটেছে।

মৃত্যুর আট-নয় মাস পূর্বে, ১৩৪৪ সালের বৈশাখ মাসে শরৎচন্দ্র স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দেওঘর বেড়াতে গিয়ে অতিথ নামে এক বেওয়ারিশ কুকুরকে কেমন ভালবেসেছিলেন তার একটি করুণ চিত্র তাঁর 'দেওঘর স্মৃতি'তে ফুটে উঠেছে। এই লেখাটির প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্ব লেখা হয়েছে। কিন্তু পাঁচ বৎসর পূর্বেও যেন ঐ একই 'অতিথ'কেই আমরা খুঁজে পেয়েছি। তাই উপন্যাসের এই অংশটুকু পাঠকের কাছে সংক্ষেপে তুলে ধরছি। শরৎচন্দ্রের নিঃস্ব, রিক্ত, শূণ্য, ভবঘুরে জীবনের একটা বিরাট নৈরাশ্যের, দারুণ বেদনার কথা যেন মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে, এই অংশটুকুতে। একটা

দারুণ বিচ্ছেদ, শূণ্যতাবোধ যেন হাহাকার করে উঠেছে, প্রাণের সত্য ফুটে উঠেছে। ব্যক্তিগত অনুভূতি বিশ্বগত অনুভূতির আকার লাভ করেছে।

"কুড়ি পঁচিশ বর্ষ পূর্বের কত কথাই মনে পড়িল। কঞ্চির বেড়া দিয়া ঘেরা নিকানো-মুছানো যশোদার উঠান, আর সেই ছোট ঘরখানি। সে আজ এই হইয়াছে ; কিন্তু এর চেয়েও ঢের বড় করুণ বস্তু তখনও দেখার বাকি ছিল। অকস্মাৎ চোখে পড়িল সেই ঘরের মধ্য হইতে ভাঙা চালের নীচে দিয়া গুঁড়ি মারিয়া একটা কঙ্কালসার কুকুর বাহির হইয়া আসিল। আমার পায়ের শব্দে চকিত হইয়া সে বোধ করি অনধিকার প্রবেশের প্রতিবাদ করিতে চায় ; কিন্তু কণ্ঠ এত ক্ষীণ যে, সে তাহার মুখেই বাধিয়া রহিল।

বলিলাম, কি রে, কোন অপরাধ করি নি ত ? সে আমার মুখের পানে চাহিয়া কি ভাবিয়া জানি না এবার ল্যাজ নাড়িতে লাগিল।

বলিলাম, আজও তুই এখানেই আছিস ?

প্রত্যুত্তরে সে শুধু মলিন চোখ দুটো মেলিয়া অত্যন্ত নিরুপায়ের মতো আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

এ যে যশোদার কুকুর তাহাতে সন্দেহ নাই। ফুলকাটা রাঙা পাড়ের সেলাই করা বগ্‌লস এখনো তাহার গলায়। নিঃসন্তান রমণীর একান্ত স্নেহের ধন এই কুকুরটি একাকী এই পরিত্যক্ত কুটিরের মধ্যে কি খাইয়া যে আজও বাঁচিয়া আছে ভাবিয়া পাইলাম না। পাড়ায় ঢুকিয়া কাড়িয়া কুড়িয়া খাওয়ার ইহার জোরও নাই, স্বজাতির সঙ্গে ভাব করিয়া লইবার শিক্ষাও এ পায় নাই —অনশনে অর্দ্ধাশনে এইখানে পড়িয়াই এ বেচারা বোধ হয় তাহারই পথ চাহিয়া আছে যে তাহাকে একদিন ভালোবাসিত। হয়ত ভাবে, কোথাও না কোথাও গিয়াছে, ফিরিয়া একদিন সে আসিবেই। মনে মনে বলিলাম, এই কি এমনি ? এ প্রত্যাশা নিঃশেষে মুছিয়া ফেলা সংসারে এতই কি সহজ ?

সেই কুকুরটা একটুখানি সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া থামিল। যতক্ষণ দেখা গেল দেখিলাম সে-বেচারা এই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সহিত পরিচয়ও এই প্রথম, শেষও এইখানে, তবু আগু বাড়াইয়া বিদায় দিতে আসিয়াছে। আমি চলিয়াছি কোন্ বন্ধুহীন, লক্ষ্যহীন প্রবাসে, আর সে ফিরিবে তাহার অন্ধকার নিরালা ভাঙা ঘরে। এ সংসারে পথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে উভয়েরই কেহ নাই।

বাগানটার শেষে সে চোখের আড়ালে পড়িল, কিন্তু মিনিট পাঁচেকের এই অভাগা সঙ্গীর জন্য বুকের ভিতরটা হঠাৎ হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, চোখের

জল আর সামলাইতে পারি না এমনি দশা।"

হৃদয় নিঙড়ানো কথা। পাঠকেরও চোখের জল এখানে বাঁধ মানে না। এ শ্রীকান্তের চোখের জল, না লেখকের চোখের জল! ঐ যে বুকের ভেতরটা হু হু করে কেঁদে উঠল ঐ কান্নার জন্য ঘটনাটি উদ্ভাবিত হয়নি, ঘটনাটি ঘটেছিল বলেই এমন কান্না সম্ভব হয়েছে। শরৎচন্দ্রের একান্ত ব্যক্তিগত বেদনা ক্ষতমুখে শোণিতের মত অনিবার্যবেগে নির্গত হয়েছে। "এ সংসারে পথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে উভয়েরই কেহ নাই"—এ ক্রন্দন নিঃসঙ্গ আত্মার নিরুদ্দিষ্ট আর্তরব।

শরৎচন্দ্রর অতি প্রিয় কুকুর ভেলুর মৃত্যুতে তাই সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে (২৮. ৪. ২৫ তিনি লিখতে পেরেছিলেন, "...সাত দিন সাত রাত খাইনি ঘুমুইনি—তবুও পরের বৃহস্পতিবার ভোর ৬টার সময় তার প্রাণ বার হয়ে গেল। শেষ দিন বড় যন্ত্রণা পেয়েই সে গেছে।

বুধবারে জোর করে কড়া ওষুধ খাওয়াবার চেষ্টা করি, চাম্‌চে দিয়ে মুখে গুঁজে দেবার অনেক চেষ্টা ক'রেও ওষুধ তার পেটে গেল না; কিন্তু রাগের ওপর আমাকে কামড়ালে। সেদিন সমস্ত রাত আমার গলার কাছে মুখ রেখে কি তার কান্না। ভোরবেলায় সে কান্না তার থামলো।

আমার ২৪ ঘণ্টার সঙ্গী, কেবল এ দুনিয়ায় আমাকেই সে চিনেছিল। যখন কামড়ালে এবং সবাই ভয় পেলে তখন রবিবাবুর এই কথাটাই শুধু মনে হতে লাগলো—তোমার প্রেমে আঘাত আছে নাইক অবহেলা! তার আঘাত ছিল, কিন্তু অবহেলা ছিল না। এর পূর্বে এত ব্যথা আমি আর পাইনি।"

এমন কথা এই মানুষটির পক্ষেই লেখা সম্ভব। এ হৃদয়ের সামগ্রী; কোন দিনই এর আবেদন ব্যর্থ হবার নয়। শুধু মানুষই নয়, জীবজন্তুর প্রতিও তাঁর কী অসীম মমতা! শরৎচন্দ্রের এই সারমেয়-প্রীতি আমাদের বিশেষ করে স্মরণে এনে দেয় Sir Isaac Newtonকে, যিনি তাঁর পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও বিশ বৎসরের পরিশ্রমের বস্তু (manuscript) হারিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় কুকুর Diamond-এর সামান্য ভুলের জন্য। নিউটন এই মূক প্রাণীর উপর করুণা প্রদর্শন করেছিলেন, যদিও তাঁর হৃদয় ভেঙ্গে পড়েছিল।

'O Diamond, Diamond,' exclaimed he, 'though little knowest the mischief thou hast done!'

This incident affected his health and spirits for some time afterwards; but, from his conduct towards the little

dog, you may judge what was the sweetness of his temper. (২) শরৎচন্দ্রের পশুপ্রীতিও ঠিক এমনটি ছিল না কী? আর এই জন্যই. তিনি পশু সম্বন্ধে বলতে পারতেন, 'মানুষের সবচেয়ে বড় শিক্ষাদীক্ষা জীবজন্তু থেকেই। এতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।' পশুপ্রীতি তাই শরৎ-জীবনের একটি দিক। তাঁর সৃষ্টির বহুস্থানেই এই পশুপ্রীতির নিদর্শন আছে। তাঁর হৃদয়ের কোমলতা ও কারুণ্য মানুষকে অতিক্রম করে মনুষ্যেতর প্রাণীকেও অনুরাগে আলিঙ্গন জানিয়েছিল। তাই দিলীপকুমার রায়ের কথা আজ বিশেষ করে মনে পড়ে, 'কর্ণের কবচ-কুণ্ডলের মতনই প্রেম, এ দরদ ছিল শরৎচন্দ্রের সহজাত।'

উৎস নির্দেশ

(১) শরৎ-স্মৃতি—বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত। পৃঃ ২৭৫

(২) Adopted from The Complete works of Nathaniel Hawthorne. Vol, XII.

চিকিৎসক

> **Next to love, sympathy is the divinest passion of the human heart.' —Burke**

শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত চরিত্রটি নিষ্ক্রিয় পৌরুষের প্রতীকরূপে, স্থানু নায়করূপে কম সমালোচিত হয়নি। কিন্তু একথা ঠিক শ্রীকান্তের জীবনরূপের উদারতা ছিল, ছিল বিশাল বিশ্বের সঙ্গে তার অন্তরের যোগ আর সীমাহীন মানবিক সহানুভূতি। ঠিক যে গুণটি শরৎচন্দ্রেরও ছিল। শরৎচন্দ্রের মানবিক সহানুভূতি ও আপন ব্যক্তিত্বের আলোয় অন্যকে আলোকিত করবার যে ক্ষমতা ছিল তা শ্রীকান্ত চরিত্রেও আরোপিত। প্রেমের ক্ষেত্রে শ্রীকান্তের এই নিষ্ক্রিয়তা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কর্মের ক্ষেত্রে সে প্রয়োজনে সক্রিয়তাও বহু স্থানে দেখিয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে (তৃতীয় পর্বে) সতীশ ভরদ্বাজের কলেরা উপলক্ষে গিয়ে শ্রীকান্ত কলেরা মহামারীর সঙ্গে সামান্য চিকিৎসা-জ্ঞান ও উপকরণ নিয়ে প্রকৃত বীরের মতই যুদ্ধ করেছে।

শ্রীকান্তের মানবিকতা এখানে তুলনাহীন। এখানে হুবহু শরৎচন্দ্রের দরদী মনের প্রভাব পড়েছে শ্রীকান্তের মধ্যে।

শরৎচন্দ্রও চিকিৎসা করতেন। কোন পাশ করা চিকিৎসক নন। সাধারণ দরিদ্র মানুষদের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করার জন্য হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা। অভাব ও দারিদ্রের যন্ত্রণাকে শরৎচন্দ্র বহু দিন ধরে আপন জীবনের মধ্যে নিবিড় ভাবে লাভ করেছিলেন বলেই হয়ত তিনি দেশের দরিদ্র ও অতি সাধারণ মানুষদের এমনি একজন প্রকৃত দরদীবন্ধু হতে পেরেছিলেন।

শরৎচন্দ্র বহু কালই দরিদ্র বস্তিবাসীদের মধ্যে কাটিয়েছেন। বস্তিবাসীদের অনেকেরই অসুখ করলে ডাক্তার ডাকার ক্ষমতা থাকত না। শরৎচন্দ্র সেইজন্য হোমিওপ্যাথি বই কিনে চিকিৎসা বিদ্যা শুরু করেছিলেন। রেঙ্গুনে অবস্থান কালেই এই বিদ্যা শিক্ষা করেন। এই চিকিৎসা কেবল মানুষের উপরই নয়, পশুপক্ষীও শরচন্দ্রের চিকিৎসা থেকে বাদ পড়ত না। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথাও অবশ্যই স্মরণীয়। তিনিও হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা নিজে হাতে করেছিলেন।

তৃতীয় পর্বের ৪২৭ থেকে ৪৩৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কলেরা রোগ এবং শ্রীকান্তের সেবা-যত্নের কথা আছে। শরৎচন্দ্র এক স্থানে লিখেছেন,—'পথে এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ। বাল্যকালের পরিচয়, অতএব বাল্যবন্ধু ত বটেই; তবে বছর পনের খবরাখবর ছিল না, হঠাৎ চিনিতে পারি নাই; কিন্তু দিন-দুয়ের মধ্যেই অকস্মাৎ এ কি ঘোরতর মাখামাখি! তাহার কলেরায় চিকিৎসার ভার, শুশ্রূষার ভার, মায় তার শ-দেড়েক মাটি-কাটা কুলির খবরদারির ভার গিয়া পড়িল আমার উপর।' সতীশ ভরদ্বাজকে বাঁচানো যায়নি। অন্যত্র আছে, 'রাত্রি দুটাই হইবে কি তিনটাই হইবে খবর আসিল জন-দুই কুলির ভেদ-বমি হইতেছে। তাহারা আমাকে ডাক্তারবাবু বলিয়া মনে করিয়াছিল। তাহাদেরই আলোর সাহায্যে ঔষধপত্র লইয়া কুলি লাইনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মালগাড়ীতে তাহারা থাকে। ....আমার সবচেয়ে মুস্কিল হইয়াছিল সঙ্গে টাকা ছিল না। নিজে ত কাল হইতে উপবাসে আছি। নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই, কিন্তু সে না হয় হইল, কিন্তু জল না খাইয়া বাঁচি কিরূপে? সুমুখের খাদের জল ব্যবহার করিতে সকলকেই নিষেধ করিয়া দিলাম, কেহই কথা শুনিল না। মেয়েরা মৃদু হাস্যে জানাইল, এছাড়া জল আর আছে কোথায় ডাক্তার? কিছুদূরে গ্রামের মধ্যে জল ছিল, কিন্তু যায় কে? তাহারা মরিতে পারে, কিন্তু বিনা পয়সায় এই ব্যর্থ কাজ

করিতে রাজী নয়।

এমনি করিয়া ইহাদের সঙ্গে এই ট্রাকের উপরেই আমাকে দিন দুই তিন বাস করিতে হইল। কাহাকেও বাঁচাইতে পারিলাম না, সব কয়টাই মরিল।'

এহেন অবস্থায় এই দরিদ্র অসহায় কুলীশ্রেণীর মানুষদের চিকিৎসা এবং সেবা-শুশ্রূষা করায় কোন ফলই হতে পারে না। এরা অশিক্ষিত, সর্বোপরি দরিদ্র; তাই স্থানে স্থানে শ্রীকান্তরূপী শরৎচন্দ্রের ক্ষোভ এবং দুঃখ দুই-ই প্রচণ্ডভাবে দেখা দিয়েছে। তার যে কিরূপ প্রকাশ ঘটেছে তার দু-একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে—'মানুষের মরণ আমাকে বড় আঘাত করে না, করে মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে।'

'শুধু মাটি-কাটা, শুধু মজুরি। সভ্য মানুষে এ কথা বোধ হয় ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছে, মানুষকে পশু করিয়া না লইতে পারিলে পশুর কাজ আদায় করা যায় না।'

'সম্মুখে কালো আকাশের অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া সপ্তর্ষিমণ্ডল জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে, সেদিকে চাহিয়া আমি বেদনায়, ক্ষোভে ও নিষ্ফল আক্ষেপে বার বার করিয়া অভিসম্পাত করিতে লাগিলাম, আধুনিক সভ্যতার বাহন তোরা—তোরা মর; কিন্তু যে নির্মম সভ্যতা তোদের এমনধারা করিয়াছে তাহাকে তোরা কিছুতেই ক্ষমা করিস্ না। যদি বহিতেই হয়, ইহাকে তোরা দ্রুতবেগে রসাতলে বহিয়া নিয়া যা।'

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসেও পাড়ার গরীব দুঃখীদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতেন। শুধু চিকিৎসাই নয়, প্রয়োজনে পথ্যও দিয়ে আসতেন। দু'টি চিঠির অংশ উদ্ধৃত করছি, শরৎচন্দ্রেরই লেখা, একটি লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে, অপরটি উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা। সাহিত্য-শিষ্যা লীলারানীকে লিখেছিলেন, ……'তাদের (দিদি অনিলা দেবীর) দেশে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বর বড্ড বেশী, গরীব দুঃখীরা মরছেও মন্দ না। ওষুধের বাক্স নিয়ে গিয়েছিলাম, নিজে গোটা দুই মাত্র মারিতে পারিয়াছি—আরও কিছুদিন থাকিতে পারিলে আরও কোন্ না গোটা দুই তিন শিকার মিলিত! দুর্ভাগ্য—কাবু হইয়া পড়িলাম (ওষুধ ও বিশেষ করিয়া পথ্যের অভাবেই,—তোমাদের ভগবানের শ্রীচরণে তাদের দ্রুত আশ্রয় মিলিতেছে)। তবু ফিরিয়া আসিয়াছিলাম আর কিছু ওষুধ ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে, কিন্তু মনে হইতেছে কাল সকাল নাগাদ নিজের জ্বরটাই বেশ সুস্পষ্ট হইতে পারিবে। আজকের দিনটা কোনমতে চাপা আছে। আর এমনি চাপাই থাকে ত পরশু আবার যাইব।'

এই ভদ্রমহিলারই স্বামী সরোজকুমারকে লেখা একটি চিঠির কিছু অংশে জানা যাচ্ছে চিকিৎসা-শাস্ত্রে শরৎচন্দ্রের ব্যুৎপত্তির কথা: 'You have not written much about your wife, but I am afraid I have gathered more about her than you suppose. Oedma i. e. swelling of feet and hand and passing of more urine during night than normal, indicate presence of albumen in urine. It might be Diabetes Insipidus, it might be something more serious. But one thing is quite certain that it is not due to cold season as you have imagined.'

উমাপ্রসাদকে লিখেছেন, '......এই মাত্র একজন নৌকার মাঝির চিকিৎসা ক'রে এলাম। সর্বাঙ্গে 'টিন্‌চার আয়োডিন্‌' মাখিয়ে 'আরনিকা' খাবার ব্যবস্থা ক'রে, তাপ সেঁকের বন্দোবস্ত করে দিয়ে ফিরছি। কাল রাত্রে তার নৌকো ডুবে, তার ওপর দিয়ে নৌকো ভেসে গিয়েছিল।'

এই চিকিৎসার কথা অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎচন্দ্রের সঙ্গে' গ্রন্থেও লিখেছেন, 'দরিদ্র স্ত্রীলোকদের প্রতি তাঁর দয়া ছিল অসীম। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের তিনি গোপনে অনেক দান করতেন। একদিন সকালে তাঁতে-আমাতে বোসে গল্প কবছি, একটি বিধবা স্ত্রীলোক এসে দরজার পাশে দাঁড়ালেন। শরৎচন্দ্র তাঁর দিকে একটিবার চেয়ে দেখে বললেন—"মাস কাবারের এখনো ত পাঁচ-সাত দিন দেরী আছে।" বিধবাটি যেন একটু সলজ্জভাবে বল্লেন—"হ্যাঁ বাবা, তা আছে। মেয়েটির হঠাৎ জ্বর আর আমাশা হোয়েছিল, রক্ত-আমাশা কিছুতেই সারে না, তাই ডাক্তারের কাছ থেকে..."

"আজ, দুটো টাকা আমি দিচ্ছি—শুক্র-শনিবার নাগাদ আপনি আসবেন। মেয়ের অসুখ কোরেছিল, আমার কাছে আসেননি কেন? হোমিওপ্যাথী ওষুধ দিতাম, সেরে যেত।"

শরৎচন্দ্র সম্ভবতঃ হোমিওপ্যাথীটা খুব পছন্দ করতেন। দু' একবার তাঁকে বলতে শুনেছি—"হোমিওপ্যাথী হোল আসল শাস্ত্র, য়্যালোপ্যাথীতে রোগ সারে নাকি?"

ঠিক বলতে পারি না, তবে আমার মনে হয়, ছোট-খাটো রোগ সম্বন্ধে প্রথমটা তিনি হোমিওপ্যাথী ওষুধ ব্যবহার করতেন কিন্তু তাতে সব সময় হয়ত ফল পেতেন না; তখন য়্যালোপ্যাথীর আশ্রয় নিতেন। তবে হোমিওপ্যাথীর

প্রতি তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল।' (পৃঃ-৩)

সুতরাং সতীশ ভরদ্বাজের কর্মক্ষেত্রে শ্রীকান্তকে যে সেবক, শুশ্রূষাকারী, সর্বোপরি চিকিৎসক হিসাবে আমরা দেখেছি তা যে শরৎচন্দ্রেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার চিত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হোমিওপ্যাথ ডাক্তার হিসাবে তাঁর 'বামুনের মেয়ে'র প্রিয়লাল মুখুজ্যে তাই একটি স্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে।

হাস্যরসিক

'True humour springs not more from the head than from the heart.' —Carlyle

'হাস্যরস' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক। অনেকেই অসঙ্গতিকে হাস্যরসের মূল বলে মনে করেছেন। সাহিত্যিকগণ Wit, Satire, Irony, Fun, Humour, Sarcasm প্রভৃতির সাহায্যে হাস্যরস সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন। Wit হল বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস, যার উৎপত্তি মস্তক থেকে। লেখক যখন দুটি নিঃসম্পর্কিত বস্তুর মধ্যে সহসা কোন সাদৃশ্য আবিষ্কার করে শব্দের সাহায্যে তা প্রকাশ করেন, তা Wit (দীপ্তিহাস্য)। এই জাতীয় হাস্যরসে সূক্ষ্মতা আছে, কিন্তু এর স্থায়িত্ব ক্ষণিকের। Wit সম্পর্কে বলা হয়—'Wit is nothing but a free play of ideas.' Satire ব্যঙ্গ-হাস্য, স্পষ্ট বিদ্রূপ। বস্তুত উপরিতলের হাস্যরসের কেন্দ্রে এক পরম বেদনার উৎসকে অবারিত করে দেয়। বেদনাকে হাসির আবরণে ধারণ করাই Satire-জাতীয় হাস্যরসের মুখ্য উদ্দেশ্য। Wit বা Satire এর মত Irony ও হাস্যরসের একটি শাখা। ইংরেজী সাহিত্যে এ বিষয়ে Dean Swift এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাম। Irony-তে লেখক প্রত্যক্ষের চাইতে পরোক্ষ অর্থটিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। Irony চাপা বিদ্রূপ। Fun বা কৌতুক অধিকাংশ স্থলে গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট হতে পারে। লেখক যখন আত্মবিস্মৃত হয়ে লঘু কৌতুক সঞ্চার করেন তখন তিনি Fun সৃষ্টি করেন। এবং Sarcasm (টিট্‌কারী বা তীক্ষ্ণ-হাস্য) ঈষৎ বক্রভঙ্গিযুক্ত বিদ্রূপ। Satire, Irony, এবং Sarcasm-এর মধ্যে

পার্থক্য হল, Satire-এ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সুস্পষ্ট, Irony-তে ব্যঙ্গ কিছুটা কোমল; বিদ্রূপ কিছুটা প্রচ্ছন্ন। Sarcasm বা বক্রোক্তি সুকঠোর এবং প্রধানতঃ বাক্-চাতুর্যের উপর নির্ভরশীল। আর, Humour অনাবিল হাস্যরস। এই হাস্যরসের উৎস হৃদয়। এই ভাবহীন হাস্যরস জীবনের নানা অসঙ্গতিতে নির্ভর করে গড়ে ওঠে।

শরৎচন্দ্রের হাস্যরস এই Humour-জাতীয়। Humour-রচনা জীবন সম্পর্কে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা না থাকলে হয় না। জীবনের একটা স্বাভাবিক লক্ষণ ও গতি আছে। যখন কোন কারণে সেই স্বাভাবিকতা নষ্ট হয় তখনই Humour-জাতীয় হাস্যরসেব সৃষ্টি। এই জাতীয় হাস্যরস সৃষ্টিতে বাংলা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্র উল্লেখ্য। জীবনের ছোটখাটো অসঙ্গতি লেখকের পর্যবেক্ষণ-নৈপুণ্যে এক অনাবিল স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরসের ধারা অবারিত করেছে।

বঙ্কিম-যুগ অবসানের পরই এলেন রবীন্দ্রনাথ, সাথে সাথে শরৎচন্দ্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে যতটা পরিমাণ Humour আছে, শরৎচন্দ্রে তা নেই। শরৎচন্দ্র যে মাত্রায় Sentimental, তাতে খাঁটি Humour তাঁর পক্ষে অসম্ভব। জগৎ ও জীবনের প্রতি শরৎচন্দ্রের humourist-এর দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও তিনি হাস্যরসের স্রষ্টা নন।

শরৎচন্দ্রের হাস্যরস নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে হয় যে, যদিও তিনি ঘরোয়া ও প্রসন্ন মেজাজের মানুষ ছিলেন, তবু তাঁর লেখায় কৌতুক হাস্য বা মুক্ত হাস্যের চেয়ে ব্যঙ্গ বা বক্র হাস্য উজ্জ্বলতর রূপে ফুটে উঠেছে। দুর্নীতি ও হীনতার বিরুদ্ধে তাঁকে বার বার রুখে দাঁড়াতে হয়েছে বলে ব্যঙ্গের আশ্রয়ে অন্যায়কারীর মুখোস খুলে দেবার দিকে তাঁর একটা ঝোঁক ছিল। হাস্যরস সৃষ্টিতে তিনি যে যথেষ্ট বুদ্ধির আশ্রয় নিতেন না, তা নয়; নির্মল কৌতুক হাস্য যে নেই, তা-ও নয়, সেক্ষেত্রে হাস্যরসিক হিসাবে তাঁর মর্যাদাও রসিক পাঠক সমাজে কম নয়। তাঁর বহু উপন্যাসে ও গল্পে কারুণ্যের ও মহত্ত্বের প্রশান্ত প্রবাহের তলে তলে বয়ে চলেছে একটি স্নিগ্ধ হাসির রসধারা।

কথালাপেও শরৎচন্দ্র অপরূপ রসিকতায় সকলের মনোহরণ করতেন। তাঁর সঙ্গে যাঁরাই মিশেছেন তাঁরাই বলেছেন, রঙ্গে-ব্যঙ্গে-রসিকতায় ও হাস্য-পরিহাসে বা মজলিসী ও বৈঠকী গল্পে ঐ কৃষ্ণকায়, শীর্ণ ব্যক্তিটি ছিলেন একজন উঁচুদরের আর্টিস্ট। তাঁর লেখার চেয়েও গল্প বলার বা রসিকতা করার কায়দা ছিল আরও মনোহর। তাঁর সম্পর্কে যে সকল বৈঠকী গল্প প্রচলিত আছে,

সেগুলিতে শরৎচন্দ্রের হাস্য-রসিক রূপটি সহজেই চোখে পড়ে, এমন কি তাঁর চিঠিপত্রেও এই রসিক মানুষটির সন্ধান দুষ্প্রাপ্য নয়। অবশ্য ব্যক্তি-জীবনে হাস্যরসিক না হলে সাহিত্যে হাস্যরস তেমন জমতে পারে না। কিন্তু তবুও আমরা জানি, তিনি সাহিত্যে হাস্যরসিক হিসাবে তেমন পরিচয় রাখেননি যতটা ব্যক্তি-জীবনে—বৈঠকী গল্পে বা কথালাপে—রেখেছেন। অবশ্য শরৎচন্দ্র যেমন ভাবে গল্প বলতেন অনেকটা ঠিক তেমন ভাবেই গল্প লিখতে পারতেন।

জীবনের অভিজ্ঞতা যাঁর ব্যাপক তিনি হাসির গল্প বলবেন, রসিকতা করবেন ঠিকই। কিন্তু সাহিত্যে হাস্যরসের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র ব্যয় সঙ্কোচ নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ডঃ অজিত দত্ত শরৎচন্দ্রের হাস্যরস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আক্ষেপের স্বরে তাই বলেছেন, 'শরৎচন্দ্রের পরিহাসনিপুণ বৈঠকী আলাপ অনেকেই শুনেছেন। তাঁর হাস্যরসবোধের পরিচয় সে আলাপে সুপরিস্ফুট হলেও, তাঁর রচনায় প্রকৃত হাস্যরসের সন্ধান খুব অল্পই মেলে। শরৎচন্দ্রের রচনার হাস্যরস বলতে গেলে শ্রীকান্তে সীমাবদ্ধ।'

বাস্তবিক, 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটি শরৎ-সাহিত্যের নিয়মের একটি ব্যতিক্রম। আত্মকথা বলতে গিয়ে ফেলে আসা দিনগুলির কথা মনে পড়েছে। পুরানো দিনগুলির ঘটনাগুলিকে শিল্পী শরৎচন্দ্র যখন বিশ্লেষণ করতে বসেছেন তখন সমস্ত বেদনাগুলিকে চাপা দিয়ে নিরাসক্ত মনে আলোকোজ্জ্বল মুহূর্তগুলিকে স্মরণ করেছেন অথবা জীবনের ঘাটতিগুলোকে স্বাভাবিক উদারতা দিয়ে ভরিয়ে তুলেছেন। তাই শ্রীকান্তে **Wit** কিংবা **Satire**-এর তীক্ষ্ণধার হাস্যতরঙ্গ না থেকে নিখাদ নিটোল **Humour** প্রশ্রয় পেয়েছে বেশী।

এই উপন্যাসটিতে হাস্যরস সৃষ্টির জন্য লেখককে ভিন্ন করে আখ্যান ভাগ বিন্যাস করতে হয়নি। গল্প বলতে বলতে প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। মাঝে মাঝে মুক্ত হাসির বা নির্মল হাস্যরসের যোজনা করেছেন। প্রথম পর্বে শ্রীকান্তের দত্তদের বাড়ি কালীপূজা উপলক্ষে মেঘনাদ বধ থিয়েটার দেখা এমনি একটি কাহিনী তা 'অভিনয়' অংশেই কিছুটা আলোচনা করেছি। মেঘনাদের কোমরবন্ধ ছিঁড়ে গেছে, বাঁ হাতের ধনুক ফেলে দিয়ে পেণ্টুলানের মুঠ চেপে ধরে শুধু ডান হাতে তীর ঘুরিয়ে মেঘনাদ লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়েছে। 'ধন্য বীর! ধন্য বীরত্ব!........অবশেষে তাহাতেই জিৎ। বিপক্ষকে সে যাত্রা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইল।' এ দৃশ্য সত্যই হাস্যকর এবং বাহাদুর মেঘনাদের সম্বন্ধে লেখক সংক্ষেপে যে বর্ণনা দিয়েছেন সকলের তা চোখের

সামনেই ভেসে উঠবে। গ্রামীণ যাত্রার এ-হেন বাস্তব মূর্তি এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে বলে মনে পড়ে না। এই ঘটনা-বিবৃতিতে কোথাও কৌতুক ছাড়া Satire বা Wit নেই।

এ ছাড়া, এই পর্বেই ছিনাথ বহুরূপীর বা রয়াল বেঙ্গল টাইগারের হাস্যময় কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। তারও পূর্বে আছে, পরীক্ষায় পাশের পড়ায় রত মেজদার শ্রীকান্ত-যতীন প্রভৃতি ভাইদের পড়ার উপর অপূর্ব অভিভাবকত্ব। ছিনাথ বহুরূপী বাঘ সেজে শ্রীকান্তদের বাড়িতে এলে তাকে সত্যকারের বাঘ মনে করে শ্রীকান্তের পিসেমশাই ও ভট্টাচার্য মশাই যে চিৎকার করেছিলেন এবং গম্ভীর প্রকৃতি মেজদা The Royal Bengal Tiger দেখে ফিট হয়ে আর্তনাদ করেছিল তা শিশুসুলভ হলেও বেশ কৌতুক-রস (fun) সৃষ্টি করেছে।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষার্থী গম্ভীর প্রকৃতি মেজদার কথা স্মরণে এলেই হাসির উদ্রেক হয়। মেজদার দুর্ভাগ্য তার নির্বোধ পরীক্ষকগুলো তাকে চিনতে পারেনি, তাকে বারংবার ফেল করিয়ে দিয়েছিল। সেই মেজদাই যখন একটি মাত্র 'হুম' শব্দে 'আঁ আঁ করিয়া প্রদীপ উল্টাইয়া চিৎ হইয়া পড়িলেন, আর খাড়া হইলেন না,' তখন পিসেমশাই, দরোয়ান, পালোয়ান কিশোরী সিং এবং ভট্টাচার্য মশাই পর পর যে কাজ করলেন তা নিতান্তই কৌতুককর। 'পিসেমশাই তাঁর দুই ছেলেকে বগলে চাপিয়া ধরিয়া, তাহাদের অপেক্ষাও তেজে চেঁচাইয়া বাড়ী ফাটাইয়া ফেলিতেছেন। এ যেন তিন বাপ-বেটার কে কতখানি হাঁ করিতে পারে তারই লড়াই চলিতেছে।' 'দরওয়ানরা চোরকে মারিতে মারিতে আধ-মরা করিয়া টানিয়া আলোর সম্মুখে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। তখন চোরের মুখ দেখিয়া বাড়ীশুদ্ধ লোকের মুখ শুকাইয়া গেল! আরে, এ যে ভট্‌চাযি্য মশাই।' 'অকস্মাৎ পালোয়ান কিশোরী সিং 'উহ্ বয়ঠা' বলিয়া এক লাফে বারান্দার উপর।' 'এই হারামজাদা বজ্জাতকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া। খোট্টাশালার ব্যাটারা আমাকে যেন কিলায়কে কাঁটাল পাকায় দিয়া'—এই কৌতুককর বাক্যগুলির সম্মুখীন হলেই আমাদের চোখের সামনে একটি নাটকীয় দৃশ্য ভেসে ওঠে এবং আমরা না হেসে পারি না। এটি সম্ভব হয়েছে শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতাকে মূলধন করে। অভিজ্ঞতাই তাঁকে যে এ হেন সাফল্যের চাবিকাঠি এনে দিয়েছে তার প্রমাণ স্বরূপ এখানে শরৎচন্দ্রের মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি 'শরৎ স্মরণী' পত্রিকায় (১৩৬৬) 'শরৎ সাহিত্যে মাতুলালয়ের

প্রভাব' নামক ছোট্ট প্রবন্ধে লিখেছেন, 'একটি বৃহৎ এবং জটিল একান্নবর্তী সংসারে শরৎচন্দ্র মানুষ হয়েছিলেন বলে দেখবার এবং বোঝবার অনেক সুযোগ লাভ করে তিনি বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তাই তাঁর গল্প উপন্যাসের পাত্র পাত্রীদের অবয়বে হঠাৎ এক এক সময় নজরে পড়ে, প্রাচীন গাঙ্গুলী পরিবারের কর্তা-গৃহিনী বৌ-ঝিদের সুস্পষ্ট ঝিলিক। মাতুলালয়ের অনেক কাহিনী, অনেক ঘটনা সামান্যমাত্র পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হয়ে তাঁর গল্প-উপন্যাসে স্থান লাভ করেছে।

শুধু শ্রীকান্তেই নয়—অন্যান্য বহু গ্রন্থেও।' আমি 'লেখাপড়া' অংশে এ-ও বলেছি যে, শ্রীকান্তের পড়াশুনার বিবরণ শরৎচন্দ্রের মাতুলালয়ে পড়াশুনা করারই অনুরূপ। সুতরাং এরূপ ঘটনাও সেখানে ঘটা অসম্ভব নয়, কেবলমাত্র সত্যের উপর কিছুটা প্রলেপ পড়তে পারে মাত্র।

এরপরই ইন্দ্রনাথের দর্জিপাড়ার নতুনদা'র চমৎকার হাস্য-রসাত্মক কাহিনী। মেজদা কিংবা যাত্রার দলের মেঘনাদের পরিপূরক-চরিত্র কলিকাতার দর্জিপাড়ার নতুনদা। নতুনদা অখণ্ড স্বার্থপরতার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁর মনকাড়ানিয়া 'ঠুন ঠুন পেয়ালা' সঙ্গীত এবং 'আমার এক পাটি পাম্প্-শু' উক্তি আমাদের বহুকাল স্মরণে থাকবে। মেজদার চেয়েও নতুনদা'র চরিত্র যেন অনেক বেশী জীবন্ত। এক প্রসন্ন সহানুভূতির সঙ্গে ঔপন্যাসিক আমাদের সঙ্গে নতুনদা'র পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তবে Irony-র খোঁচা দিয়ে নতুনদা'র পরিচয় দিয়েছেন, 'এখন তিনি ডেপুটি কিংবা আদৌ সে কাজ পাইয়াছেন কি না, সে সংবাদ জানি না। কিন্তু মনে হয় যেন পাইয়াছেন, না হইলে বাঙালী ডেপুটির মাঝে মাঝে এত সুখ্যাতি শুনিতে পাই কি করিয়া?' নতুনদা'র আচার-আচরণ আমাদের মনকে তাঁর বিরুদ্ধে বিরূপ করে তোলে। আগাগোড়া বিদ্রূপাত্মক বর্ণনা আমাদের উপভোগের সীমাকে সঙ্কুচিত করে রাখে। কিন্তু তাঁর অশ্রুতপূর্ব গীত এবং অদৃষ্টপূর্ব পোশাকের ছটায় আকৃষ্ট সারমেয় দলের আক্রমণে দুর্দান্ত শীতের রাত্রে সেই ভয়ঙ্কর বাবুর তুষার-শীতল জলে আকণ্ঠমগ্ন অবস্থান আমাদের কৌতুক জাগিয়ে তোলে।

তারপর যৌবনকালে একদিন পথিমধ্যে এক সন্ন্যাসীর চরণে আত্মসমর্পণ করেছে শ্রীকান্ত। সাধুজীর এক চেলার কাছে, 'চোখ টিপিয়া কহিলাম, বাবাজী, বলি আয়না টায়না হ্যায়?...দেখিলাম তাঁহারও রসবোধ আছে। তথাপি একটু গম্ভীর হইয়া তাচ্ছিল্য ভরেই বলিলেন, 'হ্যায় একঠো'।' মশার কামড়ের জ্বালায় শ্রীকান্তের সন্ন্যাসী-জীবনের অসুবিধা হওয়ায় শরৎচন্দ্র একটু

বক্রোক্তি করে লিখেছেন, 'অন্যান্য বিষয়ে বাঙালী যত সেরাই হোক, এ-বিষয়ে বাঙালীর চেয়ে হিন্দুস্থানী চামড়া যে সন্ন্যাসের পক্ষে ঢের বেশী অনুকূল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।' কিন্তু, শ্রীকান্তর 'সর্বদর্শী' সাধুবাবাকে তুষ্ট করে ধুনির ছাই মেখে ও গেরুয়া বস্ত্র, রুদ্রাক্ষমালা, পিতলের তাগা পরে সাধুজীর তৃতীয় চেলা বনে যাওয়ার যে কৌতুক হাস্য তা নিতান্ত মামুলি ধরণের। সাধু-সন্ন্যাসী জীবনের কাঠিন্যের বা সাধনার দুর্গম পথে শ্রীকান্তকে আসতে নিরুৎসাহ করায় শ্রীকান্ত করুণ কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিয়েছে, 'বাবা, মহাভারতে লেখা আছে জগাই-মাধাই বশিষ্ঠ মুনির পা ধরিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন; আর আপনার পা ধরিয়া আমি কি মুক্তি পাইব না? নিশ্চয়ই পাইব।'—কৌতুক হিসাবে এরূপ উক্তি অবশ্য তেমন সমর্থনীয় নয়। পাঠকের কাছে বরং চমক সৃষ্টি করে, সন্ন্যাসীর কাছে আয়না-টায়না থাকার সংবাদে এবং সন্ন্যাসীর সংসার চিত্রে। উপন্যাসে বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের মাধ্যমেও হাস্যরস সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

তবে, বাক্‌চাতুর্যে নির্মল হাস্যরসের সৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মত অতটা কৃতিত্বের অধিকারী নন, তবে তিনিও মাঝে মাঝে বর্ণনা প্রসঙ্গে বা কোন চরিত্রের উক্তির সাহায্যে কৌতুকহাস্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। দুঃখ দুর্বলতা-পূর্ণ মানব জীবনের প্রতি শরৎচন্দ্রের অনন্ত সহানুভূতি। রেঙ্গুনের বিখ্যাত হরিপদ মিস্ত্রীর কাছে শ্রীকান্ত রেঙ্গুনের বিখ্যাত নন্দ মিস্ত্রীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। অমনি লোকটি অসম্ভ্রমসূচক একপ্রকার মুখভঙ্গী করে বলল, 'ওঃ মিস্তিরী। অমন সবাই নিজেকে মিস্তিরী কবলায় মশায়! মিস্তিরী হওয়া সহজ নয়! মর্কট সাহেব যখন আমাকে বলেছিল,—'হরিপদ, তুমি ছাড়া মিস্তিরী হবার লোক ত কাউকে দেখতে পাইনে!' তখন বড় সাহেবের কাছে কত উড়ো চিঠি পড়েছিল জানেন? একশ' খানি। আরে, কাস্তের জোর থাকলে কি উড়ো চিঠির কর্ম? কেটে যে জোড়া দিতে পারি!' (পৃঃ ২১০) এটি সুন্দর হাস্যরসের উদাহরণ। আর একটি নিদর্শন রেঙ্গুনের জাহাজে নন্দ মিস্তিরীর 'জাত বোষ্টম' সঙ্গিনী টগরের সঙ্গে কথোপকথনে মিলবে, যে টগর বিশ বছর একসঙ্গে ঘর করেও ছোট জাত (কৈবর্ত) বলে তার মানুষ নন্দকে হেঁসেলে ঢুকতে দেয়নি। টগর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছে, 'হলোই বা বিশ বচ্ছর! পোড়া কপাল। জাত বোষ্টমের মেয়ে আমি, আলি হলুম কৈবত্তের পরিবার! কেন, কিসের দুঃখে? বিশ বচ্ছর ঘর করচি বটে, কিন্তু একদিনের তরে হেঁসেলে ঢুকতে দিয়েচি? সে কথা কারও বলবার যো নেই। টগর

বোষ্টমী ম'রে যাবে, তবু জাত-জন্ম খোয়াবে না—তা জানো?'

মধু ডোমের মেয়ের সঙ্গে ভগবতী ডোমের পুত্রের বিয়ের দৃশ্যটিও উপভোগ্য। কন্যা পক্ষের পুরোহিত দুর্বল ক্ষীণজীবী রাখাল পণ্ডিত। বর পক্ষের পুরোহিত প্রবল ও স্থূলকায় শিবু পণ্ডিত বিয়ে দিচ্ছে। দুজনেই অব্রাহ্মণ হলেও তারা যে পুরোহিত কারণ, ডোমেদের বিয়ে শ্রাদ্ধ দশকর্ম প্রভৃতি করায়। শিবু পণ্ডিতের প্রচণ্ড দাপটে রাখাল পণ্ডিতের ক্ষীণ কণ্ঠ ডুবে গেল, রাখাল বরকে মন্ত্র পড়িয়েছিল, 'মধু ডোমায় কন্যায় নমঃ।' শিবু পণ্ডিত বলল, 'এ মন্ত্র মিথ্যা। আসল মন্ত্র হইতেছে, মধু ডোমায় কন্যায় ভুজ্যপত্রং নমঃ। যতদিন জীবন ধারণং ততদিন ভাতকাপড় প্রদানং স্বাহা।' এমনি করে সে প্রমাণ করে দিল যে আসল মন্ত্র সে একাই জানে, আর সবাই যজমানকে ঠকিয়ে খায়। আবার অন্য দিকে এদের ঝগড়া শুনে রতন আভিজাত্য গৌরবে স্ফীত হয়ে বলল, 'তোদের ডোম ডোকালির আবার বিয়ে। এ ত আমাদের বামুন কায়েত নবশাকের বিয়ে নয়।' পাঠক জানেন যে, রতন জাতিতে নাপিত। যারা অপাংক্তেয়, মূঢ়, শরৎচন্দ্র তাদের জীবন তাদের মত করেই বুঝবার চেষ্টা করেছেন। রেঙ্গুন যাত্রার বর্ণনা এত মধুর হওয়ার কারণ, তিনি সাধারণ লোকের অজ্ঞতা, ভয় ও আনন্দ ঠিক তাদের মত করেই দেখিয়েছেন। এগুলি কৌতুকময়, কারণ এগুলি আনন্দময়। এইভাবে হাস্যরসিক শরৎচন্দ্র তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যেও হাস্যরসের উপকরণ যুগিয়েছেন। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসেও আমরা তার অনেকগুলির সন্ধান পেলাম। কখনও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, কখনও বা তরল হাস্যরস এবং কখনও বা পরিহাসব্যঞ্জক মন্তব্য দ্বারা শরৎচন্দ্র অতি সুদক্ষ শিল্পীর ন্যায় বিভিন্ন গল্পের মধ্যে কৌতুকরসের অবতারণা করেছেন। এবং মনে হয়, এগুলি লেখকের স্মৃতি-চিত্রণ বলেই এত জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

কবিত্বশক্তি ও নিসর্গপ্রীতি

'Imagination is a living power and prime agent of all human perception, and as a repitition in the finite mind of the eternal act creation in the infinite I am.'

—Coleridge

উপন্যাসের স্থচনাতেই শ্রীকান্ত বলেছে ভগবান তার মধ্যে কবিত্বের বাষ্পটুকুও দেননি। 'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস বলে শ্রীকান্তের এই উক্তিকে শরৎচন্দ্রের উক্তি বলেই মনে করি। শরৎচন্দ্র রাধারাণী দেবীকে দুটি চিঠিতে তাঁর কবিতা লেখার অক্ষমতার কথা জানিয়েছিলেন। দুটি চিঠির খণ্ডাংশ তুলে দিচ্ছি, 'তোমরা একটা কথা তেমন জান না যে আমার ভাষার ওপরে অধিকার সত্যিই কম।..... ভাষার ওপরে দখল এতই অল্প যে দুছত্র কবিতা পর্যন্ত মেলাতে পারিনে,—কথা খুঁজে পাইনে।' অপরটিতে—'কিন্তু জানোই ত ভাই বিনয় নয়, সত্যিই কবিতার আমি কিছুই জানিনে। তাই কবিতা যে কেউ লেখে তার পানেই আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। নিজে না পারি দু'ছত্র মেলাতে, না পারি ভালো ভালো কথা খুঁজে বার করতে।'

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের স্থচনায়ও শরৎচন্দ্র লিখেছেন, 'এই দুটো পোড়া চোখ দিয়া আমি যা কিছু দেখি ঠিক তাহাই দেখি। জলের দিকে চাহিয়া জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। আকাশে মেঘের পানে চোখ তুলিয়া রাখিয়া ঘাড়ে ব্যথা করিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু যে মেঘ সেই মেঘ। কাহারো নিবিড় এলোকেশের রাশি চুলোয় যাক—একগাছি চুলের সন্ধানও কোনদিন তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। চাঁদের পানে চাহিয়া চোখ ঠিকরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু কাহারও মুখ-টুখ ত কখনো নজরে পড়ে নাই। এমন করিয়া ভগবান যাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কবিত্ব স্থষ্টি করা ত চলে না। চলে শুধু সত্য কথা সোজা করিয়া বলা। অতএব আমি তাহাই করিব।'

উক্তিটুকুর মধ্যে কবিতা না লিখতে পারার দুঃখ ফুটে উঠেছে। কিন্তু

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, 'সত্য কথা সোজা করিয়া বলা'র প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত কতখানি বিশ্বস্তভাবে পরিবেশিত হয়েছে। কমলাকান্তের রীতিতে যা তিনি বলেছেন তার মধ্যে পরিহাস থাকলেও সত্যই শরৎচন্দ্রের মনে কবিতা না লিখতে পারার একটি দুঃখ ছিল। এ প্রসঙ্গে অখিল নিয়োগীর 'শরৎচন্দ্রকে যেমন দেখেছি' প্রবন্ধ থেকে সামান্য অংশ তুলে ধরছি, 'এক উদ্যান-সম্মেলনে শরৎচন্দ্র একদিন আমাদের জিগ্যেস করলেন, তোমরা কে কে কবিতা লেখো—হাত তোল। আমরা মহা গর্বের সঙ্গে হাত তুললাম। শরৎচন্দ্র তখন সবাইকে অবাক করে দিয়ে বললেন, আজ থেকে সবাই কবিতা লেখা ছেড়ে দাও।

তরুণ সাহিত্যিকরা ত সবাই হতবাক! শরৎচন্দ্র এ আবার কি বলছেন? আমাদের সবাইকার মুখের চেহারা দেখে শরৎচন্দ্র বললেন—দেখ, আমি ঠিক কথাই বলেছি। যে দেশে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছেন সেখানে নূতন করে কবিতা রচনার কোন মানে হয় না। আমিও প্রথমে কবিতা দিয়েই শুরু করেছিলাম। তারপর রবীন্দ্রনাথ পড়ে কবিতা লেখা বেমালুম ছেড়ে দিয়েছি। আচ্ছা, তোমরাই বলো না, নূতন করে কি আর লেখবার আছে—রবীন্দ্রনাথের পর? সব কিছুই তিনি সুন্দর করে বলে গিয়েছেন।'

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং তিনি নিজেও প্রথম জীবনে যে কবিতা লিখতে সচেষ্ট ছিলেন তা নিরুপমা দেবী ও সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখে গেছেন। নিরুপমা দেবী লিখেছেন, 'শরৎদাদা কবিতা লিখিতে পারিতেন শুনিয়াছিলাম। কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছোট একটি গাথা ছাড়া আর কিছু কখনো দেখি নাই। সেটির নাম মনে নাই কিন্তু ছাড়া ছাড়া ভাবে কয়েকটি লাইন মাত্র তাহার মনে আছে। প্রথম লাইনটি—'ফুলবনে লেগেছে আগুন।"

পরবর্তী কালে শরৎচন্দ্র আর কবিতা লেখার চেষ্টা করেননি বটে তবে তিনি যে কবিদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন তা 'শ্রীকান্ত'ই প্রমাণ দেবে। তাঁর রচনাবলী পড়লেও দেখা যায় যে, নিজের কবিত্ব সম্পর্কে তাঁর এ সকল কথা যথার্থ নয়। এবং সকল সময় না হলেও মাঝে মাঝে তিনি লেখায় কবিত্বের মোহ ত্যাগ করতে পারেননি। যদিও, গদ্য এই যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রকাশ মাধ্যম এবং উপন্যাসের স্বীকৃত-বাহন তবুও, এর লাবণ্য তথা ভাষার সার্থকতার উপরই কিন্তু ঔপন্যাসিকের গৌরব নির্ভরশীল। অখণ্ড কল্পনার ছাপও উপন্যাসের উপর পড়ে। প্রত্যেক ঔপন্যাসিকের বিশিষ্ট রীতি এক একটি

গুণের জন্য বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। উপন্যাসের ভাষা জীবনের বাস্তবতাকে যেমন গ্রহণ করে, তেমনি জীবনের কাব্যকেও আত্মার আত্মীয় হিসাবে মেনে নেয়। উপন্যাসের ভাষা সর্বত্রগামী। অতি তুচ্ছ বিষয় বলতে বলতে জীবনগত কাব্যকেও আবিষ্কার করবে এই গদ্য; কিন্তু অতিরিক্ত কবিত্ব নির্ভর ভাষা-নিষ্ঠাও ঔপন্যাসিকের ত্রুটি।

শরৎচন্দ্রের স্টাইল বা রচনারীতির মাধুর্য উচ্চপ্রশংসা লাভ করেছে। যাঁরা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের কাহিনী বা ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন না তাঁরাও তাঁর শব্দসম্পদ ও রচনা সৌষ্ঠবকে শিরোধার্য করেন। তবে বাণীভঙ্গির দিক থেকে তিনি রবীন্দ্র প্রভাবিত। অবশ্যই আপন বৈশিষ্ট্যে তা উজ্জ্বল; স্বচ্ছ এবং অনাড়ম্বর। বাস্তব বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কবি কল্পনাকেও প্রশ্রয় দিয়েছেন। সুতরাং রাধারাণী দেবীকে লেখা উক্তিটি বিনয়মিশ্রিত এবং উপন্যাসের সূচনার উক্তিটিও অনুরূপ কারণে সত্য নয়, কারণ বহু ক্ষেত্রেই যে বাস্তব বর্ণনার সঙ্গে কবিত্বের বাষ্প জড়িয়ে মিশিয়ে চিত্রাঙ্কনে তৎপর হয়েছেন তার প্রমাণ 'শ্রীকান্ত' থেকেই দেব। তবে শরৎচন্দ্রের কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাহিনী, ঘটনা ও পরিবেশের সঙ্গে খাপ খেয়ে লেখার শিল্পকলাগত মূল্য বাড়ালেও কোন কোন ক্ষেত্রে এই কবিত্বমণ্ডিত বর্ণনার জন্য রচনা ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে, এমন দৃষ্টান্তও যে নেই তা নয়।

শরৎচন্দ্রের কবিত্ব যেটুকু ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তা তাঁর হৃদয়াবেগেরই ফল, চেষ্টা করে ভাষার কারুকার্য সম্পাদনের দিকে তাঁর প্রবণতা ছিল না। তাঁর ভাষায় যেখানে অল্পবিস্তর কবিত্ব দেখা যায় সেখানেও পরিবেশ এবং ঘটনা ও কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা প্রায়ই বেশ খাপ খেয়েছে। শ্রীকান্তের বক্তব্য 'সত্য কথা সোজা করিয়া বলা।' যিনি সত্য কথাকে অর্থাৎ জীবনের অভিজ্ঞতাকে সহজ ভাষায় অর্থাৎ প্রাণের ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেন তিনি দুর্লভ কবিত্ব শক্তির অধিকারী।

শ্মশান দৃশ্যের বর্ণনায় কবি-কল্পনার চমৎকারিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। নৈশ অভিযানের প্রথম রাত্রির অভিজ্ঞতা বাস্তবানুগ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে যে অকুণ্ঠিত বাস্তবতা, যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুর পাওয়া যায় তা কবিত্বকে অতিক্রম করে অনেক ঊর্ধ্বে উঠেছে। নৈশ অভিযানের দ্বিতীয় রাত্রে শ্রীকান্ত নিজের ইচ্ছায় নয়, যেন দুর্জ্ঞেয় সংকেত ও অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ হেতু মহাশ্মশানে উপস্থিত হয়েছিল। এখানে তার কাছে নিখিল চরাচর তার স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে ও এর সঙ্গে শ্রীকান্তের কবিপ্রাণ সাযুজ্য

লাভ করেছে। শরৎচন্দ্রের রচনা-শৈলী এখানে কবিত্ব সৌরভে পরিপূর্ণ; অনুভূতিতে সমৃদ্ধ ও কল্পনার ঐশ্বর্যে দীপ্যমান। নিশীথ-শ্মশানের ভয়াবহ বর্ণনা ও ভাঙ্গা বাঁধাঘাটে বসে মানবজীবন সম্বন্ধে পর্যালোচনা শরৎচন্দ্রের বর্ণনাশক্তি ও মননশক্তির অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেয় এবং বর্মা যাত্রা যেন শরৎচন্দ্রে কল্পনা ও বর্ণনাশক্তির নতুন বিজয় অভিযান। সমুদ্রযাত্রার বর্ণনায় একাধারে কবিত্ব, জীবন সমালোচনা, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি সকল প্রকার মানসিক শক্তিরই সার্থকতা হয়েছে। জাহাজের উপরে নানাপ্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে ও পরিচয়ের স্বল্প অবসরেও শরৎচন্দ্রের দিব্যদৃষ্টি আবার নতুন আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছে। (১)

শরৎচন্দ্র শ্মশানের নিশীথ অভিজ্ঞতার বর্ণনায় শিল্পক্ষমতার আশ্চর্য ব্যবহারে প্রকৃতিকে এখানে প্রায় স্পর্শগ্রাহ্য করে তুলেছেন। এর সর্বত্রই নিজস্ব অভিজ্ঞতার প্রসাদ ছড়িয়ে রয়েছে। প্রৌঢ় পরিপক্ক ভাবনায় শরৎচন্দ্রের রাজেন্দ্র-সহ শ্মশান-অভিজ্ঞতার স্মৃতি এখানে বাস্তবের মাটি ছুঁয়ে কল্পনার গগনে উঠে কাব্যরূপ নিয়েছে। বাংলা সাহিত্যে অবশ্যই এই স্থানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শরৎচন্দ্রের ক্ষমতা এখানে এই কথাই বলে যে, প্রকৃতির ভীতিকর মূর্তিকে রূপময় করায় তিনি সিদ্ধহস্ত। আমরা নিঃসন্দেহে আঁধারের রূপালেখ্য দেখে মুগ্ধ হই এবং শ্মশানের Uncanny রহস্যঘন ভয় ভয় পরিবেশ চিত্রনে শরৎচন্দ্রের ক্ষমতাকে তারিফ করি।

কবিত্বের একটা বড় দিক নিসর্গ-প্রীতি। নিসর্গ-প্রীতি অল্পবিস্তর সকল জীবন-শিল্পীরই থাকে, কারণ জীবন ও জগৎ নিয়ে সাহিত্যে যাঁর কারবার, জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ তিনি অস্বীকার করবেন কি ভাবে। তবে শরৎচন্দ্রের বাস্তবতা নির্ভর উপন্যাসে নিসর্গ সৌন্দর্য নিয়ে আবেগ উচ্ছাস প্রকাশের অবকাশ কম। কিন্তু জগতের ও জীবনের নানা বিচিত্র সমস্যার আলেখ্যের ফাঁকে ফাঁকেই প্রকৃতি সুযোগ মত উঁকি দিতে ছাড়েনি। বৈষ্ণব কবিকুল, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, রবীন্দ্রনাথ বা বিভূতিভূষণ প্রভৃতি কবিরা যেমন মানুষ ও প্রকৃতিকে অন্তরঙ্গ দেখিয়েছেন, ঠিক সেরূপ অন্তরঙ্গতাবোধ অবশ্য শরৎ-সাহিত্যে দুর্লভ। তবে মানুষের মনের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগ স্থাপনে শরৎচন্দ্রও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন; এবং প্রকৃতির রূপ বিন্যাসে লেখকের যে শিল্প ও সৌন্দর্যবোধ ফুটে উঠেছে, পাঠক সেটুকুতেই মুগ্ধ না হয়ে পারে না।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানব হৃদয়ের গভীরতম ঐক্য দেখি তৃতীয় পর্বে। রাজলক্ষ্মী দ্বারা অবহেলিত হয়ে শ্রীকান্তের উদ্দেশ্যহীন কর্মহীন দিন যখন

কাটতে চাইত না, 'অদূরবর্তী কয়েকটা খর্বাকৃতি বাবলা গাছে বসিয়া ঘুঘু ডাকিত এবং তাহারি সঙ্গে মিলিয়া মাঠের তপ্ত-বাতাসে কাছাকাছি ডোমেদের কোন একটা বাঁশ ঝাড় এমনি একটা একটানা ব্যথাভরা দীর্ঘশ্বাসের মত শব্দ করিতে থাকিত যে মাঝে মাঝে ভুল হইত সে বুঝি আমার (শ্রীকান্তের) নিজের বুকের ভিতর হইতেই উঠিতেছে।'

গঙ্গামাটির কারাবাসে বাইরের বাতাসই একমাত্র বন্ধু, কারণ সে দূরের সংবাদ বয়ে আনে এবং মুক্তির স্বাদ দেয়। 'মনে হয়, কত লোকের পায়ের স্পর্শ এবং কত না অচেনা লোকের তপ্ত শ্বাসের আমি যেন ভাগ পাই। হয়ত, আমার সেই ছেলেবেলার বন্ধু ইন্দ্রনাথ আজিও বাঁচিয়া আছে, এবং এই উষ্ণ বায়ু হয়ত তাহাকে এইমাত্র ছুঁইয়া আসিল।...কখনও মনে হয়, এই কোণেই ত বর্মাদেশ, বাতাসের ত বাধা নাই, কে বলিবে সমুদ্র পার করিয়া অভয়ার স্পর্শ টুকু সে আমার কাছে বহিয়া আনিতেছে না।'

মানবহৃদয়ের সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত নিছক নিসর্গ বর্ণনা শরৎ-সাহিত্যে নেই। যে দুই একটি স্থানে এরূপ বর্ণনা আছে সেখানেও শরৎচন্দ্রের রচনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য বর্তমান। দ্বিতীয় পর্বে ক্ষুব্ধ সমুদ্রের যে বর্ণনা আছে তা-ও শরৎচন্দ্রের কবি প্রতিভার সাক্ষ্য দেয়।

চতুর্থ পর্বটি সম্পর্কে শরৎচন্দ্র দিলীপকুমার রায়কে এক পত্রে (সামতাবেড় ১০ই ভাদ্র ১৩৪০) লেখেন—"শ্রীকান্ত, ৪র্থ পর্ব তোমার এত ভালো লেগেছে জেনে কত যে খুশি হয়েছি বলতে পারি নে—কারণ এ বইটি সত্যিই আমি যত্ন ক'রে মন দিয়ে লিখেছিলাম হৃদয়বান পাঠকের ভালো লাগার জন্যেই।"

তৃতীয় পর্ব লেখার পর কালিদাস রায় বলেছিলেন,—'দাদা, আমার মনে হয় শ্রীকান্ত নভেলও নয়, ভ্রমণ কাহিনীও নয়। এটা রীতিমত একটা এপিক কাব্য!'

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন,—হ্যাঁ হে ভায়া, নিজ মুখে সেটা আর বললাম না, সেটা বলা আমার স্পর্ধার কথাই হতো। কাব্যের শেষ পরিচ্ছেদ এখনও লেখা হয়নি।' (২) সুতরাং পরিষ্কার যে, স্বয়ং শরৎচন্দ্রই 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে একটি কাব্যিকরূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

চতুর্থ পর্বের পাতায় পাতায় তাঁর প্রকৃতি-প্রীতির অফুরন্ত দৃষ্টান্ত আমরা পেয়ে থাকি।

মানুষ ও প্রকৃতির যে অন্তরঙ্গতা-বোধ শরৎসাহিত্যে একেবারে দুর্লভ নয়, নিম্নের দৃষ্টান্তটি তার প্রমাণ। গঙ্গামাটির গ্রাম্য পথ দিয়ে সুনন্দাদের বাড়ি

থেকে শ্রীকান্ত পড়ন্ত বেলায় রাজলক্ষ্মীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরছিল। শ্রীকান্তের বর্ণনায় তা ধরা পড়েছে—"আজ সারা দিনটাই কেমন একটা মেঘলাটে গোছের করিয়াছিল। অপরাহ্ণ সূর্য্য অসময়েই একখণ্ড কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ায় আমাদের সামনের আকাশটা রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই গোলাপী ছায়া সম্মুখের কঠিন ধূসর মাঠে ও ইহারই একান্তবর্তী একঝাড় বাঁশ ও গোটা-দুই তেঁতুল গাছে যেন সোনা মাখাইয়া দিয়াছিল; রাজলক্ষ্মীর শেষ অনুযোগের জবাব দিলাম না। কিন্তু ভিতরের মনটা যেন বাহিরের দশদিকের মতই রাঙিয়া উঠিল। অলক্ষ্যে একবার তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম ওষ্ঠাধরে হাসি তখনও সম্পূর্ণ মিলায় নাই, বিগলিত স্বর্ণপ্রভায় এই একান্ত পরিচিত হাসিমুখখানি একেবারে যেন অপূর্ব মনে হইল। হয়ত এ কেবল আকাশের রঙই নয়; হয়ত, যে আলো আর এক নারীর কাছ হইতে এইমাত্র আমি আহরণ করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহারই অপরূপ দীপ্তি ইহারই অন্তরে খেলিয়া বেড়াইতেছিল। পথে আমরা ছাড়া আর কেহ ছিল না। সে সুমুখে আঙুল বাড়াইয়া কহিল, তোমার ছায়া পড়েনি কেন বল ত? চাহিয়া দেখিলাম অদূরে ডান দিকে আমাদের অস্পষ্ট ছায়া এক হইয়া মিলিয়াছে।" (পৃঃ ৩৯৯)

অংশটির কলাশিল্প পাঠকেরও চোখে পড়বে। যেমন এর ভাষা ও বর্ণনা, তেমন এর ভাব। সুতরাং শ্রীকান্ত যা প্রারম্ভে বলতে চেয়েছে, তা সত্য বলে গ্রহণ করা চলে না। প্রকৃতপক্ষে কবির অনুভূতি এবং দার্শনিকের জীবন-জিজ্ঞাসা নিয়ে শ্রীকান্ত তার অতীত অভিজ্ঞতার ইতিহাস এক নিটোল আখ্যানের মধ্যে গড়ে তুলেছে।

উৎস নির্দেশ

(১) বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
পৃঃ ২২৯—৩০

(২) শরৎচন্দ্র—দ্বিতীয় খণ্ড—গোপালচন্দ্র রায়। পৃঃ ৯৯

অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী ?

"ভূতের গল্প বলতে পারতেন শরৎচন্দ্র চমৎকার।...রসচক্রের এক বার্ষিক উৎসবে, বিস্তর সাহিত্যিক জড়ো হয়েছিল একসঙ্গে।...খাবার দেরি আছে,—কি করা যায়? ধরে বসলাম শরৎদাকে। ব্যস, এমন ভূতের গল্প আরম্ভ করলেন যে খাবার তৈরী, তবু কেউ উঠতে চায় না। গল্পটা শেষ হোক্ আগে। গল্প যখন শেষ হলো, খাবার তখন জুড়িয়ে গেছে।"

—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বৈঠকী গল্পে বা হাস্য-পরিহাসে শরৎচন্দ্র যে আসর জমিয়ে রাখতে পারতেন তা তৎকালীন বহু ব্যক্তিই—যাঁরা শরৎ-সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন—স্বীকার করেছেন। গল্পকার শরৎচন্দ্র ভূতের গল্প, অলৌকিক—অতিপ্রাকৃত উপাদান-মিশ্রিত গল্পও চমৎকার বলতে পারতেন। এমন ভূতের গল্প আরম্ভ করতেন যে, অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও আসর ছেড়ে উঠতে চাইতেন না। রবীন্দ্রনাথও এই ব্যাপারে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন এই, শরৎচন্দ্র কি অতি-প্রাকৃতে বিশ্বাসী ছিলেন?

যদিও শরৎচন্দ্র বানিয়ে বা সাজিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলী শ্রোতাদের মধ্যে গল্প পরিবেশন করে মজাও পেতেন এবং আসর মাতিয়েও তুলতেন, তবুও তাঁর অতিপ্রাকৃতে বা অলৌকিকতায় অবিশ্বাসী মনোভাব কখনও প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে হয় না।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসেও শরৎচন্দ্র অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য নিখুঁতভাবে পরিবেশ রচনা করেছেন এবং এমনভাবে তা করেছেন যা হয়েছে গতিসম্পন্ন ও বিশ্বাসযোগ্য। বিশ্বাসযোগ্য এই কারণে যে, শরৎচন্দ্র বৈঠকী বজায় রেখেও ঠিক ভূতের গল্প বলেননি। তিনি তাঁর বর্ণনার সৌন্দর্যকে বিস্ময়ের মালা পরিয়ে এক অনাঘ্রাত আনন্দ প্রদান করেছেন।

ইংরেজী সাহিত্যে কোলরিজ, কীটস্ ও সেক্সপীয়ারও অতিপ্রাকৃতের প্রতি সহজ সংস্কারগত বিশ্বাসকে রূপায়িত করেন। সেক্সপীয়ারের বহু নাটকে এবং কোলরিজের The Ancient Mariner, Christabel ও Kubla

Khan-এ অতিপ্রাকৃত বিষয় ছড়িয়ে আছে। সেই সময়ে এই বিশ্বাস এত সহজ ও স্বাভাবিক ছিল যে, অসমর্থিত অভিজ্ঞতাও প্রমাণের অপেক্ষা করত না। রবীন্দ্রনাথের গল্পেও (ক্ষুধিত পাষাণ, মাষ্টারমশাই ইত্যাদি) অতি-প্রাকৃতের উপাদান যথেষ্ট মিলবে।

শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র ঠিক ভূতের গল্প না বলে, এক প্রকারের অতিপ্রাকৃত আবহাওয়া উপন্যাসের বিভিন্ন স্থানে যোজনা করেছেন। সমগ্র উপন্যাসের সৌন্দর্যটাকে ঐ অতিপ্রাকৃত রস একটি নতুন প্রাণ প্রবাহের সৃষ্টি করেছে। 'ইন্দ্র নিজে ভূত বিশ্বাস করিত, কিন্তু সেও কখনো চোখে দেখে নাই।' 'উপরে, মাথার উপরে আবার সেই আলো আঁধারের লুকোচুরি খেলা এবং পশ্চাতে বহু দূরাগত সেই অবিশ্রান্ত তর্জ্জন। আর সুমুখে সেই বালির পাড়।...দেখি ইন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, শ্রীকান্ত, তোকে একটা কথা বলতে ফিরে এলুম। কেউ যদি মাছ চাইতে আসে, খবরদার দিস্‌নে—খবরদার বলে দিচ্ছি। ঠিক আমার মত হয়েও যদি কেউ আসে, তবু দিবিনে—বল্‌বি, মুখে তোর ছাই দেবো—ইচ্ছে হয়, নিজে তুলে নিয়ে যা। খবরদার, হাতে করে দিতে যাস্‌নে যেন—ঠিক আমি হ'লেও না—খবরদার!

কেন ভাই?

ফিরে এসে বল্‌ব—

এইবার আমার পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত কাঁটা দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল।......নিতান্ত শিশুটি নহি যে, তাহার ইঙ্গিতের মর্ম্ম অনুমান করিতে পারি নাই।.....প্রতি মুহূর্তেই মনে হইতেছিল, পাড়ের ওদিক্ হইতে কে যেন উঁকি মারিয়া দেখিতেছে! যেমনি আড়-চোখে চাই, অম্‌নি সেও মাথা নীচু করে। (পৃঃ ২৫-২৬)

আমরা অনেকেই এই অবস্থায় ভয় পাই অর্থাৎ অবিশ্বাস করেও বিশ্বাস করি, ইন্দ্রনাথ কিন্তু বিশ্বাস করেও ভয় পায় না। সে কোন-কিছু আছে বলে বিচলিত হয় না, এমন একটা বস্তুতে তার বিশ্বাস আছে যার জন্য অবিশ্বাস তার কিছুতেই নেই, ভয় করবারও কিছু নেই। এই 'এমন একটা বস্তুতে তার বিশ্বাস'টি কী? তার কথাও উপন্যাসের ২৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে।

'জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা ইন্দ্র, তুমি কখনও ঐ-সব দেখেছ?

কি সব?

ঐ যারা মাছ চাইতে আসে?

না ভাই দেখিনি—লোকে বলে তাই শুনেছি।

আচ্ছা, তুমি এখানে একলা আসতে পারো?

ইন্দ্র হাসিল। কহিল, আমি ত একলাই আসি।

ভয় করে না?

না। রাম নাম করি। কিছুতেই তারা আসতে পারে না।'

এখন নিরুদিদির কথায় আসি। নিরুদিদির মৃত্যুর সময়েও পরিপূর্ণ জ্ঞান নিয়ে যে সমস্ত কথাগুলি বলেছিলেন তা বিশ্বাসযোগ্য না হলেও শরৎচন্দ্র একটি গা ছম্‌ছমে পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন।

'সেদিন শ্রাবণের অমাবস্যা। রাত্রি বারোটার পর ঝড় ও জলের প্রকোপে পৃথিবী যেন উপড়াইয়া যাইবার উপক্রম করিল। সমস্ত জানালা-দরজা বন্ধ। আমি খাটের অদূরে বহু প্রাচীন অর্দ্ধভগ্ন একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া আছি। নিরুদিদি স্বাভাবিক মুক্ত কণ্ঠে আমাকে কাছে ডাকিয়া, হাত তুলিয়া আমার কানটা তাঁর মুখের কাছে আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, শ্রীকান্ত তুই বাড়ী যা।

সে কি নিরুদি, এই ঝড়-জলের মধ্যে?

তা হোক। প্রাণটা আগে।······তিনি আমার হাতটা টানিয়া লইয়া রুদ্ধ জানালার প্রতি লক্ষ্য করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, যাবিনি, তবে কি প্রাণটা দিবি? দেখচিস্‌নে, আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে কালো কালো সেপাই এসেচে? তুই আছিস্ বলে ঐ জানালা দিয়ে আমাকে শাসাচ্চে? ···সে-রাত্রে ভয় পাইয়াছিলাম ত বটেই, বোধকরি বা যেন কি-সব চেহারাও দেখিয়াছিলাম।' (পৃঃ ৯৬)

এরপর শ্মশান-দৃশ্যের প্রসঙ্গ অবশ্যই আসে। শ্মশানে শ্রীকান্ত ভয়ে আচ্ছন্ন হলেও ভূতুড়ে কাণ্ডগুলির যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা মনে মনে ভেবেছে। যেমন নিরুদিদির ঐ ঘটনা প্রসঙ্গে শ্রীকান্ত চিন্তা করেছে, 'অথচ এসব কিছুই নাই, কিছুই ছিল না, তাহাও জানিতাম, মুমূর্ষু যে কেবলমাত্র নিদারুণ বিকারের ঘোরেই প্রলাপ বকিতে ছিলেন, তাহাও বুঝিয়াছিলাম।'

কুমার সাহেবের দরবারে এক শনিবারে গান-বাজনার আসর শেষ হওয়ার পর ভূতের গল্প শুরু হয়েছিল। একজন প্রবীণ হিন্দুস্থানী শ্মশানে অমাবস্যা রাত্রে প্রেত দর্শন ও তাদের কণ্ঠস্বর শোনার রোমাঞ্চকর কাহিনী বর্ণনা করলেন। শ্রীকান্ত কিন্তু তাঁর কথা অবিশ্বাস করেছিল। তার, ইন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্মশান-অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়েছে। ইন্দ্র ভূত বিশ্বাস করত।

বিসূচিকায় মৃত ছেলেটি যে তাদের ডিঙ্গিতে বসে ছিল, সে সম্পর্কে তার মনে কোন সংশয় ছিল না। কিন্তু শ্রীকান্ত তা মনে মনে যত অবিশ্বাসই করুক, স্থান ও কাল মাহাত্ম্যে তার দেহ ও মন ভীত হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র শ্মশান দৃশ্য অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। হাওয়া নেই, শব্দ নেই, নিজের বুকের ভিতরটা ছাড়া শ্রীকান্ত কোথাও এতটুকু প্রাণের সাড়া পায়নি। শকুন-শিশুর অশ্রান্ত কান্না, মড়ার মাথার মধ্যে দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হওয়া দীর্ঘশ্বাসের শব্দ প্রভৃতি যুক্তি স্থাপন করে ভৌতিক পরিবেশকে হাল্কা করার চেষ্টা সত্ত্বেও শ্রীকান্তের গোপন সংস্কারে ঘটনাগুলি এসে আঘাত করেছে। যাকে Uncanny feeling বলে সেই জাতীয় অতি সূক্ষ্ম অস্বস্তি শ্রীকান্তের শরীরটাকে যেন ঝাঁকানি দিয়ে গেছে। মনে হয়েছে পিছন থেকে কে যেন ডান কানের উপর নিঃশ্বাস ফেলেছে ; শরৎচন্দ্র তার বর্ণনা দিয়েছেন, 'ঘাড় না তুলিয়াও স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, এ নিঃশ্বাস যে নাকের ফুটাটা হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহাতে চামড়া নাই, মাংস নাই, এক ফোঁটা রক্তের সংস্রব পর্যন্ত নাই—কেবল হাড় আর গহ্বর! সমুখে, পিছনে, দক্ষিণে, বামে —অন্ধকার। স্তব্ধ নিশীথ রাত্রি খাঁ খাঁ করিতে লাগিল।'

প্রথম রাত্রির অভিযানের পর দ্বিতীয় রাত্রে শ্রীকান্ত কোন এক অজ্ঞাত আকর্ষণে একটি দীঘির ভাঙ্গা ঘাটে এসেছে এবং ভেবেছে প্রাচীন সেই গ্রামের মানুষ যারা সেখানে শেষ নিঃশাস ত্যাগ করেছিল, 'হয়ত তাহাদের তৃষ্ণার্ত্ত আত্মা আজিও এইখানে ঘুরিয়া বেড়ায়।' বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে দেখেছে নীচে মহাশ্মশান এবং মনে হয়েছে দু'টি লঘু পদধ্বনি শ্মশানের অভ্যন্তরে মিলিয়ে গেল এবং শ্রীকান্তকে তাদের মধ্যে এসে বসতে আহ্বান করল।

উপন্যাসের দিক থেকে এই শ্মশান-অভিযানের তাৎপর্য যেমন শ্রীকান্তের সম্যক পরিচয় প্রদান করা হয় তেমনি শরৎচন্দ্রের অতিপ্রাকৃত উপাদান ব্যবহারের একটি প্রয়াসও বটে। এই শ্মশান অভিযানের দৃশ্যকে অবলম্বন করেই শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মী নিকটবর্তী হয়েছে।

প্রথম পর্ব ছাড়া অন্যান্য পর্বে এমন করে অতিপ্রাকৃত উপাদান প্রয়োগ করেননি লেখক। গল্পকার শরৎচন্দ্র তাঁর ঘরোয়া কথালাপে অর্থাৎ বৈঠকী গল্পে যে অপরূপ রসিকতা ও রহস্যের অবতারণা করতেন তাতে অতিপ্রাকৃত বিষয়ে কোন বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নই তুলতেন না। তাই 'শ্রীকান্তে'র অতিপ্রাকৃত অংশগুলি যেন—'সংশয়ের বৃন্তে ফোটা অপরূপ বিশ্বাসের ফুল।' আপন সৌরভে সে শ্রীকান্তের ভবঘুরে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে সুষমামণ্ডিত করেছে।

> 'All great creative artists have within themselves some sort of religious urge which is their elan vital and which sustains their creations.'
>
> —D. H. Lawrence.

বন্ধুমহলে শরৎচন্দ্র নিজেকে নাস্তিক বলে পরিচয় দিতেন। মুখে এবং চিঠি-পত্রেও তাঁর এই নাস্তিকতার মনোভাব বহুস্থানে প্রকাশও করেছেন। অথচ তিনি নাস্তিক ছিলেন না; নাস্তিক্যের প্রচারটা ছিল মৌখিক ও বাহ্যিক। তাঁর গ্রন্থের ভিতর দিয়েও তাঁর আস্তিকতার প্রমাণ মিলে গেছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন ঈশ্বর-বিশ্বাসী ধার্মিক পুরুষ ছিলেন বটে, কিন্তু একটা সংশয়বাদী মনও আড়ালে-আবডালে যে না পুষে রাখতেন, তা নয়। অর্থাৎ একটা গরমিল ঠিকই ছিল। তবে বাড়িতে পূজো আর্চা ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক দিকগুলি অপ্রতিবাদেই মেনে চলতেন। তিনি ছিলেন বিষ্ণু-উপাসক। পৈতা (উপবীত) ত তিনি ব্যবহার করতেনই উপরন্তু গলায় তুলসীর মালাও পরতেন। চিত্তরঞ্জন দাশ যে 'রাধাকৃষ্ণ' বিগ্রহ দিয়েছিলেন, সে বিগ্রহের পূজাও তিনি করতেন। এছাড়া তাঁর ভাই বেদানন্দ স্বামীর মৃত্যু দিবসে প্রতিবছর তিনি হরি সংকীর্তন করাতেন। নিজেও বৈষ্ণব গান করতে পারতেন এবং বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থও বিশেষ ভাবে পড়েছিলেন।

তবে, শরৎচন্দ্র যে ঈশ্বর-বিশ্বাসী, তার ভূরি ভূরি প্রমাণের প্রয়োজন নেই। দুটি চিঠির অংশ-বিশেষ তুলে দিচ্ছি। প্রথমটির অংশ, 'ভগবান আপনাকে কখনো যেন কোন বিশেষ দুঃখ না দেন।

আমি পীড়িত—এখানে সারিবে বলিয়া আর ভরসা করি না। দেহের আর সমস্ত বজায় রাখিয়াও জগদীশ্বর আমাকে পঙ্গু করিয়াই শাস্তি দেন—তাই ভাল।'

দ্বিতীয় পত্রের খণ্ডাংশ—'যদি অদৃষ্ট আমার চিরকালের মত ভাঙিয়াও থাকে, তাহাও যদি জানিতে পারি—তাহা হইলেও ধীরে ধীরে এই মহাদুঃখ বোধকরি সহিয়া যাইবে। হয়ত বা তখন এই পঙ্গু হওয়াটাকেই ভগবানের আশীর্বাদ বলিয়া মনেও করিব এবং স্থির চিত্তে গ্রহণ করিতেও পারিব।'—দুটি চিঠিই

অসুস্থ অবস্থায় হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে রেঙ্গুন থেকে লেখা এবং দুটি চিঠিই শরৎচন্দ্রের ঈশ্বর-বিশ্বাসের উদাহরণ।

শরৎচন্দ্র মনে করতেন যে, মনের যে প্রবৃত্তির দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয় তাই ধর্ম। মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক বা বিকাশক যে বৃত্তি-আচরণ, শরৎচন্দ্রের কাছে তাই মূলতঃ ধর্মের স্বরূপ। মানুষ তার কর্তব্য করবে, নিজেকে এবং সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করবে, হৃদয়ের মহৎ বৃত্তিগুলির যথাযথ অনুশীলন করে কল্যাণব্রতী হবে, এই যুক্তিবাদী ধর্মাচরণে শরৎচন্দ্র তাঁর বহু চরিত্রই সৃষ্টি করেছেন। এইপ্রকার মহৎ জীবন যাপনের ফল যে শান্তি, আনন্দ ও কল্যাণ, এই তৃপ্তিকর অনুভূতিই আলোচ্য ধর্মাচরণের প্রধান লাভ। মানুষের প্রতি কর্তব্য পালনে, মানুষের প্রতি নির্মল প্রেমে এই ধর্মাচরণ হতে পারে।

শরৎচন্দ্রের এই ধর্মচেতনা উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যেও সুপরিস্ফুট। রাজলক্ষ্মী চরিত্রাঙ্কনে শরৎচন্দ্র আচারগত ধর্মানুষ্ঠানের চেয়ে অমলিন প্রেমকে উচ্চস্থান দিয়েছেন। রাজলক্ষ্মী সুনন্দার প্রভাবে আচারগত, অনুষ্ঠানগত ধর্মের দিকে ঝুঁকেছিল, কিন্তু শীঘ্র সে নিজেকে সংশোধন করে নিতে পেরেছিল। বুঝেছিল এতে শান্তি নেই, আনন্দ নেই, কল্যাণ নেই। রাজলক্ষ্মী মনে করেছে তার এই মানুষী ভালবাসার নিষ্ঠাতেই ঈশ্বর প্রসন্ন হবেন। 'তুমি যেদিন এ প্রেম ঈশ্বরকে অর্পণ করবে আনন্দময়ী'—মুরারীপুর আখড়ার দ্বারিকাদাসের এই কথায় রাজলক্ষ্মী তাই চমকে উঠেছিল এবং তাঁর বক্তব্যকে সম্পূর্ণ করতে না দিয়ে বলে উঠেছিল, 'বরঞ্চ আশীর্বাদ করো এমনি হেসে খেলেই একদিন যেন ওঁকে (শ্রীকান্তকে) রেখে মরতে পারি।'

অন্নদাদিদির সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর যে মিল তা হল নিষ্ঠা আর মাতৃত্ব। শাহজীর প্রতি অন্নদাদিদির অবিচল নিষ্ঠায় কোন ছেদ পড়েনি। তাকে নীচ, অধঃপতিত ও উৎপীড়ক বলে যখন সে জানাল তখনও তার ভালবাসা রইল অক্ষুণ্ণ এবং অপরিম্লান। রাজলক্ষ্মীও দীর্ঘ অদর্শনের পরও কুমার সাহেবের শিকার পার্টিতে প্রথম দর্শনেই শ্রীকান্তকে চিনতে পেরেছে। দেখে কামনা বা ভাবাবেগে বিহ্বল হয়ে পড়েনি। প্রিয়পাত্রকে একান্ত সান্নিধ্যে পেয়ে উপভোগ করার বাসনা তার মনে জাগেনি। সে ভেবেছে, শ্রীকান্তের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখা তার ইহজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্ব। কারণ শ্রীকান্ত তার বিবাহিত স্বামী না হলেও যাকে সে বালিকা বয়সে হৃদয়দান করেছিল সেই তার প্রকৃত স্বামী। রাজলক্ষ্মী এবং অন্নদাদিদি উভয়ের মধ্যেই শরৎচন্দ্র রমণী

প্রেমের একটি আদর্শ রূপ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। রমণীর প্রেমে ব্যক্তিগত সুখ কামনার চেয়ে দয়িতের সুখ কামনাই প্রবলতর এবং তা অনেক সময় আরও বৃহত্তর পরিমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হয়।

রাজলক্ষ্মী তার সংস্কার, সামাজিকবোধ ও বুদ্ধির চাপে শ্রীকান্ত থেকে অনেকবার নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে, কিন্তু ভালবাসার টানে, অন্তরের আকর্ষণে সে এইভাবে দূরে থাকতে পারেনি। উপন্যাসের চারটি পর্বে শরৎচন্দ্র রাজলক্ষ্মীর প্রেমের মহিমাই শুধু প্রতিষ্ঠিত করেননি, জাগতিক ভাবে প্রেমকে জয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। মানবতাবাদী শরৎচন্দ্রের হাতে শেষ পর্যন্ত প্রেমের জয় ঘোষিত হয়েছে।

বজ্রানন্দ শ্রীকান্তের কাছে এক নতুন মানুষ হিসাবে দেখা দিয়েছিল। সন্ন্যাসীর এই নব-মূল্যায়ণ শ্রীকান্ত তথা শরৎচন্দ্রও বিচিত্র ধর্ম-চেতনার অবদান। শ্রীকান্তরূপী শরৎচন্দ্রের তাই আনন্দ সম্পর্কে উক্তি, 'সে ভগবানের সন্ধানে বার না হলেও মনে হয় যার জন্য পথে বেরিয়েছে সে তারই কাছাকাছি, অর্থাৎ আপনার দেশ।' এখানে দেশ অর্থাৎ দেশের মানুষের প্রতি ভালবাসাই ভগবদ্ভক্তি। ভগবানের সৃষ্টির কল্যাণে আত্মসমর্পণ তাই আনন্দর সার্থক হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের লেখায় ধর্মের শুষ্ক আচার অনুষ্ঠানের দিকটি বারংবার নিন্দিত হয়েছে, ভণ্ডামি ও গোঁড়ামির বিরূদ্ধে বহু মন্তব্য আছে এবং ভগবানের মহিমা নিয়েও তিনি কমই গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লিখেছেন। তাই অনেকেরই ধারণা ছিল শরৎচন্দ্র নাস্তিক; কিন্তু তা অসত্য। শরৎচন্দ্রের ভগবদ্বিশ্বাসের সুদৃঢ় প্রকাশ চতুর্থ পর্বেও পাওয়া যাবে। কমললতা শূন্য হাতে চিরবিদায় নিয়েছে শুধু ভগবানের উপর একান্ত ভরসা রেখে। শ্রীকান্ত যখন কমললতাকে টাকা দিতে যায় তখন কমললতার উক্তি, 'না গোঁসাই, টাকা আমার চাইনে, যাঁর শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পন করেচি তিনি আমাকে ফেলবেন না। যেখানেই যাই সব অভাব তিনি পূর্ণ করে দেবেন।' (পৃঃ ৭০০) কমললতার এই স্নিগ্ধ প্রত্যয় শ্রীকান্তকে অভিভূত করেছে। প্রথম পর্বের ইন্দ্রনাথও পরম আস্তিক কিশোর। রাম নামে ভূতের দৌরাত্ম দূর হয় তা বিশ্বাস করে এবং মা কালীর প্রতিও তার অখণ্ড আস্থা।

মোটের উপর শরৎচন্দ্রের ধর্ম-চেতনা সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায়, তিনি আস্তিক্যবাদী এবং নৈতিকতার ও মানবতাবোধের স্থান আচার-সংস্কারের চেয়ে অনেক উপরে দিতেন। তিনি ধার্মিক এবং ভগবৎ-বিশ্বাসী

ছিলেন। তবে তাঁর মতে ধর্ম অন্তরের জিনিস, ধর্ম সত্যকে সন্ধান করে। প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রের ভগবৎ-অনুভূতি সত্য-শিব-সুন্দরের অনুভূতির সঙ্গে প্রায় এক হয়ে গিয়েছিল।

রাজনৈতিক চেতনা

> The good of man must be the end of the science of politics'
>
> —Aristotle.

তৎকালে যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই পরাধীনতার গ্লানি সহ্য করতে না পেরে রাজনীতিতে এগিয়ে আসতেন। শরৎচন্দ্রের পক্ষেও রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া স্বাভাবিক ছিল। অবশ্য সক্রিয় রাজনীতিতে আত্মনিয়োগের অবশ্যম্ভাবী দায়-দায়িত্ব ও ঝঞ্ঝাট পোয়াতে ক্লান্ত বা বিরক্ত হওয়া শরৎচন্দ্রের মত ভাবপ্রবণ সাহিত্যিকের পক্ষে আশ্চর্য নয়। কিন্তু তবু দেশমাতৃকার পরাধীনতার বেদনা তাঁর অন্তরকে মথিত করেছিল বলে তিনি সংগ্রাম থেকে নিজেকে একেবারে সরিয়ে নিতে পারেননি। তিনি দীর্ঘকাল (প্রায় ষোল বছর) হাওড়া কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় কংগ্রেসেরও সদস্য ছিলেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর রাজনৈতিক চেতনা কার্যকরী হয়েছে। সাহিত্যে নিছক শিল্প চর্চা না করে আপন কালের স্বদেশে ও স্বদেশের সমাজ সম্পর্কে সচেতন মন তাঁর লেখনীর মধ্যে জাগ্রত থেকেছে।

শরৎচন্দ্র রাজনৈতিক তত্ত্বাদি সম্পর্কে পণ্ডিত ছিলেন না, পৃথিবীর বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞও ছিলেন না; তাই তাঁর রচনায় রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ সর্বক্ষেত্রেই বলিষ্ঠ হয়নি। তবু যেখানেই প্রাসঙ্গিকতার সুযোগ মিলেছে সেখানেই শরৎচন্দ্রের লেখায় তাঁর রাজনৈতিক চেতনার স্পর্শ লক্ষ্য করা গেছে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসও তার থেকে বাদ পড়েনি।

শরৎচন্দ্র প্রথমে জীবন-প্রেমিক গল্পকার তারপর রাজনৈতিক প্রবক্তা। তাই 'শেষ প্রশ্ন', 'শ্রীকান্ত', 'বিপ্রদাস' প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাসেও তাঁর রাজনৈতিক চেতনার কিছু কিছু স্পর্শ আছে মাত্র। 'পথের দাবী'র মত মূলতঃ রাজনৈতিক

উপন্যাস পড়লেও তার মধ্যে হৃদয়বাদী সামাজিক কথা-সাহিত্যিককে খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না। অপূর্ব-ভারতীর প্রেম, নয়নতারার প্রতি শশীকবির হৃদয়ানুরাগ, এমন কি সব্যসাচীর প্রতি সুমিত্রার দুর্বলতা প্রভৃতি দুর্বল মনের রসোজ্জ্বল ছবিগুলি রাজনৈতিক উপন্যাসের উত্তপ্ততার পিছনে স্নিগ্ধ স্পর্শ বুলিয়ে দেয়। শরৎচন্দ্রের মাতৃধর্মী মমতা আর সমসাময়িক পাঠকের অত্যুৎকণ্ঠায় মিলে গড়ে উঠেছিল 'পথের দাবী'র ঐতিহাসিক ভিত্তি। তা না হলে এই উপন্যাসেরও বাস্তব-প্রচ্ছদ তথ্য-দুর্বল। 'পথের দাবী'র আস্তানা যেন বিচিত্র স্বভাব নরনারীর মন দেওয়া-নেওয়ার পীঠভূমি,—ভারতী-অপূর্ব, শশীকবি-নয়নতারা, সুমিত্রা-ব্রজেন্দ্র-সব্যসাচীর প্রণয় জটিলতা উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা প্রাণ-দীপিত অংশ। তবুও, রাজনৈতিক উপন্যাস হিসাবে সারা জাতির এমন আন্তরিক অনুমোদন 'আনন্দমঠ' ছাড়া আর কোন উপন্যাসের ভাগ্যে আগে জোটেনি। এবং এ কথাও ঠিক, শরৎচন্দ্রের কাল পর্যন্ত তিনি ছাড়া আর কোন বড় বাঙালী সাহিত্যিক ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এ রকম প্রত্যক্ষভাবে বিক্ষোভ সৃষ্টির প্রয়াসী হননি। 'পথের দাবী'তে শাসক ও শোষক ইংরেজদের সম্পর্কে নানান্ বক্তব্য এবং ঘৃণা আছেই, কিন্তু 'শ্রীকান্ত' প্রেমের কাহিনী, তবু সুবিধা পেলেই শরৎচন্দ্র এই হৃদয়-প্রধান উপন্যাসেও আপন রাজনৈতিক ক্ষোভের স্বাক্ষর স্থানে স্থানে রেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'নাইটহুড' ত্যাগে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে তিনি গভীর শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু এই ঋষিতুল্য ও সর্বজনপূজ্য ব্যক্তিও যখন ইংরেজদের দেওয়া উপাধি ত্যাগ করলেন না তখন তিনি খুবই ব্যথিত হয়েছিলেন। রাজনীতিবিদদের মধ্যে শরৎচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, নির্মলচন্দ্র, হেমেন্দ্রকুমার সরকার ও ডাঃ যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্তের সঙ্গে।

কংগ্রেস আন্দোলনের সকল কর্মসূচীতে শরৎচন্দ্রের আস্থা ছিল না। চরকায় সুতা কেটে দেশ স্বাধীন করার পিছনে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। খদ্দর তিনি পরতেন কেবল কংগ্রেসের নিয়ম রক্ষার খাতিরে, অবশ্য বিলাতি পণ্য বর্জনে তাঁর উৎসাহ ছিল। বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল এবং গোপনে তিনি এঁদের সাহায্যও করতেন।

১৯২০ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত শরৎচন্দ্র যে সকল রচনা লিখেছিলেন সেগুলির মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক চেতনা ও গণচেতনা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। অবশ্যই রাজনৈতিক চেতনার সর্বাপেক্ষা সার্থক রূপায়ণ হয়েছিল 'পথের দাবী'

উপন্যাসে। শরৎচন্দ্র নিজে অহিংস কংগ্রেসসেবী হলেও এই উপন্যাসে তিনি বিপ্লববাদ ও শ্রমিক আন্দোলনই সমর্থন করেছিলেন।

দেশবন্ধুর প্রিয়পাত্র, সুভাষচন্দ্রের শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র—বহু সভায় সভাপতিত্ব করেছেন, ছাত্র ও যুবকদের উদ্বুদ্ধ করেছেন, কিন্তু কোন সময়েই বড় নেতৃত্বদান করতে পারেননি। তাঁর নেতৃত্বদান করতে না পারার প্রধান কারণ ছিল বক্তৃতা করার অক্ষমতা। লেখনীর শক্তিতে জনপ্রিয়তার যে শিখরে তিনি পৌঁছেছিলেন, রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়ে তার ভগ্নাংশমাত্র সাফল্যও অর্জন করতে পারেননি। বস্তুত, রাজনৈতিক জীবনে তিনি ছিলেন ঘরের ভিতরের, পরামর্শ সভার লোক অর্থাৎ তাঁর সত্যকার ভূমিকা ছিল নেপথ্য সৈনিকের।

'শ্রীকান্ত' প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব যখন লেখা হয় তখন শরৎচন্দ্রের মনে কিছুটা রাজনৈতিক চিন্তা দানা বেঁধে ওঠে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন বটে কিন্তু পূর্ব থেকেই দেশ কাল সম্পর্কে তাঁর একটা চিন্তা বা মতবাদ অবশ্যই ছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনা খুব সূক্ষ্ম ছিল—এ কথা বলা চলে না। তাঁর রাজনৈতিক চেতনা তাঁর সামাজিক চেতনার মতই স্পর্শকাতর ছিল। তাঁর চিন্তায় বা সাহিত্যকৃতিতে প্রাণের আবেগ অথবা ভাবের আবেগের ছাপ অত্যন্ত বেশী। মহামতি মার্কস এবং লেনিনের নাম ভারতে তখন অপরিচিত নয়, তাঁদের চিন্তাধারা তাঁর রাজনৈতিক চেতনাকে কতখানি আলোড়িত করেছিল তার কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য-সমৃদ্ধ বিবরণ দেখা যায় না। সামতাবেড়েয় শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত পাঠাগারের যে গ্রন্থ-তালিকা শ্রীযুক্ত তারাপদ সাঁতরা প্রকাশ করেছেন তাতে দেখা যায় Karl Marx-এর The Civil War in France এবং Trotsky ও Valerin Marcu-র Lenin গ্রন্থ তিনটির উল্লেখ রয়েছে।

'পথের দাবী'র মত গ্রন্থ যিনি রচনা করেছেন, সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে যোগ না থাকলেও তাঁর কোন সহানুভূতি ছিল না, এ কথা ভাবতেও অস্বস্তি লাগে। কিন্তু কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে উপন্যাসে, প্রবন্ধে, ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে শরৎচন্দ্রের এর প্রতি সমর্থন আছে।

বস্তুতঃ, সশস্ত্র বিপ্লবের সম্পর্কে শিল্পীর কোন প্রত্যক্ষ ধারণা ছিল না। ১৯২০-র পর থেকে বরং অহিংস অসহযোগের সূত্রে কংগ্রেস আন্দোলনে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন; 'পথের দাবী' রচনার সময়েও তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। তাহলেও বিপ্লবীদের সম্পর্কে কেবল মমতা নয়; শ্রদ্ধাও ছিল

তাঁর আবেগোদ্বেল।

তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে কখনো কখনো ভিন্নতর রাজনৈতিক মতাবলম্বী-দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন এবং মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব থেকেই যেন গান্ধীজির রাজনীতির প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিলেন, অথচ সমাজতন্ত্রের নিষ্ঠাশীল পাঠক শরৎচন্দ্র রুশ বিপ্লবের দু-দশক পরে লোকান্তরিত হলেও কার্ল মার্কস বা লেনিনের নাম পর্যন্ত কোথাও কখনও উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। তাই রাজনীতিজ্ঞ বলতে সাধারণত ঠিক যা বোঝায় শরৎচন্দ্র সেই শ্রেণীর Politician ছিলেন না, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক চেতনা নিঃসন্দেহেই নির্ভেজাল ছিল।

রাজনীতির পথ উপন্যাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বন্ধুর, কিন্তু দেশাত্মবোধের প্রবল প্রেরণায় তিনি এই কঠিন পথে চলবার চেষ্টা করেছেন। পরাধীন মাতৃভূমির এবং অসংখ্য শোষিত অসহায় স্বদেশবাসীর কথা ভেবে শরৎচন্দ্রের মন অস্থির হয়ে উঠেছিল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্ব প্রকাশ পেল। 'শ্রীকান্ত' মূলতঃ প্রেম-কাহিনী হলেও শরৎচন্দ্র এই গ্রন্থতেও আপন রাজনৈতিক ক্ষোভের প্রকাশ ঘটালেন।

তৃতীয় পর্ব-তে গঙ্গামাটি গ্রামে জনসেবক সন্নাসী বজ্রানন্দ শ্রীকান্তকে, সাধারণ মানুষ প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের চাপে কিরূপ নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে, তার কথা বলেছে। চারিদিকের দারিদ্র ও হীনতা, ম্রিয়মান সাধারণ মানুষের মনে অবসাদ সৃষ্টি করে এবং তারা কর্মোৎসাহ হারিয়ে ক্রমে জড়তা লাভ করে। তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে আপাত সুবিধার প্রলোভনে সচেতনতা হারিয়ে তারা নিজেদের ছোট করেও ফেলে। উপন্যাসে পাই, 'সাধুজী বলিলেন, আমাদের মত যদি সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন দাদা, তা'হলে বুঝতেন আমি প্রায় সত্যি কথাটাই বলেছি। দুঃখটা কে ভোগ করে দাদা? মন ত? কিন্তু সে বালাই কি আমরা আর এদের রেখেছি? বহুদিনের অবিশ্রাম চাপে একেবারে নিঙড়ে বার করে দিয়েছি। এর বেশি চাওয়াকে এখন নিজেরাই এরা অন্যায় স্পর্দ্ধা বলে মনে করে। বাঃ রে বাঃ! কি কলই না আমাদের বাপ-পিতামহরা ভেবে ভেবে আবিষ্কার করে গিয়েছিলেন। (পৃঃ ৩৫৪)

এরও পূর্বে, তৃতীয় পর্বের প্রথম দিকের কথা বলি। যখন শ্রীকান্ত রাজ-লক্ষ্মীর সঙ্গে স্বগ্রাম থেকে বিদায় নিল, তখন শ্রীকান্তর মন বিষাদে পরিপূর্ণ। শ্রীকান্তর কাছে তার গ্রাম সুন্দর। শ্রীকান্ত পথে যেতে যেতে ভাবছে যে এই পথেই একদিন তার পিতামহী, তার মা বধূবেশে এসেছিলেন এবং এই পথ

দিয়েই তাঁরা শ্মশান যাত্রা করেছেন। এই আবেগ-মথিত স্মৃতি মন্থনের মাঝখানে হঠাৎ শ্রীকান্তরূপী শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ৩২১ পৃষ্ঠায় তিনি লিখলেন, 'তখনও এই পথ এমন নির্জ্জন, এমন দুর্গম হইয়া যায় নাই, তখনও বোধকরি, ইহার বাতাসে বাতাসে এত ম্যালেরিয়া, জলাশয়ে জলাশয়ে এত পঙ্ক, এত বিষ জমা হইয়া উঠে নাই। তখনও দেশে অন্ন ছিল, বস্ত্র ছিল, ধর্ম ছিল—তখনও বোধহয় দেশের নিরানন্দ এমন ভয়ঙ্কর শূন্যতায় আকাশ ছাপাইয়া ভগবানের দ্বার পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠে নাই।'

শরৎচন্দ্র শাসক ও শোষক ইংরেজদের কি রকম ঘৃণা করতেন এই উপন্যাসের আরও কয়েকটি উদ্ধৃতি থেকে উপলব্ধি করা যাবে। তৃতীয় পর্বেই অন্ধকারে বসে সাধু বজ্রানন্দ বাঙলার পল্লী অঞ্চলের দারিদ্র রিক্ততার কথা বলছিল শ্রীকান্তকে। শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তর মাধ্যমে বিদেশী রাজশক্তি শোষিত হতভাগ্য গ্রাম বাঙলার বর্ণনা করলেন—'এই পরিপূর্ণ স্তব্ধতার মাঝে তাহারই মুখ দিয়া কেবল দেশের অজ্ঞাত ভাই ভগিনীর অসহ্য বেদনার ইতিহাস যেন ঝলকে ঝলকে জ্বলিয়া জ্বলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে! এই সোনার মাটি কেমন করিয়া ধীরে ধীরে এমন শুষ্ক, এমন রিক্ত হইয়া উঠিল, কেমন করিয়া দেশের সমস্ত সম্পদ বিদেশীর হাত দিয়া ধীরে ধীরে বিদেশে চলিয়া গেল, কেমন করিয়া মাতৃভূমির সমস্ত মেদ-মজ্জা-রক্ত বিদেশীরা শোষণ করিয়া লইল, চোখের উপর ইহার জ্বলন্ত ইতিহাস ছেলেটি যেন একটি একটি করিয়া উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতে লাগিল।' (পৃঃ ৩৪৬)

শ্রীকান্ত, সতীশ ভরদ্বাজের কলেরায় মৃত্যুর পর গঙ্গামাটিতে ফিরছে, দুজন গ্রামবাসী তাকে তাদের গ্রামে দুপুরে খেয়ে যাবার জন্য আমন্ত্রণ করল। গল্প করতে করতে তারা ইংরেজ রাজত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করেছে—'পথে এই বিষয়েই আলাপ হইতে লাগিল। পাড়াগাঁয়ের লোক, সহরের শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা তাঁহাদের ছিল না, কিন্তু মজা এই যে, ইংরাজ রাজত্বের খাঁটি পলিটিক্সটুকু তাঁহাদের অপরিজ্ঞাত নয়। এ যেন দেশের লোকে দেশের মাটি হইতে, জল হইতে, আকাশ হইতে, বাতাস হইতে অস্থি-মজ্জা দিয়া সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে।

উভয়েই কহিলেন,······কোম্পানী বাহাদুরের সংস্পর্শে যে আসবে সে-ই চোর না হয়ে পারবে না। এমনি এঁদের ছোঁয়াচের গুণ। ···কি দরকার ছিল মশাই দেশের বুক চিরে আবার একটা রেললাইন, পাতবার? কোন

লোকে কি চায়? চায় না; কিন্তু তবু চায়! দীঘি নেই, পুকুর নেই, কুয়ো নেই, কোথাও এক ফোঁটা খাবার জল নেই, গ্রীষ্মকালে গরু-বাছুরগুলো জলাভাবে ধড়ফড় করে মরে যায়; ...ম্যালেরিয়া, কলেরা, হর-রকমের ব্যাধি পীড়ায় লোক উজাড় হয়ে গেল, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! কর্ত্তারা আছেন শুধু রেলগাড়ী চালিয়ে কোথায় কার ঘরে কি শস্য জন্মেছে শুষে চালান করে নিয়ে যেতে!'

শ্রীকান্ত তখন ভাবছে, 'কেবলমাত্র এই জন্যই তেত্রিশ কোটি নরনারীর কণ্ঠ চাপিয়া বিদেশীয় শাসনতন্ত্র ভারতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শুদ্ধ মাত্র এই হেতুই ভারতের দিকে দিকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে রেলপথ বিস্তারের আর বিরাম নাই। বাণিজ্যের নাম দিয়া ধনীর ধনভাণ্ডার বিপুল হইতে বিপুলতর করিবার এই অবিরাম চেষ্টায় দুর্ব্বলের সুখ গেল, শান্তি গেল, অন্ন গেল, ধর্ম গেল—তাহার বাঁচিবার পথ দিনের পর দিন সঙ্কীর্ণ ও নিরন্তর বোঝা দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিতেছে—এ সত্য ত কাহারও চক্ষু হইতেই গোপন রাখিবার যো নাই। (পৃ ৪৩৬-৩৭)

চতুর্থ পর্ব থেকেও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। শ্রীকান্ত গ্রামের স্টেশনে হঠাৎ মুসলমান বাল্যবন্ধু গহরের সঙ্গে দেখা হওয়াতে তাদের বাড়ি এসেছে। কিন্তু গ্রামের রাস্তার দুর্গতি দেখে শ্রীকান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে, 'বাদশাহী আমলের রাজবর্ত্ম—অতিশয় সনাতন। ইট-পাথরের পরিকল্পনা এদিনের জন্য নয়; সে দুরাশা কেহ করে না, কিন্তু সংস্কারের সম্ভাবনাও লোকের মন হইতে বহুকাল পূর্ব্বে মুছিয়া গিয়াছে। গ্রামের লোকে জানে অনুযোগ অভিযোগ বিফল—তাহাদের জন্য কোনদিনই রাজকোষে অর্থ নাই—তাহারা জানে পুরুষানুক্রমে পথের জন্য শুধু 'পথকর' যোগাইতে হয়, কিন্তু সে পথ যে কোথায় এবং কাহার জন্য এ সকল চিন্তা করাও তাহাদের কাছে বাহুল্য।' (পৃঃ ৪৯৮)

এইভাবে শোষক সরকারকে শ্রীকান্ত তথা শরৎচন্দ্র ধিক্কার জানিয়েছেন। উপন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে যখনই সুযোগ এসেছে শরৎচন্দ্র বিদেশী শাসককে নিন্দা করতে এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ করেননি। ঔপন্যাসিক হিসাবে আর্ট বা শিল্পকলার দিকে না তাকিয়েই দেশপ্রেমিক শরৎচন্দ্র দেশের দুর্গতির কথা বলেছেন এইভাবে। কারণ সাহিত্যে তিনি উচিত বক্তা ছিলেন।

শরৎচন্দ্র সাহিত্য ছেড়ে যখন রাজনীতিতে যোগদান করেন, সেই সময়ে কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধু তাঁকে রাজনীতিতে নামতে নিষেধ করেন, তাঁরা

বলেন সাহিত্য ছেড়ে রাজনীতিতে যোগদান করা তাঁর পক্ষে ঠিক হয়নি। এর উত্তরে শরৎচন্দ্র সত্যই যোগ্য উত্তর দিয়েছিলেন তাঁদের ; তিনি বলেছিলেন, 'এটা তোমাদের ভুল ; রাজনীতির আলোচনায় যোগ দেওয়া প্রত্যেক দেশ-বাসীরই অবশ্য কর্তব্য বোলে আমি মনে করি। বিশেষতঃ আমাদের দেশ হ'ল পরাধীন দেশ, এ দেশের রাজনীতিক আন্দোলন প্রধানতঃ স্বাধীনতার আন্দোলন, মুক্তির আন্দোলন! এ আন্দোলনে সাহিত্য-সেবীদেরই তো সর্বাগ্রে এসে যোগ দেওয়া উচিত। কারণ জাতিগঠন ও লোকমত সৃষ্টির গুরুভার পৃথিবীর সর্বদেশে সাহিত্যিকদের উপরই ন্যস্ত। যুগে যুগে মানুষের মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলেন তাঁরাই। তোমাদের নির্দেশমত সাহিত্যিকরা যদি বলেন—'আমি সাহিত্যিক সাহিত্য নিয়েই থাকবো, রাজনীতিতে যোগ দেব না, তাহলে উকিল-ব্যারিস্টাররাও তো বলতে পারেন—আমরা আইন-ব্যবসায়ী মামলা-মোকর্দমা নিয়েই থাকবো, রাজনীতিতে যোগ দেব না। ছেলেরা বলবে—আমরা ছাত্র, পড়াশুনা নিয়েই থাকবো, রাজনীতির মধ্যে যাব না ; তাহলে রাজনীতিটা করবে কারা শুনি?"
(শরৎচন্দ্র, প্রথম খণ্ড, গোপালচন্দ্র রায়, পৃঃ ১৬৯)

রাজনীতিতে যোগদান সম্পর্কে তাঁর এই বলিষ্ঠ মতবাদ সত্বেও আমরা জানি ব্যক্তিজীবনে শরৎচন্দ্র রাজনীতি ক্ষেত্রে যতটা না সফল হয়েছেন তার চেয়েও তাঁর সাহিত্যেই তাঁর দেশের প্রতি ভালবাসার পরিচয় অধিক জীবন্ত হয়ে আছে। এবং সংসারে যারা শুধু দিলে, যারা বঞ্চিত, উৎপীড়িত তাদের কথাও তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। এমন মানুষ যে পরাধীনতার গ্লানি সহ্য করতে পারবেন না, তা তো জানা কথাই। তাই তো তাঁর 'পথের দাবী' গ্রন্থের উপর রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠিতে তিনি মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের পত্রের প্রতিবাদে শরৎচন্দ্রের তিক্ততা প্রকাশ পেয়েছিল।

এছাড়া, শরৎচন্দ্র শেষ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কথাও ভেবেছিলেন ; তাই গান্ধীজি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, 'তাঁর আসল ভয় সোশিয়েলিজমকে। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন ধনিকরা, ব্যবসায়ীরা। সমাজতান্ত্রিকদের তিনি গ্রহণ করবেন কি করে? এইখানে মহাত্মার দুর্বলতা অস্বীকার করা চলে না।' ('নাগরিক', ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, শারদীয় সংখ্যা) তৎকালীন রাজনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনেক ব্যাপারেই শরৎচন্দ্রের ভাবনার মধ্যে কিছুটা স্ববিরোধিতা ছিল এটা যেমন ঠিক, তেমনি চিন্তার দিক থেকে, বলা বাহুল্য, তিনি বেশ

প্রগতিশীলই ছিলেন। তাঁর ভেতরের মানুষটা ছিল দুঃখীর দোসর, দরিদ্রের সুহৃদ, নিগৃহীতের সেবক ও সহযাত্রী। অর্থাৎ সুখের মানুষ ও মনের মানুষে তাঁর মধ্যে কিছুটা গরমিল লক্ষ্য করা গেছে। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথে দেশকে স্বাধীন হতে হবে, অহিংসা ও সত্যাগ্রহে কিছু হবে না, এ কথা হামেশাই বলতেন। মনে মনে গান্ধীপন্থীর সমর্থক ছিলেন না, অথচ ছাত্র-যুবকদের অনেক সময়েই বিনা রক্তপাতে ভালবাসা দিয়ে সকল বাধা সমস্ত বিরোধিতাকে জয় করতে নির্দেশ দিতেন। অর্থাৎ দুটি মতেই ছিল অল্পাধিক আস্থা। তাঁর অবেগাপ্লুত মনে যা কিছু মানব মঙ্গলের সহায়ক রূপে প্রতিভাত হ'ত তাই তিনি আঁকড়ে ধরতেন। তাই বলা যেতে পারে যে, উনিশ শতকী মানবতাবাদেই অভিষিক্ত ছিল তাঁর মন, কিন্তু বিশ শতকের বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা ও রাজনীতিক তথা অর্থনীতিক তত্ত্ব চিন্তাগুলি তাঁকে স্পর্শ করলেও, সামগ্রিকভাবে প্রভাবিত করেনি। অবশ্য তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সাম্য, স্বাধীনতা ও অগ্রগতির সমর্থক। শরৎচন্দ্র তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় প্রগতিশীল মতবাদের দিকে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন—যুগসত্যকে ধারণ করার চেষ্টা করছিলেন—এটাই তাঁর জীবনের গতিশীলতা।

এই দেশপ্রেমিক সম্পর্কে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি, 'মজুর আন্দোলনকে জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের অংশ হিসাবে দেখা ও তাকে উপন্যাসের বিষয়বস্তুর অঙ্গীভূত করা—আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে এ কাজ সর্বপ্রথম করেছেন শরৎচন্দ্র।' সত্যই মানব কল্যাণের ব্যাপারে তিনি ছিলেন ধৃতব্রত সাহিত্যিক। কাপট্য, মিথ্যা ও অশুচিতার বিরোধী শরৎচন্দ্র, মানুষ হিসাবে অনন্য ছিলেন বলেই তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন।

প্রণয় ও বিবাহ

'প্রেমের কাঙাল তুমি, পাও নাই প্রাণের দোসর—
তাই ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে যাহা কিছু এসেছে সম্মুখে
ব্যগ্র তব ভালবাসা ;' —শ্রীসজনীকান্ত দাস।

শরৎচন্দ্রের প্রণয় ভাগ্য ছিল মন্দ। প্রথম যৌবন থেকেই তিনি প্রায় ব্যর্থ হয়েছেন। প্রণয়ে ব্যর্থ হওয়ার কারণ এই নয় যে তাঁর ভালবাসায় কোন খাদ ছিল। নারীর প্রতি ভালবাসার অফুরন্ত উৎস ছিল তাঁর হৃদয়ে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল আঘাত, বেদনা ও নৈরাশ্য। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রথম জীবনের ভালবাসার পাত্রী ছিলেন বিধবা। এই ব্যর্থ প্রেমের বেদনা শরৎচন্দ্রের হৃদয় চূর্ণ করে দিয়েছিল বলেই সুরেন্দ্রনাথ, রমেশ, সতীশের মত চরিত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, যারা প্রত্যেকেই বিধবা নারীকে ভালবেসে জীবনে শুধু নিস্ফলতা ও নৈরাশ্যই বরণ করেছে।

শরৎচন্দ্রের মত এমন গুণী মানুষটির একটি মাত্র অভাবই তাঁর জীবনটিকে পাক খাইয়েছে। সে অভাবটি হচ্ছে প্রচণ্ড অর্থাভাব। যে অর্থের অভাবে পরীক্ষার 'ফি' পর্যন্ত জমা দিতে পারেননি ; নিশ্চিন্তে দু-বেলা দুটি খাওয়া পর্যন্ত জোটেনি। পিতা মতিলালের উদাসীনতা ও গৃহের দারিদ্র শরৎচন্দ্রের গৃহ-জীবনকে মোটেই সুখী করতে পারেনি। সেই কারণে বাল্যকাল থেকেই তাঁর মন ছিল বহির্মুখী। নিরানন্দ গৃহের সন্তানরাই বহির্মুখী হয়ে থাকে। কারণ ঘর ছেড়ে বাইরেই তারা আনন্দ খোঁজে এবং বালসুলভ চাপল্যে নানা অকীর্তি-কুকীর্তি করে জীবনের অভাবকে পূর্ণ করে। শরৎচন্দ্রেরও এই দুরন্তপনা ও ছন্নছাড়া ভাবের মধ্যে তাঁর অসুখী অন্তর সুস্পষ্টভাবে পরবর্তী কালে ফুটে উঠেছে। যাত্রা দলে গান ও অভিনয় করা, বৈষ্ণব আখড়ায় যাওয়া, সন্ন্যাসী হওয়া ও সর্বোপরি বর্মাবাসী হওয়াই এর কারণ। এর উপর আবার মাতা-পিতার মৃত্যু। এই সকল ছন্নছাড়া কাজের মধ্যে তাঁর অন্তর যে পরিতৃপ্তি পেতে চেয়েছিল তার হেতু মনের গোপন কোণে একটা না-পাওয়ার বেদনা তাঁকে অহরহ অস্থির ও চঞ্চল করে তুলত। কাজেই এমন মানুষ যে নারীর

প্রণয়-প্রার্থী হবে, মনের এই বেদনা লাঘবের জন্য একজন জীবন-সঙ্গিনী খুঁজবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।

এ হেন মানুষের জীবনে যদি প্রথমেই কোন শিক্ষিতা শ্রীময়ী নারী আসত তবে বাংলা সাহিত্য বোধ করি অধিকতর সৌভাগ্যশালী হত। শরৎচন্দ্র অবশ্য দুইবার বিবাহ করেন। মাত্র দুই বৎসর প্রথমা পত্নীর সঙ্গে বিবাহিত জীবন যাপন করার পর শান্তি দেবী প্লেগ রোগাক্রান্ত হয়ে রেঙ্গুনেই মারা যান। তার কয়েক বৎসর পরই তিনি হিরণ্ময়ী দেবীকে বিবাহ করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই দ্বিতীয়া পত্নীর সাথেই সুখে ও শান্তিতে কাটিয়েছিলেন। এই অশিক্ষিতা গ্রাম্য বধূটি তাঁর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেমের বাঁধনে ভবঘুরে শরৎচন্দ্রকে সংসারে আবদ্ধ করতে পেরেছিলেন বলেই, পরে শরৎচন্দ্রের জীবনে সাধনার পথ সহজ ও সুগম হয়েছিল। যদিও তিনি অত্যন্ত স্বামী সেবাপরায়ণা কোমল-হৃদয়া নারী ছিলেন তবুও একজন প্রতিভাধর সাহিত্যিকের যোগ্য সহধর্মিনী হিসাবে তাঁকে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু এহেন অশিক্ষিতা নারীর প্রতিও শরৎচন্দ্রের অসীম ভালবাসা ছিল।

শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের প্রণয়ের কথা অনেকেই অনেক স্থানে বেশ রসালো করে লিখেছেন, কিন্তু অনেকটাই যে মিথ্যা তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা বর্তমানে সম্ভব হয়েছে। রেঙ্গুনে বসবাসকালীন গায়ত্রী দেবীর প্রণয়ে পড়ার পূর্বে ভাগলপুরবাসী বিভূতিভূষণের (পুঁটু) ভগিনী নিরুপমা দেবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। পরবর্তী কালের এই মহিলা সাহিত্যিক যে শরৎচন্দ্রেরই হাতে গড়া মানুষ, তা অনেকেই জানেন। নিরুপমা দেবী বালবিধবা। শরৎচন্দ্রের বহু চিঠিপত্রেও এই নিরুপমা দেবীর (বুড়ি) উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বালবিধবা ভদ্রমহিলা শরৎচন্দ্রের মনে আজীবন স্থায়ী আসন করে নিয়েছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভদ্র সমাজের নামজাদা ঘরের একজন সম্মানিতা বালবিধবাকে বিবাহ করা তো দূরের কথা, সেদিনকার ছন্নছাড়া, ভবঘুরে, সর্বোপরি দরিদ্র একটি যুবকের পক্ষে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়াটাও ছিল অত্যন্ত কঠিন এবং তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় লজ্জাকর ও দুঃসাহসিক প্রস্তাব। তাই শরৎচন্দ্র হৃদয়ে একটি চাপা ব্যথা আজীবন বহন করে বেড়িয়েছেন। আর এই বেদনাই তাঁর অধিকাংশ বিধবা চরিত্রগুলির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছে। এই নিরুপমা দেবীর দাদা (বিভূতিভূষণের মেজদা) ইন্দুভূষণ শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। সুতরাং এ কথাই ঠিক যে, শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের প্রণয়িণী এই সুশিক্ষিতা ভদ্র-

মহিলাটিই, যাঁকে আজীবন শরৎচন্দ্র সংগোপনে হৃদয়ে ধরে রেখেছিলেন।

প্রথম জীবনের এই প্রেমের ব্যর্থতার জ্বালাই তাঁকে অসংযমী, ভবঘুরে এবং ঘরছাড়া করেছিল। ভাগলপুরে শরৎচন্দ্র যেমন লেখাপড়া ও সাহিত্য চর্চা করেছিলেন তেমনটি প্রায় সুদীর্ঘকাল আর করেননি। বড়দিদি, দেবদাস, চন্দ্রনাথ, অনুপমার প্রেম, কাশীনাথ, শুভদা, হরিচরণ, বাল্যস্মৃতি, পাষাণ, অভিমান প্রভৃতি লেখার পর আনুমানিক প্রায় বারো বৎসর সাহিত্য চর্চা থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। এই প্রণয়ে ব্যর্থতা শ্রীকান্তের জীবনে তাই তিনি দেখাননি। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে শ্রীকান্তের পরিচয় সূত্রটি শরৎচন্দ্র তাঁর বাল্যজীবনে দেবানন্দপুরের পাঠশালার চিত্র তুলে এবং কিছুটা কল্পনার আশ্রয় নিয়ে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু রাজলক্ষ্মী চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর জীবনে পাওয়া ও না-পাওয়া দুটি চরিত্রের (হিরণ্ময়ী ও নিরুপমা) ছাপ কেমন করে রেখাপাত করেছে তা পরে আলোচনা করেছি।

শরৎচন্দ্রই এক জায়গায় লিখেছেন, 'যাহার হৃদয়ে ভালোবাসা আছে, সে ভালোবাসিতে জানে, সে ভালোবাসিবেই।' এটি শরৎচন্দ্রের মনের কথা এবং তাঁর নিজের জীবনেও অত্যন্ত সত্য কথা। তাঁর 'শেষ প্রশ্নে'র কমলও এই বক্তব্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভালবাসা অপরিবর্তনীয় নয়, তাই প্রেমের কাঙাল শরৎচন্দ্রের যখন প্রাণের দোসর মেলেনি তখন তাঁর ব্যগ্র ভালবাসা পর পর বহু নারীর প্রতিই অদম্য আবেগে বর্ষিত হয়েছে। তবে প্রথম প্রেমের স্মৃতি মনের কোণে থাকে সঞ্চিত, জীবনে দাগ কেটে যায় তখনই, যখন বিফলতায় মন ভেঙে যায়। রাধারাণী দেবী এবং লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা কয়েকটি পত্রে শরৎচন্দ্রের এই গোপন বেদনার কিছু আভাষ আছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন জনের কাছে লেখা (বা বলার) টুকরো অংশ নিম্নে তুলে ধরছি যাতে শরৎচন্দ্রের এই বেদনার আভাষ মিলবে। 'জগতে মানুষের এমন কথাও থাকিতে পারে, যাহা কাহারও কাছে ব্যক্ত করা যায় না। ...অথচ, এই নীরবতার শাস্তি অতিশয় কঠিন।' 'প্রথম যৌবনে আমি একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলাম।' '...তখন হইতে সমস্ত চিত্ত তাহার সাহিত্যে নিযুক্ত করিয়া দিই, তাহার সমস্ত রচনা সংশোধন করি এবং হাতে ধরিয়া লিখিতে শিখাই—তাই আজ সে মানুষ হইয়াছে, শুধু মেয়ে-মানুষ হইয়াই নাই।

এইটি আমার বড় গর্বের জিনিস।'

'এক একটা কথা মানুষে কোনকালেই সম্পূর্ণ ভুলে যেতে পারে না—অথচ ভোলা ছাড়া আর কি?' 'আমার একজন 'গারজেন' ছিলেন। এঁর

পরিচয় জানতে চেয়ো না।'

পত্রাংশের বা উক্তির আর প্রয়োজন নেই, এতেই জানা যাবে শরৎচন্দ্রের প্রণয়ের কথা। এই প্রণয় এবং বিবাহ অর্থাৎ নিরুপমা দেবী ও হিরণ্ময়ী দেবীর ছায়ায় রচিত রাজলক্ষ্মী চরিত্র। সুতরাং উপন্যাসে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর প্রণয়ের চিত্রটি গার্হস্থ জীবনের স্বামী স্ত্রীর মত অত্যুজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। রাজলক্ষ্মী ছাড়া শ্রীকান্ত অন্য কোন মেয়ের প্রেমে পড়েনি, কেবল উপন্যাসের প্রয়োজনে পুঁটুর সঙ্গে বিবাহের প্রসঙ্গ এসেছে মাত্র। আর কমললতা হচ্ছে 'প্রাচীন বৈষ্ণব কবিচিত্তের অশ্রুজলের গান' গোপীপ্রধানা রাধিকার মত। শরৎচন্দ্রের বৈষ্ণব রসগ্রন্থ-প্রীতি থেকেই কমললতার সৃষ্টি। সুতরাং উপন্যাসে শ্রীকান্তের প্রণয় ও বিবাহের অন্য চিত্র পরিস্ফুটনের প্রয়োজন হয়নি। কেবলমাত্র শ্রীকান্তের ভালবাসার পাত্রী রাজলক্ষ্মীকে অত্যুজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যার মধ্যে আমরা নিরুপমা ও হিরণ্ময়ী উভয়কেই খুঁজে পাই।

অন্যান্য কথা

"আমার 'মেমারি'টা বড্ড ভাল। ছেলেবেলা থেকে 'ইন্‌ট্যাক্‌ট' আছে।"

—শরৎচন্দ্র।

শ্রীকান্তের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের এত সাদৃশ্য দেখাবার পরও টুকিটাকি কতকগুলি কথা বাকি থেকে যায়, সেগুলি এই পর্যায়ে আলোচনা করে নেব।

শরৎচন্দ্রের প্রথমা পত্নী শান্তি দেবী ও তাঁর একমাত্র পুত্র মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই প্লেগ রোগের আক্রমণে মারা গিয়েছিল। রেঙ্গুনে সে সময়ে প্লেগের দারুণ মহামারী দেখা দিয়েছিল। স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যুতে শরৎচন্দ্র সেদিন বালকের ন্যায় অধীরভাবে কেঁদেছিলেন। যে রোগটি তাঁর জীবনে একজন প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটিয়েছিল সেই রোগটির কথা উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে, শ্রীকান্তের বর্মা যাত্রাকালেই উল্লেখ করা হয়েছে এবং শ্রীকান্তও এই প্লেগ মহামারীর কবলে পড়ে অভয়া-রোহিণীদাদার নতুন-পাতা সংসারে আশ্রয় নিয়েছে। প্লেগ থেকে উঠে তৃতীয়বার শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মীকে প্রয়োজন হয়েছে। ব্যক্তিজীবনে যেমন শরৎচন্দ্রের স্ত্রী-পুত্রের প্লেগ রোগে মৃত্যুর পর কলিকাতায়

ফিরতে হয়, তেমনি শ্রীকান্তও নিজে সুস্থ হওয়ার পর কলিকাতা ফেরে। শরৎচন্দ্র উপন্যাসে এই প্লেগ রোগের আবির্ভাব সম্পর্কে লিখেছেন, "এমনি সময় হঠাৎ একদিন শহরের মাঝখানে প্লেগ আসিয়া তাহার ঘোমটা খুলিয়া কালো মুখখানি বাহির করিয়া দেখা দিল। ···মানুষের প্রাণগুলো যেন সব গাছের ফলের মত প্লেগের আবহাওয়ায় এক রাত্রেই পাকিয়া উঠিয়া বোঁটায় ঝুলিতেছে,—কে যে কখন টুপ করিয়া খসিয়া নীচে পড়িবে, তাহার কোন নিশ্চয়তাই নাই।" (পৃঃ ২৬৩) কলিকাতায় ফিরে আসা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন 'পরদিন অফিসে চিঠি লিখিয়া আরও একমাসের ছুটি লইলাম এবং আগামী মেলেই যাত্রা করিবার জন্য টিকিট কিনিতে পাঠাইয়া দিলাম।" (পৃঃ ২৭৪)

শরৎচন্দ্রের নিজের শরীরটা যে বিশেষ ভাল ছিল না তা-ও 'শ্রীকান্ত' পড়লে ধরা পড়ে। প্রথম পর্বে শ্রীকান্ত একবার অসুখে পড়েছিল এবং দ্বিতীয় পর্বে গুরুতর অসুখে শয্যাশায়ী হওয়ার পর অভয়া তাকে ভাল করে তুলেছিল, আবার দেশের বাড়িতে জ্বরে পড়ার পর রাজলক্ষ্মী স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করে অসুস্থ শ্রীকান্তের পাশে এসে বসেছিল। তৃতীয় পর্বেও শ্রীকান্তের অসুখের কথা আছে; চক্রবর্তী গৃহিণীর সেবায় "দিন তিনেক পরে সুস্থ হইয়া একদিন সকালে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বলিলাম, মা আজ আমাকে বিদায় দিন।" (পৃঃ ৪৫৮) এইভাবে রাজলক্ষ্মী, অভয়া ও চক্রবর্তী গৃহিণীর কাছে শ্রীকান্ত অসুস্থতার সুযোগে সেবা পেয়েছে। ইতিপূর্বে দেখিয়েছি শরৎচন্দ্রও নানান্ রোগে ভুগে প্রায়ই দুর্বল হয়ে পড়তেন।

পরিচর্যা বা সেবার কাজে শরৎচন্দ্র ছিলেন সিদ্ধহস্ত। রুগীর সেবা করা ও মৃতদেহের সৎকার করার বিদ্যেটুকু বোধ করি তিনি কৈশোরের বন্ধু রাজুর কাছ থেকেই আয়ত্ব করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে অনুরূপা দেবী লিখেছেন, "শরৎবাবুর মধ্যে কতকগুলি বিশেষ গুণ ছিল। অসহায় রোগীর পরিচর্যা, মৃতের সৎকার এমনি সব কঠিন কার্যের মধ্যে তিনি একান্ত ভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন।" হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়ার সময়েও প্রয়োজনে গভীর রাত্রে তিনি একাই লণ্ঠন ও একটি লাঠি নিয়ে তিন মাইল নির্জন পথ হেঁটে হুগলী শহর থেকে রোগীর ওষুধ অথবা ডাক্তার এনে দিতেন।

উপন্যাসেও শ্রীকান্তের মধ্যে এই সেবাপরায়ণ মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে। 'চিকিৎসক' পর্যায়ে এই সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি; এ ছাড়াও দেখা যায় (দ্বিতীয় পর্বে) মনোহর বাবুকে প্লেগ রুগী হিসাবে শ্রীকান্ত সেবা করেই

অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাঁর সাহিত্যে অসংখ্য সেবাপরায়ণা নারী এবং অজস্র পরোপচিকীর্ষু পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উৎস শরৎচন্দ্রের এই বিশিষ্ট মানসিকতা থেকেই উদ্ভূত।

শরৎচন্দ্রের গ্রন্থের নায়িকার মতই তিনি সবাইকে খাওয়াতে বড ভালবাসতেন। তাঁর বাড়িতে যাঁরাই গেছেন কিছু না কিছু মুখে না দিয়ে তাঁরা ফেরেননি। রাজলক্ষ্মী কমললতা প্রভৃতি নায়িকা শ্রীকান্ত ও আনন্দকে যত্ন করে খাইযেছে। তবে, শ্রীকান্ত কিন্তু শরৎচন্দ্রের মতই স্বল্পাহারী। লীলা-রাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা (১৪.৮.১৯) চিঠিতে দেখা যায়, "এত কম খাই যে অম্বল পর্যন্ত আমার কাছে ঘেঁযে না, পাছে তাকেও বা অনাহারে শুকিয়ে মরতে হয়। কি যে সেদিন জোর করে ছাই-পাঁশ কতকগুলো ঘরের তৈরি করা সন্দেশ খাইয়ে দিলে যে আজও যেন তার ঢেকুর উঠছে। আমি এদেশের একটি বিখ্যাত কুঁড়ে। চিবোবার ভয়ে কোন জিনিস সহজে মুখ দিতে চাইনে—আমার ধাতে ও অত্যাচার সইবে কেন?" অধিক দৃষ্টান্তের আব প্রয়োজন নেই, একটি পত্রাংশেই প্রমাণ পাচ্ছি যে স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রকে কেমন যত্ন সহকারে খাওয়াতে ভালবাসতেন। এই খাদ্যদ্রব্যের প্রতি অনাসক্তির একটি প্রধান কারণ তিনি তিনি অত্যন্ত নেশা করতেন।

এছাড়া আরও দু'টি স্বভাব শরৎচন্দ্রের ছিল যার সামান্য ছাপ উপন্যাসেও পড়েছে। সে দু'টি হল অর্থের উপর অনাসক্তি এবং শিকারে ঝোঁক। উপন্যাসের ৬৯১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'দিন কাটে কখনো বই পডিযা কখনো নিজের বিগত-কাহিনী খাতায় লিখিয়া, কখনো বা শূন্য মাঠে একা একা ঘুরিযা বেড়াইয়া। এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে কর্মের প্রেরণা আমাতে নাই; লডাই করিয়া হুটোপুটি করিয়া, সংসারে দশজনের ঘাডে চডিয়া বসার সাধ্যও নাই, সঙ্কল্পও নাই। সহজে যাহা পাই তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মানি। বাড়ী-ঘর টাকা-কডি বিষয়-আশয় মান-সম্ভ্রম এ সকল আমার কাছে ছায়াময়।' ঠিক অনুরূপ কথা উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা এক পত্রাংশেই মিলবে, 'টাকার প্রতি আমার অহেতুক মোহ নাই। শুধু সংসারী লোক বলিয়াই প্রয়োজন।' আর, শিকারে ধৈর্য ও যোগ্যতা তাঁর থাক বা না থাক, শিকারের শখ ও নেশা ছিল তাঁর পুরোমাত্রায়। পেগুতে থাকতে তিনি মৎস্য ও পশুশিকারে প্রায়ই যেতেন কিন্তু পশুশিকার বলতে কেবলমাত্র পাখি শিকার করেই ফিরতেন। সামতাবেড়ে থাকার সময় তিনি একটা দু'নলা বড় বন্দুক কিনেছিলেন এবং তা দিয়ে রূপনারায়ণের চডায় পাখি শিকারও

করতেন। উপন্যাসের প্রথম পর্বেই এই শিকার প্রসঙ্গ আছে, এ ছাড়া মানুষের বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি উপন্যাসেই লিখেছেন, 'যে একটা পিপীলিকার মৃত্যু পর্যন্ত সহিতে পারে না, রক্তমাখা যূপকাষ্ঠের চেহারা যাহার আহার নিদ্রা কিছুদিনের মত ঘুচাইয়া দিতে পারে, যে পাড়ার অনাথ আশ্রয়-হীন কুকুর বেড়ালের জন্য ছেলেবেলা কতদিন নিঃশব্দে উপবাস করিয়াছে, —তাহার বনের পশু, গাছের পাখীর প্রতি লক্ষ্য যে কি করিয়া স্থির হয়, এ ত কিছুতেই ভাবিয়া পাই না!' বাস্তবিকই তাঁর মনটি অত্যন্ত কোমল ছিল বলেই এমন কথা লিখেছেন। অদ্ভুত বৈচিত্র্য আর বিরোধী সত্তার সমাবেশে তৈরি মানুষের মন।

উপরন্তু উপন্যাসের ঠাকুর্দা ও নতুনদা প্রসঙ্গও বাস্তবের সঙ্গে আংশিক সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। চতুর্থ পর্বে যে রাস্তার বর্ণনা আছে তা দেবানন্দ-পুরের রাস্তাকেই মনে করিয়ে দেয়। উপন্যাসের প্রয়োজনে কতকগুলি কৌশলও অবলম্বন করেছেন যেমন, নিজের চাকরের কথা না লিখে রাজলক্ষ্মীর চাকরকে দেখানো এবং নিজে গান না গেয়ে রাজলক্ষ্মীকে দিয়ে গান গাওয়ানো হয়েছে।

আরও একটি কথা 'মুরারিপুরের আখড়া' সম্পর্কে বলার আছে। উপন্যাসে যার নাম মুরারিপুরের আখড়া করা হয়েছে তার আসল নাম কৃষ্ণপুরের আখড়া —যা দেবানন্দপুরের উত্তর দিকে পাশের গ্রামেই অবস্থিত। এখানে শরৎচন্দ্র অর্থের পরিবর্তন না করে কৃষ্ণের বদলে মুরারি নামটি ব্যবহার করেছেন কেবলমাত্র শব্দের পরিরর্তন ঘটিয়ে। উপন্যাসে এই আখড়ার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যা লিখেছেন—'ছেলেবেলায় এই আখড়ার কথা শুনিয়াছিলাম আমার মনে পড়িল। পুরাকালে মহাপ্রভুর কোন্ এক ভক্ত শিষ্য এই আখড়ার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তদবধি শিষ্য পরম্পরায় বৈষ্ণবেরা ইহাতে বাস করিয়া আসিতেছে।' —তা সত্য কথা। রঘুনাথ দাসই পদব্রজে একসময়ে নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। বর্তমানেও, কৃষ্ণপুরে 'রঘুনাথ দাসের শ্রীপাট' বলে খ্যাত সেই স্থান দেখতে পাওয়া যাবে। আর পাওয়া যাবে ক্ষীণ সরস্বতীর তীরে অবস্থিত সেই বকুল গাছ; যেখানে একদিন শ্রীকান্ত তার দেশের বাড়ির বন্ধু গহরকে খুঁজে পেয়েছিল।

গহরের চাকর নবীন, শ্রীকান্তকে আখড়ার অবস্থান সম্পর্কে বলেছে, 'আপনিও ত এই দেশের মানুষ, চিনে যেতে পারবেন না? আধকোশের বেশি নয়, ঐ সুমুখের রাস্তা দিয়ে সিধে উত্তরমুখে চলে গেলে আপনিই দেখতে পাবেন ···সামনের দীঘি পাড়ে বকুলতলায় বৃন্দাবনলীলা চলচে···। সুপ্রাচীন বকুল-

বৃক্ষটা সহজেই চোখে পড়িল।'

এইভাবেই শ্রীকান্ত একদিন দেবানন্দপুরেরই নিকটবর্তী গ্রাম কৃষ্ণপুরের সেই প্রাচীন সরস্বতী নদীর তীরে উপস্থিত হয়েছিল। উপন্যাসে সংক্ষেপে সেই নদীর উল্লেখও আমরা দেখতে পাই—'স্বল্পতোয়া নদীর কতকটা অংশ বোধকরি গ্রামবাসীরা পরিষ্কৃত করিয়াছে, সম্মুখের সেই স্বচ্ছ, কালো অল্প পরিসর জলটুকুর উপরে ছোট ছোট রেখায় চাঁদের ও সন্ধ্যাতারার আলো পাশাপাশি পড়িয়া ঝিকমিক করিতেছে—যেন কষ্টিপাথরে ঘষিয়া স্যাকরা সোনার দাম যাচাই করিতেছে।' সেদিন প্রৌঢ় বেলায় রূপনারায়ণের তীরে বসে তাঁর নিজ গ্রামের কত কথাই না মনে পড়েছে। যা এতদিন স্মৃতির পাতায় জমা ছিল তা ফুলে ফলে ভরিয়ে তুলেছিলেন এই উপন্যাসটির শেষ পর্বটিতে। সকল অভিজ্ঞতার দুয়ারে একবার করে উঁকি দিয়ে এসে শেষ পর্যায়ে আপন জন্মভূমির মাটির স্পর্শ সুখে বিভোর থাকতে চেয়েছিলেন শিল্পী।

এইভাবে লক্ষ্য করা গেল যে, শরৎচন্দ্র ও শ্রীকান্তের মধ্যে অন্তর্জীবনেই নয়, বহির্জীবনেও কতটুকু সাযুজ্য আছে। এবারে উপন্যাসের চরিত্রগুলির বাস্তবতা অনুধাবন করা যাক, অর্থাৎ উৎস সন্ধানে মন দেওয়া যাক।

তৃতীয় অধ্যায়

ঘটনা ও চরিত্র

দুঃসাহসী ইন্দ্রনাথ

> "বালকের মত ইহার বিশ্বাস, যুবকের মত ইহার বীর্য্য ও অকুতোভয়, মহাস্থবিরের মত ইহার তত্ত্বজ্ঞান; যেন সকল জ্ঞান, সকল প্রেম ও সকল শক্তি একটি চিরকিশোরের রূপে লীলা করিতে নামিয়াছে।"
>
> —মোহিতলাল মজুমদার

উপন্যাসটির শুরুতেই পাঠকের যে চরিত্রটির সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটবে, সে হচ্ছে বাঙলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় চরিত্র ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথ পাঠকের মনে গভীরভাবে দাগ কেটে রেখে যায়। তার দুঃসাহসী নিশীথ অভিযান সত্যই তুলনারহিত। এই চরিত্রটির প্রথম আভাস আমরা পাই কবিকঙ্কনের শ্রীমন্ত চিত্রে। শিশু-ক্রীড়া বর্ণনায় জীবন-রস-রসিক কবি লিখেছেন—"জলে খেলে মাছ মাছ, ঝালি খেলে চড়ি গাছ, জীবন মরণ নাহি জানে।"

বাস্তবিকই, ইন্দ্রনাথ চরিত্রটি এমনই অদ্ভুত ও অনন্যসাধারণ যে, তাকে বর্ণনা করা যায় না, কেবল দেখানো যায়। শরৎচন্দ্রও তাই যেমন এই চরিত্রটি দেখেছিলেন তা-ই আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। তাঁর দেখাটাই আমরাও দেখছি। মোহিতলালের মতে, "শরৎচন্দ্র দুরূহ কাজটি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, ইহা যদি তাঁহার কবিত্বশক্তির বলেই হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিব, সকল কবিত্বের মূলে আছে কোন এক মহান সত্যের

অপরোক্ষ দর্শন; যদি না থাকে, তবে কবিত্ব একটা ভান মাত্র, তাহা মিথ্যা। সেই সত্য একটা ভাব-সত্যও হইতে পারে, দৈবী কল্পনাশক্তির বলে ভাব-সত্যও বস্তু-সত্য হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু এ কবিত্ব অন্যরূপ—ইহার প্রেরণামূলে আদৌ ভাব-সত্য নাই—আছে একটা মানুষ, একটা রক্ত-মাংসের বাস্তব-মূর্তি। ইহাতে কল্পনার লেশমাত্র নাই—যেমনটি দেখা ঠিক তেমনটি ভাষায় মূর্তিমান করিয়া তোলা; তাহা না হইলে কেবল কবিশক্তির সাহায্যে ইহাকে এমন জীবন্ত করা যাইত না। কবির মনোভূমি এ চরিত্রের জন্মস্থান নয়।..... ইন্দ্রনাথ চরিত্র সকল কল্পনার উর্দ্ধ; উহা অতিশয় বাস্তব, এবং বাস্তব বলিয়াই এত অদ্ভুত, এত বিস্ময়কর।" (১)

ইন্দ্রনাথ চরিত্রটির জন্মস্থান কবিব মনোভূমিতে নয়, এর একটি বাস্তব ভিত্তি আছে তা স্বয়ং শরৎচন্দ্রই কথা-প্রসঙ্গে বহু ব্যক্তিকে বলেছিলেন। শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরে অবস্থানকালীন একজন উল্লেখযোগ্য কিশোর—যে শরৎচন্দ্রের সেখানকার সঙ্গী এবং বন্ধু হিসাবে সর্বদা মিশত—সেই হচ্ছে এই চরিত্রটি। এর প্রকৃত নাম 'রাজু'—রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার। এই রাজেন্দ্রনাথই উপন্যাসের ইন্দ্রনাথ।

উপন্যাসে যখন আমবা সর্বপ্রথম ইন্দ্রনাথ চরিত্রটির সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ করি' তখন তার কৈশোর। কৈশোরের প্রাণপ্রাচুর্য, কৈশোরের সরলতা, কৈশোরের ছেলেমানুষি এবং একটা বলিষ্ঠ জীবনাদর্শ তার মধ্যে পুরোপুরি বর্তমান। কোন বন্ধনে সে আবদ্ধ হতে রাজি নয়, কারণ তার মনের মধ্যে একটা ভ্রাম্যমান মন, ভবঘুরে বৃত্তি বিরাজ করছে। সে যেন চির অস্থির অশান্ত যাযাবর, বনে বনে, প্রান্তবে প্রান্তরে, গিরিতে-কান্তারে ঘুরে বেড়ানই তার নেশা।

ইন্দ্রনাথকে সৎ মানুষ বলা উচিত হবে না; কারণ সে সিদ্ধি-সিগারেট খায়, স্কুল পালিয়ে কোন একটা অন্যায় আচরণ করে, পরেব মাছ চুরি করে বিক্রি করে। তবে সে দুঃসাহসী বীর; কারণ বনে-বাদাড়ে রাত্রে একা ঘুরে বেড়ানো, বাঘের ভয় না করে লণ্ঠন হাতে ঝোপের আড়ালে বাঘ দেখতে এগিয়ে যাওয়া, সতর্ক জেলেদের ফাঁকি দিয়ে মাছ চুরি করা, জোয়ান সাপুড়ে শাহজীর সঙ্গে নির্ভয়ে মল্লযুদ্ধ করা, শ্রীকান্তকে ফুটবল মাঠে মারের হাত থেকে বাঁচানো, নির্ভীকভাবে স্বার্থপর নতুনদা'কে খুঁজে বার করা, সমস্তই তার দুঃসাহসিক বীরত্বের লক্ষণ।

(দুটি চরিত্র কিশোর শ্রীকান্তের জীবনে গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল,

একটি অন্নদাদিদি, অপরটি এই ইন্দ্রনাথ। এদের মধ্যে ইন্দ্রনাথের ভূমিকাই বেশী ; অন্নদাদিদি প্রধানতঃ চারিত্রিক আদর্শ, বিশেষ করে নারীর মূল্য বিচারের নিরিখ হিসাবে শ্রীকান্তের মনে স্থান পেয়েছেন। আর, সব থেকে বড় কথা, এই ইন্দ্রনাথই অন্নদাদিদিকে আবিষ্কার করেছে এবং ইন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতার সুযোগ পেয়েই শ্রীকান্ত বড় জীবনের পথ খুঁজে পেয়েছে। পরবর্তী কালে শ্রীকান্তের মধ্যেই আমরা ইন্দ্রনাথকে কিছুটা খুঁজে পেয়েছি। এই ইন্দ্রনাথের মহত্ত্ব তাই শ্রীকান্তরূপী শরৎচন্দ্র নিম্নলিখিত কথা কয়টিতে ফুটিয়ে তুলেছেন :)

"কতকাল কত সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া আজ এই বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। কত দেশ, কত প্রান্তর, কত নদ-নদী পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল ঘাঁটিয়া ফিরিয়াছি, কত প্রকারের মানুষই না এই দুটো চোখে পড়িয়াছে. কিন্তু এত বড় মহাপ্রাণ ত আর কখনও দেখিতে পাই নাই।"

রাজেন্দ্রনাথের স্মৃতিই শরৎচন্দ্র অমর করে রেখেছেন 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের অবিস্মরণীয় চরিত্র ইন্দ্রনাথের মধ্যে। শরৎচন্দ্রের দেবানন্দপুর থেকে ভাগলপুরে আসার পর এই রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। ভাগলপুর শব্দের অর্থ সৌভাগ্যের শহর বা শরণার্থীদের শহর। শরৎচন্দ্রেরও এক রকম সৌভাগ্য যে ভাগলপুরেই তিনি এই বন্ধুটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

কবি কালিদাস রায়ের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে শরৎচন্দ্র ইন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

"গোড়াটা তো আমার ভাগলপুরের কৈশোর জীবনের স্মৃতিকথা। তোমরা জানো ভাগলপুরে ছোটবেলায় মামার বাড়ীতে থাকতাম।

কালিদাসবাবু বললেন—হ্যাঁ, তা' তো জানি। এবং সবাই জানে, ইন্দ্রনাথ তো দুরন্ত জল-জিয়ন্ত জলন্ত বালকই ছিল। একটু 'এম্ফাসিস্' দেওয়া আছে হয়ত ঐ চরিত্রে।

শরৎচন্দ্র ঈষৎ কুপিত হয়ে বললেন—একটুকুও 'এম্ফাসিস্' দেওয়া নেই। তবে একাধিক র‍্যাত্রির গঙ্গাবক্ষে অভিযান হয়ত এক রাত্রিতেই দেখানো হয়েছে। ইন্দ্রনাথ যে কত বড় মানুষ ছিল, তা তোমরা কল্পনা করতে·পারবে না—আমি তার চরিত্র পুরাপুরি এঁকে দেখাতে পারিনি, আমি তার আভাষ দিয়েছি মাত্র। তবে নতুনদা-তে একটু 'এম্ফাসিস্' দেওয়া হয়েছে। নতুনদা-ও একেবারে কল্পিত যুবক নয়।"(২)

রাজেন্দ্রনাথের পিতা রামরতন মজুমদার ছিলেন পাবনা জেলার অধিবাসী,

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। ভাগলপুরের তিনি ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতে তিনি কাজে ইস্তফা দিয়েছিলেন এবং ভাগলপুরের এক অংশ আদমপুরের গঙ্গার তীরে একটি পরিত্যক্ত নীলকুঠি কিনে তাঁর সাত ছেলের জন্যে সাতখানি বাড়ি তৈরি করে দিয়েছিলেন। ভাইদের মধ্যে রাজেন্দ্রনাথ ছিলেন চতুর্থ। রাজেন্দ্রনাথের কৃতবিদ্য দাদাদের মধ্যে বড়দা রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং তিনি সাহিত্য ও সঙ্গীতে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

রাজেন্দ্রনাথ কিন্তু বেশীদূর লেখাপড়া করেনি, তবে তার অন্যদিকে অশেষ গুণ ছিল। শরৎচন্দ্র উপন্যাসের ৬-৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "তখন ইস্কুলেও সে আর পড়ে না। শুনিয়াছিলাম হেডমাষ্টার মহাশয় অবিচার করিয়া তাহার মাথায় গাধার টুপি দিবার আয়োজন করিতেই সে মর্ম্মাহত হইয়া অকস্মাৎ হেডমাষ্টারের পিঠের উপর কি একটা করিয়া ঘৃণাভরে ইস্কুলের রেলিং ডিঙাইয়া বাড়ী চলিয়া আসিয়াছিলে, আর যায় নাই।......মাথার উপর দশ বিশজন অভিভাবক থাকা সত্বেও কেহ কোনমতেই আর তাহার মুখ বিদ্যালয়ের অভিমুখে ফিরাইতে সক্ষম হইল না। ইন্দ্র কলম ফেলিয়া দিয়া নৌকার দাঁড় হাতে তুলিল। তখন হইতে সে সারাদিন গঙ্গায় নৌকার উপর। তাহার নিজের একখানা ছোট ডিঙি ছিল, জল নাই ঝড় নাই, দিন নাই, রাত নাই— একা তাহারই উপরে।"

সুতরাং 'মাথার ওপর দশ-বিশজন অভিভাবক' কথাটি সত্য প্রমাণ হচ্ছে এবং ভিত্তির কথাও সত্য। রাজেন্দ্রনাথ যে বড়লোকের ঘরেই মানুষ হচ্ছিলেন তারও পরিচয় রয়েছে উপন্যাসে, "সে বড়লোকেব ছেলে, বাহিরে একটু বিশেষ বাবু।" যদিও ভিতরের মানুষটা আদৌ বাবু বা সভ্য-ভব্য ছিল না। তবে, শরৎচন্দ্রের 'দশ-বিশজন' কথাটি কথার কথা। কারণ, হয় দশজন না হয় বিশজন। দশ থেকে বিশ দ্বিগুণ তফাৎ; মজুমদারদের জনা-দশেক লোকের সংসার সর্বসমেত ছিল।

শরৎচন্দ্র ছিলেন রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গী এবং অতি প্রিয় বন্ধু। বন্ধু হলেও শরৎচন্দ্র রাজুকে বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করতেন এবং রাজুও শরৎচন্দ্রকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করত। ডিঙি নিয়ে 'রাজু' নদীতে নদীতে ঘুরে বেড়াত, শরৎচন্দ্রও তার সঙ্গী হতেন। এ সম্পর্কে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "কলেজ থেকে বাড়ী ফিরে শরৎচন্দ্র বৈকালটা বাড়ীতে কাটাতেন না। বই-খাতা রেখে কিছু জলখাবার খেয়ে তিনি বেরুতেন। রাজুর সঙ্গে ছোট

ডিঙ্গিতে চড়ে বেরুনো।...ডিঙ্গি করে রোজ বেরুনো চাই। কোন কোন দিন ফিরতে রাত হত।" উপন্যাসের ১৩ পৃষ্ঠায় আছে, "তুমি এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্ছ? ইন্দ্র হাসিয়া কহিল, রাত্তির কোথায় রে, এই ত সন্ধ্যা। আমি যাচ্ছি আমার ডিঙিতে—মাছ ধরে আনতে। যাবি?"

রাজেন্দ্রনাথের পরিচয় শরৎচন্দ্র ছেলেবেলায় এমন ভাবে পেয়েছিলেন যে, তার সম্বন্ধে প্রায়ই অনেকের কাছে গল্প করতেন। তার সাহসের গল্প, তার দরদী মনের গল্প, তার গরীব দুঃখীদের উপকার করার গল্প। এই 'রাজু'র অর্থাৎ ইন্দ্রনাথের চেহারার বর্ণনা শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্তে' দিয়েছেন—"ছেলেটি কালো। তাহার বাঁশীর মতো নাক, প্রশস্ত সুডৌল কপাল, মুখে দুই চারিটা বসন্তের দাগ। মাথায় আমার মতই, কিন্তু বয়সে কিছু বড়।" সত্যই শরৎচন্দ্রের চেয়ে রাজেন্দ্রনাথ বয়সে তিন বছরের বড় ছিল। এবং রাজুর মুখে দু'চারটে বসন্তের দাগও ছিল।

এই ইন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র লিখেছেন, "কিন্তু কি করিয়া 'ভবঘুরে' হইয়া পড়িলাম, সে-কথা বলিতে গেলে, প্রভাত-জীবনে এ নেশায় কে মাতাইয়া দিয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাহার নাম ইন্দ্রনাথ। আমাদের প্রথম আলাপ একটা 'ফুটবল ম্যাচে'। আজ সে বাঁচিয়া আছে কি না, জানি না। কারণ বহু বৎসর পূর্বে একদিন অতি প্রত্যুষে ঘর-বাড়ী, বিষয়-আশয়, আত্মীয়-স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই যে একবস্ত্রে সে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, আর কখনও ফিরিয়া আসিল না। উঃ—সে দিনটা কি মনেই পড়ে!"

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শরৎ পরিচয়' গ্রন্থে সত্যকার ফুটবল ম্যাচের কথা বলা হয়েছে,—"শ্রীকান্তের প্রথম পর্বের আরম্ভেই দেখি যে, একটি ফুটবল ম্যাচের পরিসমাপ্তির পর মারামারি, এবং বিপন্ন শ্রীকান্তকে ইন্দ্রনাথ আততায়ীর হাত থেকে উদ্ধার করছে।

এই মারামারির সময় সেখানে বর্তমান লেখকের উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য ঘটেছিল। ভাগলপুর 'টয়েন বি স্পোর্টে'র একটি খেলার শেষে এ ব্যাপারটি ঘটে। এবং ইন্দ্রনাথের (রাজু) দল লাঠির জোরে বিপক্ষকে তাড়িয়ে দেয়।

শ্রীকান্তের (শরতের) সঙ্গে ইন্দ্রনাথের (রাজুর) এটি প্রথম দেখা নয়। কারণ এই ঘটনা ১৮৯৩-৯৪ সালে ঘটে। এই সময়ে শরতের বয়স সতের বৎসর; রাজুর আঠার উনিশ হ'বে। এখানে রাজুর বর্ণনাটি একটু কাল্পনিক কি অতিরঞ্জিত নয়।"

সেকালের য়ুরোপীয় ক্লাবের কাছে আজও, উপন্যাসে উল্লেখিত ফুটবল খেলার মাঠটি বর্তমান। আর স্থরেনবাবু যে 'টয়েন বি স্পোর্টে'র কথা লিখেছেন, সেই টয়েন বি সাহেব একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন, তাঁর নামেই স্পোর্ট হত।

এই ফুটবল খেলায় মারামারি এবং ইন্দ্রনাথ চরিত্রটির বাস্তব চরিত্র প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তমুন্সী কিছু অন্য কথা বলেছেন। তা-ও এখানে উদ্ধৃত করতে হচ্ছে এই কারণে যে, দত্তমুন্সী মহাশয়ও রাজেন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন :

"শরৎচন্দ্র যখন হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়েন তখন দেবানন্দপুরে সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সতীশচন্দ্রের সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। এই সতীশ শরৎচন্দ্রের অপেক্ষা দুই তিন বছরের বড় ছিলেন এবং অতিশয় দুঃসাহসিক প্রকৃতির বালক ছিলেন। একবার হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলার সময় খেলোয়াড় দুই দলের মধ্যে মারামারি হয়। মারামারির সময় শরৎচন্দ্র কিছু আহত হন, সতীশ তখন তাহাকে ঐ হাঙ্গামার ভিতর হইতে বাহির করিয়া আনেন (ইহা শ্রীকান্তে প্রথম পর্বে আছে) এবং তদবধি শরৎচন্দ্র সতীশের অনুগত হইয়া পড়েন এবং ক্রমশঃ উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি জন্মে। এই সতীশচন্দ্র বাঁশি ও বেহালা ভাল বাজাইতে জানিতেন। এবং তাহরই নিকট হইতে শরৎচন্দ্র এই সমস্ত বাজনা শিখেন; তাহা ছাড়া গাছে উঠিয়া ফল চুরি করা, সন্ধ্যার পর জেলেদের ডিঙ্গি খুলিয়া লইয়া তাহাদের নদীতে পাতা জাল হইতে মাছ চুরি করা প্রভৃতি দুঃসাহসিকতার বিদ্যাও সতীশচন্দ্রের নিকট হইতে শরৎচন্দ্র শিখিয়াছিলেন। ...'শ্রীকান্তে'র প্রথম পর্বে ইন্দ্রনাথের দেহের গঠন ও আকৃতি সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে সতীশচন্দ্রের দেহাবয়বের সহিত সম্পূর্ণ মিলিয়া যায়...। এজন্য ইহাই ধারণা হয় যে 'শ্রীকান্তে' বর্ণিত ইন্দ্রনাথের প্রথম চিত্রে শরৎচন্দ্র তাঁহার দেবানন্দপুরের অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু সতীশচন্দ্রের চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন ও পরে যে স্থান হইতে কোলকাতায় 'নতুনদা'র কাহিনী আরম্ভ করিয়াছেন, সেই স্থান হইতে তাঁহার ভাগলপুরের বন্ধু রাজেন্দ্রের বা রাজুর চরিত্র চিত্রিত করিয়া থাকিবেন।...শরৎচন্দ্রের মত দুঃসাহসিক ও ডানপিটে ছেলের পক্ষে গ্রামে অথবা সহরে যেখানেই যান না কেন, সমগুণসম্পন্ন—অন্তরঙ্গ বন্ধু জুটাইয়া লইতে বিলম্ব হয় না এবং পরে ঔপন্যাসিকের তুলিকা হস্তে তাঁহার মত শিল্পীর পক্ষে এইরূপ দুইটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর চিত্র একই নায়ক "ইন্দ্রনাথে'র

চরিত্রে মিলিত করিয়া অঙ্কিত করা মোটেই অসম্ভব নয়।"

দত্তমুন্সী মহাশয়ের যেটুকু উদ্ধৃতি দেওয়া গেল তা কতটুকু নির্ভরযোগ্য তথ্য তা আমাদের বিচার করে দেখতে হবে। দেবানন্দপুরের বেশ কিছু তথ্য দত্তমুন্সী মহাশয় তার প্রবন্ধে উপস্থাপন করেছেন এবং তা সর্বাংশে অসত্যও নয়, কারণ তার যথেষ্ট ভিত্তি আছে। কিন্তু ইন্দ্রনাথের চরিত্রটি রূপায়ণে সতীশচন্দ্রের ছাপ অধিক, না রাজেন্দ্রনাথের জীবনের খণ্ডাংশ অধিক তা বিচার বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদের 'রাজু'র কথাই বিশেষ করে মনে পড়ে। প্রথমতঃ, দত্তমুন্সী মহাশয় নিজে শরৎচন্দ্র এবং সতীশচন্দ্রের মেলামেশা দেখেননি, অপরর কাছে—শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু সন্তোষকুমারের নিকট থেকেই শুনেছেন, কিন্তু অপর পক্ষে রাজেন্দ্রনাথের যা কিছু তথ্য তা প্রত্যক্ষ দ্রষ্টাদের কাছ থেকেই পাওয়া। দ্বিতীয়তঃ, চতুর্থ শ্রেণীর (বর্তমানে সপ্তম শ্রেণী) ছাত্রের পক্ষে এমন সাহসিকতাপূর্ণ কাজ করা হয়ত সম্ভব নয় এবং নতুন'দা পর্বের পর আর অধিক ইন্দ্রনাথ প্রসঙ্গও নেই। সুতরাং দত্তমুন্সী প্রদত্ত ফুটবল মাঠের মারামারি, বাঁশী ও বেহালা বাজানো, মাছ চুরি করার ঘটনাগুলি আংশিকভাবে সত্য ঘটনা বলে মেনে নিতে পারি; অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের সতীশচন্দ্র নামে কোন বাল্যবন্ধু ছিল এবং তার স্মৃতিচিত্র কিছু কিছু ইন্দ্রনাথ চরিত্রে রূপলাভ করেছে, এ কথা আমরা মেনে নিতে পারি বটে কিন্তু মূলতঃ ইন্দ্রনাথ চরিত্রটি রাজেন্দ্রনাথকে দেখেই লেখা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। তবে দত্তমুন্সীর এই বক্তব্য যে একেবারেই অসত্য নয় তার প্রমাণ শরৎচন্দ্র অন্নদাদিদি ও শাহজীর বাস্তব চরিত্র দু'টি দেবানন্দপুরে থাকাকালীনই দেখেছিলেন এবং সতীশচন্দ্রের কথা মনে পড়লে অন্নদাদিদি প্রসঙ্গ আসত না। এক কথায় ইন্দ্রনাথ চরিত্র সৃষ্টির মূলে রাজু এবং আংশিকভাবে সতীশ (দত্তমুন্সীর বক্তব্যের ঠিক বিপরীত) শরৎচন্দ্রের মনে স্থান পেয়েছিল।

রাজেন্দ্রনাথ ফুটবল খেলায় সত্যই খুব দক্ষ ছিল। তার নিজস্ব একটি দলও গড়ে উঠেছিল। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক' গ্রন্থে (পৃঃ ৬৩-৬৪) রাজেন্দ্রনাথের অতি সুন্দর চরিত্র চিত্র এঁকেছেন, "রাজু যে কোন কাজই করিত তাহা এমন সুন্দর করিয়া করিত যে, তাহাকে গুরু রূপে স্বীকার করিতেই হইবে। গুণ্ডামিতে সে ছিল সবার সেরা—সাঁতারে, জিমনাষ্টিকে, ঘুড়ি উড়ানোতে তাহার জোড়া ছিল না। কিন্তু লেখাপড়াতে তাই বলিয়া সে কাহারো অপেক্ষা কম নহে; হাতের লেখা মুক্তার মত, ড্রয়িং-এর হাত পাকা। ছুতার মিস্ত্রীর কাজেও তাহার অসামান্য দক্ষতা।

বাঁশি হারমোনিয়াম ক্ল্যারিনেট ভালই বাজাইত। কণ্ঠধ্বনি ছিল সুমধুর। তাহার অভিনয় করিবার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। গভীর রাতে আমবাগান হইতে বাঁশী বাজিয়া উঠিত, সবাই জানিত রাজুর অগম্য স্থান নাই, সে সাপের ভয় করিত না—বোধ করি তাহার মৃত্যুভয়ও ছিল না।

কিন্তু যৌবনেই তাহার সন্ন্যাস শুরু হইয়া গেল। তাহার মনে অদ্ভুত পরিবর্তন আসিল; বহির্জগত হইতে বিদায় লইয়া সে মনোজগতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। গঙ্গার তীরে, শ্মশানের কাছে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছের গায়ে নিজ হাতে কাঠের ঘর বাঁধিয়া সে ধ্যানমগ্ন হইল। সেই ঘরে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না; প্রবেশের পথও ছিল বড় কঠিন; একখানি বাঁশ বাহিয়া উপরে উঠিতে হইত। শুনিয়াছি সেইখানে সে মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরের জ্যোতি দেখিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িত। যাহা দেখিত—একখানি খাতায় তাহা আঁকিয়া রাখিত।

লোকে নানা কথা বলিতে লাগিল; তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া ক্রমে সে মৌনী হইয়া পড়িল। অনশনে দিন কাটিত। বন্ধু-বান্ধব দূরে গেল। কেবল ভালবাসিত শিশুদের—কাছে পাইলে বুকে জড়াইয়া তৃপ্তির আনন্দে অবিরত কাঁদিত! একদিন সকলে দেখিল—'পাখী উড়ে গেছে সাগর পারে।' সকল অনুসন্ধান ব্যর্থ করিয়া সে আজিও নিরুদ্দেশ।"

শরৎচন্দ্রের গুরু ও বন্ধু রাজেন্দ্রনাথ যেমন বাঁশী বাজাতে পারত তেমনি শ্রীকান্তের গুরু ও বন্ধু ইন্দ্রনাথের বাঁশী বাজাবার কথাও উপন্যাসে বলা হয়েছে, "হঠাৎ কি মধুর বংশীস্বর কানে আসিয়া লাগিল। সহজ রামপ্রসাদী সুর। কত ত শুনিয়াছি, কিন্তু বংশীতে যে এমন মুগ্ধ করিয়া দিতে পারে, তাহা জানিতাম না।"

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'শরৎচন্দ্রের জীবন-রহস্য' গ্রন্থের ৯০ পৃষ্ঠায় আছে, "রাজু বাঁশী বাজাতে পারতো, হারমোনিয়াম বাজাতে পারতো। রাজুর কাছে শরৎচন্দ্র বাঁশী বাজাতে শেখেন। গঙ্গার ধারে, নিরালা নির্জন জায়গায় বসে শরৎচন্দ্র বাঁশী বাজানো শিখতেন। বাড়ীর কেউ জানতে পারলে কড়া শাসন ···বলবে বখে যাবার ব্যবস্থা। তখন ছেলে বয়সে বাঁশী বাজানো, গান গাওয়া এগুলো ছিল বখে যাবার পথ তৈরী করা! ···রাজু ছিল শরৎচন্দ্রের গান বাজনার গুরু। বাড়ীতে গান বাজনার চর্চা চলে না ·· বাড়ীর বাইরে কোথায় কার নিরালা বাগান, শরৎচন্দ্র বাড়ী থেকে নিঃশব্দে পালিয়ে রাজুর সঙ্গে সেই বাগানে গিয়ে গান বাজনার চর্চা করতেন।"

শরৎচন্দ্র .রাজুর কাছ থেকে বাঁশী ছাড়া অন্যান্য বাজনাও শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তবে বিশেষ করে বাঁশী বাজানোই ভাল ভাবে শিখেছিলেন। শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু এবং মাতুল সুরেনবাবু তাই আরও লিখেছেন, "শ্রীকান্তর পাঠকমাত্রই শুনেছেন গভীর রাতে মন মাতানো বাঁশীর ধ্বনি। ইন্দ্রনাথ যে বাগানের গাঢ় অন্ধকারে বসে বাঁশী বাজিয়ে ডাকতো শ্রীকান্তকে, তার নাম ছিল সেদিন 'রামবাবুর বাগান।' ঐ বাগানটি আজও শ্রীহীন অবস্থায় টিকে আছে।"

এই বাগানটি রাজুদেরই বাগান ছিল। বাগানের সংলগ্ন পূর্বদিকেই রাজুদের বাড়ি এবং বাড়ির পিছনেই গঙ্গা। এই বাগানটিই হয়ত উপন্যাসে গোঁসাইবাগান হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। "বাড়ির পূর্ব দক্ষিণ কোণে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁটালের বাগান। ভাগের বাগান, অতএব কেহ খোঁজ খবর লইত না। সমস্ত নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। শুধু গরু বাছুরের যাতায়াতে সেই বনের মধ্য দিয়া সরু একটা পথ পড়িয়াছিল। মনে হইল, যেন সেই বন পথেই বাঁশির সুর ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। পিসিমা উঠিয়া বসিয়া তাঁহার বড় ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, হ্যাঁরে নবীন, বাঁশি বাজায় কে—রায়েদের ইন্দ্র নাকি? বড়দা বলিলেন, সে হতভাগা ছাড়া এমন বাঁশিই বা বাজাবে কে, আর ঐ বনের মধ্যেই বা ঢুকবে কে?

বলিস্ কি রে? ও কি গোঁসাইবাগানের ভেতর দিয়ে আসছে না কি? ....আচ্ছা, ওর মা কি বারণ করে না? গোঁসাইবাগানে কত লোক যে সাপে-কামড়ে মরেছে, তার সংখ্যা নেই—আচ্ছা, ও জঙ্গলে এত রাত্তিরে ছোঁড়াটা কেন?

বড়দা একটুখানি হাসিয়া বললেন, আর কেন! ও-পাড়া থেকে এ পাড়ায় আসার এই সোজা পথ। যার ভয় নেই; প্রাণের মায়া নেই, সে কেন বড় রাস্তা ঘুরতে যাবে মা? ওর শিগ্‌গির আসা নিয়ে দরকার। তা, সে পথে নদী-নালাই থাক আর সাপখোপ বাঘ-ভালুকই থাক।"

এই বাগানের পশ্চিম দিকে অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের মামার বাড়ির (যে বাড়ি 'শ্রীকান্তে' পিসিমার বাড়ি বলে উল্লিখিত) নিকটেই গঙ্গা থেকে বয়ে আসা একটা সরু জলের খাল ছিল।. বর্ষাকালে এই খালটি জলে ভরা থাকত। উপন্যাসেও এই খালটি বর্ণিত হয়েছে এই ভাবে, 'গঙ্গার তখন জল মরিতে শুরু করিয়াছে। তাহারই সংলগ্ন একটা নালার ধারে বসিয়া, ছিপ দিয়া ট্যাঙরা মাছ ধরিতে বসিয়া গিয়াছি।' শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলায় ভাগলপুরে থাকার সময় এই খালটা পারাপারের জন্য এর উপর শুধু একটা বাঁশ পাতা থাকত। পরে

এখানে একটা পাকা পুল হয়, সেটিও এখন নেই। এর নিকটেই মাণিক সরকার রোড, খালের সিধা এই রাস্তার উপরেই শরৎচন্দ্রের মামার বাড়ি।

রাজুদের বাগান ও বাড়ির উত্তরে একেবারে গা দিয়ে সেদিনের ভরা গঙ্গা (বর্তমানে শুষ্কপ্রায়) বয়ে যেত। রাজুদের বাড়ির ঠিক পিছনেই গঙ্গার তীরে একই স্থানে পাশাপাশি একটা প্রকাণ্ড বটগাছ ও অশ্বত্থ গাছ ছিল। সেদিনের গঙ্গার প্রবল স্রোতে বটগাছটি পড়ে গেছে, কিন্তু অশ্বত্থ গাছটি আজও তেমনি অটুট রয়েছে। এই অশ্বত্থ গাছেই রাজুর ডিঙিটি বাঁধা থাকত, আর ঐ বটগাছটিতেই তার ধ্যান ঘরটি ছিল।

"খাড়া কাঁকড়ের পাড়। মাথার উপর একটা বহু প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ মূর্তিমান অন্ধকারের মত নীরবে দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহারই ত্রিশ হাত নীচে সূচিভেদ্য আঁধার তলে পরিপূর্ণ বর্ষার গভীর জলস্রোত ধাক্কা খাইয়া আবর্ত রচিয়া উদ্দাম হইয়া ছুটিয়াছে। দেখিলাম, সেইখানে ইন্দ্রের ক্ষুদ্র তরীখানি বাঁধা আছে।"

এখন পাঠকগণ সেই তরীখানি তো পাবেনই না, সেই 'ত্রিশ হাত' নীচের পাড়-ও পাবেন না।

শরৎচন্দ্র রাজেন্দ্রনাথকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতেন, তার আদেশ-নির্দেশ শিষ্যের মত মানতেন। শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথকে যে সত্যই ভালবেসেছিল তা উপন্যাসের কয়েকটি উক্তিতেই প্রমাণিত হবে,—

'যিনি সব জানেন, তিনিই শুধু বলিয়া দিতে পারেন—কেন এত লোক ছাড়িয়া সেই একটা হতভাগার প্রতি আমার সমস্ত প্রাণটা পড়িয়া থাকিত এবং কেন সেই মন্দের সঙ্গে মিলিবার জন্যই আমার দেহের প্রতি কণাটি পর্য্যন্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল।' (পৃঃ ৭)

'আমি ইন্দ্রনাথকে ভালবাসিয়াছিলাম।' (পৃঃ ৪৩)

"ছেলে-মহলে সে একজন মস্ত লোক। ফুটবল-ক্রিকেটের দলে কর্ত্তা, জিম্ন্যাষ্টিক আখড়ার মাষ্টার। তাহার কত অনুচর, কত ভক্ত। আমি ত তাহার তুলনায় কিছুই নয়।' (পৃঃ ৬০)

লোকশ্রুতি যে, এককালের গ্রাণ্ট সাহেবের কুঠির নিকটই শরৎচন্দ্র ও রাজেন্দ্রনাথ জেলেদের মাছ চুরি করে বিক্রি করার টাকা নিয়ে অন্নদাদিদির কুটিরে যেতেন। শরৎচন্দ্রের মামার বাড়ি থেকে প্রায় চার-পাঁচ মাইল পূর্বে অবস্থিত ভাগলপুরের যে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গুফা বা মাটির নীচে গোলক ধাঁধার মত বিরাট গুহা, (বর্তমানে যেখানে মহর্ষি মেঁহি দাস বাবাজীর আশ্রম)

তারই নিকটে গঙ্গার নিকটেই (কুপ্পাঘাটে) একটা উঁচু জায়গায় অন্নদাদিদি তাঁর স্বামীকে নিয়ে থাকতেন। এর সত্যাসত্য নির্ণয় করা বর্তমানে সত্যিই কষ্টকর ; তবে শোনা যায়, এর নিকটেই পূর্বে একটি শ্মশান ছিল এবং আরও একটু এগিয়েই মীরাচকে আর একটি শ্মশান আজও বর্তমান। কিন্তু সেই সতুয়ার চরা, ভুট্টাক্ষেতের চরা এবং বড় গঙ্গা সবই এখান থেকেই চোখে পড়বে। এখনও গঙ্গার মাঝখানে দুটি চরা এবং চরার উত্তর দিকে বড় গঙ্গা। কিছুকাল পূর্বেও ঐ চরে ভুট্টার চাষ হত।

ভাগলপুরে বাঙালীটোলা ও আদমপুর পল্লী পাশাপাশি। শরৎচন্দ্রের মামার বাড়ি বাঙালিটোলায় এবং রাজেন্দ্রনাথের বাড়ির শুরু থেকেই আদমপুর।

রাজেন্দ্রনাথ যে ভাল অভিনয় করতে পারত, তা জানতে পারি শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরের তখনকার প্রতিবেশী রায়বাহাদুর শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'শরৎচন্দ্রের বাল্য-কাহিনী' থেকে—

"আদমপুর ক্লাবের একটি ড্রামাটিক সেকশন ছিল এবং সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবে বাংলা নাটক অভিনয় করা ছিল এই ক্লাবের বৈশিষ্ট্য। 'মৃণালিনী', 'জনা', 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের অভিনয়ে শরৎচন্দ্র যথাক্রমে মৃণালিনী, জনা এবং চিন্তামণির ভূমিকা অভিনয় করিয়া আদমপুর ক্লাবের অভিনয়ের সুনাম বর্দ্ধিত করেন। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্র ইন্দ্রনাথের অরিজিন্যাল বলিয়া যে রাজুর উল্লেখ করা হয়, তিনি উপরোক্ত মৃণালিনী ও বিল্বমঙ্গল অভিনয়ে গিরিজায়া ও পাগলিনীর অংশ অভিনয় করেন। ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকিল ৺চন্দ্রশেখর সরকার মহাশয়ের বাটীতে বিল্বমঙ্গল অভিনয় হইবার রাত্রি হইতে রাজু নিরুদ্দেশ হয় এবং এই পর্যন্ত তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।"

('বাতায়ণ', শরৎ-স্মৃতি সংখ্যা, ২৭শে ফাল্গুন, ১৩৪৪)

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসেও তেমনি ইন্দ্রনাথকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। উপরের কয়েকটি উদ্ধৃতিতেই দেখা গেল যে, রাজেন্দ্রনাথ সত্য সত্যই একদিন কোথায় চলে গেল তা কেউই বলতে পারেননি। শরৎচন্দ্রও তাই ইন্দ্রনাথের কথা উপন্যাসে বলার পূর্বেই ইন্দ্রনাথের সংসার ত্যাগ করে চলে যাওয়ার কথা লিখেছেন। এবং শেষে ইন্দ্রনাথের চরিত্র মূল্যায়ণে যাতে আমাদের কোন ভুল না হয় সেজন্য শেষ সাক্ষাৎকারের সময়ে অন্নদাদিদির মুখ দিয়ে লেখক বলিয়েছেন, 'ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্তকে আশীর্বাদ করলুম বটে, কিন্তু তোমাকে আশীর্বাদ করব সে সাহস আমার হয় না। তুমি মানুষের আশীর্বাদের বাইরে। তবে ভগবানের শ্রীচরণে তোমাকে মনে মনে সঁপে দিলুম। তিনি তোমাকে

যেন আপনার করে নেন।' শরৎচন্দ্র ইন্দ্রনাথের গৃহত্যাগের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কাহিনীতে তার গৃহত্যাগের দৃশ্য সংযোজিত করেননি। অন্নদাদিদির উদ্ধৃত উক্তিতে তার সামান্য আভাস পাওয়া যায়। যার মধ্যে অফুরন্ত প্রাণাবেগ, মৃত্যু যাঁর পায়ের ভৃত্য, যে সবকিছু দিয়ে মানুষকে ভালবাসতে পারে, তার কাছে জাগতিক সুখ ঐশ্বর্য সম্মানের মূল্য কতটুকু! তার প্রাণাবেগ আরও বৃহত্তর প্রাপ্তির কামনায় তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবেই। তখন ইন্দ্রনাথ কৈশোর ছাড়িয়ে প্রথম যৌবনে পদার্পণ করেছে, কিন্তু এক ভবিষ্যত সন্ন্যাসীর আভাস তার চরিত্রে বিদ্যমান।

এই প্রসঙ্গে হীরালাল দাশগুপ্তের 'শ্রীকান্তের দেশে' নামক প্রবন্ধ থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করতে হচ্ছে—তিনি শরৎচন্দ্রের সুরেন মামার কাছ থেকে শুনে যা লিখেছিলেন তা নিম্নে দেওয়া হল:

"ওই রাজু কোথায় অদৃশ্য হ'ল। কেউ বলে জলে ডুবে মরেছে। কেউ বলে সন্ন্যেসী হযেছে। সন্ন্যেসী হয়েছে সেইটেই ঠিক। ওকে একবার আমবা দেখতে পেয়েছি। সেবার হরিদ্বারে কুম্ভমেলা। আমার মা, আরও কেউ কেউ ছিলেন আমাদেব সাথে। হঠাৎ একটি সাধুকে দেখে মনে হল ও রাজু।

রাজুর কথা আমরা কখনো ভাবিনি।

আমরা ওকে ভাল করেই জানতাম। আমাদের সংশয় ছিল না। তবু একটা পরামর্শ সাব্যস্ত কবে হঠাৎ একটা ডাক দিলাম ওর নাম ধরে। মুহূর্তে সাধু মাথা উঁচু করে তাকালে। এ যে রাজু না হয়ে যায় না, তাতে আমাদের কোন সন্দেহ রইল না। তারপর ওর মাকে ভাগলপুরে টেলিগ্রাম দিলাম। যথাসময়ে মা-ও এলেন। কিন্তু ওকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। অনুসন্ধান করতে কেউ কেউ বললে ও কাশী গিয়েছে। সেখানে পৌঁছেও সন্ধান কবা গেল। বৃথা সন্ধান পাখী পালিয়েছে।" (শারদীয়া দৈনিক বসুমতী—১৩৬০)

অতএব এটাই প্রমাণিত হল যে, শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরের বন্ধু রাজেন্দ্রনাথ মজুমদারের সত্য কাহিনীই 'শ্রীকান্তে'র অবিস্মরণীয় চরিত্র ইন্দ্রনাথকে সৃষ্টি করেছে। অবশ্য ভাগলপুরের পরিবেশ, ঘটনার সাথে দেবানন্দপুরের স্মৃতিও কিছু মিশে থাকতে পারে। এই রাজুর চরিত্র রূপায়ণে বাস্তবের সঙ্গে সাহিত্যিক-কল্পনার কি রকম মিলন ঘটেছে তা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষাতেই বলি, "শরৎচন্দ্র রাজুকে বাস্তবের ক্ষণিক অনিত্যতা হইতে সাহিত্যের চির-নিত্যতার মধ্যে আনিয়া অমরত্ব দান করিতে যেটুকু রস যোজনার প্রয়োজন—তাহা পূর্ণভাবে করিয়াছেন। সেখানে সত্য মলিন না হইয়া প্রোজ্জ্বল হইয়া

উঠিয়াছে। চিত্রের পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে হইলে যেমন দূরে সরিয়া যাইতে হয় তাহাতে অনেক বাস্তব প্রচ্ছন্ন হয় অনেক শূন্যতা কল্পনার স্নিগ্ধালোকে পূর্ণ হইয়া উঠে; ইন্দ্রনাথকে উদঘাটিত করিতে শরৎচন্দ্র যথাযথভাবে ওইটুকুই মাত্র করিয়াছেন। তাহাতে পরিচিত চরিত্রটি আরো সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে মাত্র, কোথাও ক্ষুণ্ন হয় নাই।" (শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক)

ইন্দ্রনাথের মধ্যে সাহস, নির্লিপ্ততা, চঞ্চলতা ও পরোপচিকীর্ষা প্রভৃতি সকল বৈশিষ্ট্যগুলিই বিরাজমান। তার অনির্বাণ পরোপচিকীর্ষা, তার অম্লান তেজস্বিতা সত্যই অনেকের কাছে লোভের বস্তু, স্বপ্নের সামগ্রী। তার বীরত্বের মধ্যে আস্ফালন বা আড়ম্বর নেই, আছে নিঃশঙ্কতা ও সরলতা। খেলার মাঠে মারামারি, গঙ্গার উজান বেয়ে মাছ চুরি, জেলেদের সতর্কতার মধ্যে দিয়ে পালানো, সাপ-বুনো শূয়োর প্রভৃতি বন্য জন্তু সঙ্কুল পথে সঞ্চরণের মধ্যে যেমন তার সাহসিকতার পরিচয় ফুটে ওঠে তেমনি আবার অসহায় বালককে অত্যাচারীর হাত থেকে ত্রাণ করা, প্রতিবেশীর বাড়ির লোকদের 'দি রয়াল বেঙ্গল টাইগার'-এর উৎপাত থেকে মুক্ত করা, ঘৃণিত স্বার্থপর চরিত্র নতুনদাকে রক্ষা করা, দারিদ্র নিপীড়িত, শ্রদ্ধাস্পদ অন্নদাদিদিকে সাহায্য করার পিছনে সাহসিকতার চেয়েও পরোপচিকীর্ষাই প্রাধান্য পায় বেশী। তাই চরিত্রটির মধ্যে বলিষ্ঠতার পাশে কোমলতা, দৃঢ়তার পাশে চঞ্চলতা তাকে বিশিষ্ট মহিমাই দান করেছে। সর্বোপরি তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নির্লিপ্ততা। তাই যেদিন সে 'অতি প্রত্যূষে ঘর-বাড়ী, বিষয়-আশয়, আত্মীয়-স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া গেল, আর আসিল না'—সেইদিন অতিথির মত নির্লিপ্তভাবে চলে গেল। কোন বন্ধন, কোন প্রলোভন তাকে ধরে রাখতে পারল না। কিন্তু বাংলা-সাহিত্য তাকে চিরকাল ধরে রাখবে।

বর্ণ পরিচয়ের রাখাল থেকে আরম্ভ করে অনেক দুষ্ট, লেখাপড়ায় অমনোযোগী বালকের কাহিনী সাহিত্যে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু সমস্ত বাংলা সাহিত্য-ইতিহাস তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ইন্দ্রনাথের জোড়া মেলে না। (৩)

উৎস নির্দেশ

(১) শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, পৃঃ ৩৪-৩৫
(২) শরৎচন্দ্র. ২য় খণ্ড—গোপাল চন্দ্র রায়, পৃঃ ১০২ – ১০৩
(৩) বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২২৮

মমতাময়ী অন্নদাদিদি ও পাষণ্ড শাহজী

She pays the debt of life not by what she does but by what she suffers.

—Schopenhauer.

অন্নদাদিদির মধ্যে শ্রীকান্ত এক মহা তপস্বিনীকে দেখেছিল। অন্নদাদিদি নারীর সহিষ্ণুতা, দুঃখ ভোগ ও পাতিব্রত্যের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। শ্রীকান্ত দেখেছিল সতীত্বের তপস্যা কি, আর আশ্চর্য হয়ে ভেবেছিল যে সেই সতীত্ব-ধর্ম পালনে নারীর আত্মোৎসর্গ কোন্ সীমায় পৌছাতে পারে। অথচ সমাজের চোখে অন্নদাদিদি কুলত্যাগিনী ভ্রষ্টা নারী ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন অন্নদার মধ্যে কেবল পাতিব্রত্যের আদর্শ নয়, সত্য ও নীতির আদর্শও বিরাজিত। শ্রীকান্ত দেখেছে, "যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। যেন যুগযুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন।" ইন্দ্রনাথের মত অন্নদাদিদিও একদিন এই পৃথিবীতে কোথায় নিরুদ্দেশে পাড়ি দিলেন। এবং তা যেন অন্নদাদিদির এই পৃথিবী থেকেই বিদায় গ্রহণ বলে মনে হয়েছে। কিন্তু ক্ষণকালের পরিচিত এই অসামান্য নারীটিকে শ্রীকান্ত মনের মধ্যে ধরে রেখেছে।

"নারীর কলঙ্ক আমি সহজে প্রত্যয় করিতে পারি না। আমার দিদিকে মনে পড়ে।...এক আমি, আর সেই সমস্ত কালের সমস্ত পাপ-পুণ্যের সাক্ষী, তিনি ছাড়া জগতে আর কেহ কি আছে, যে অন্নদাকে একটুখানি স্নেহের সঙ্গেও স্মরণ করিবে! তাই ভাবি. না জানিয়া নারীর কলঙ্কে অবিশ্বাস করিয়া সংসারে বরঞ্চ ঠকাও ভাল, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া পাপের ভাগী হওয়ায় লাভ নাই।" (পৃঃ ৭২)—একথা কেবল শ্রীকান্তের নয়, লেখকের অন্তর্জীবন বিশ্লেষণ করেও আমরা এই একই পুরুষকে দেখি।

যে দুজন (ইন্দ্রনাথ ও অন্নদাদিদি) শ্রীকান্তকে খাঁটি সোনা চিনতে সাহায্য করেছিল পরবর্তীকালে, সেই দুজনের একজন ইন্দ্রনাথের নেপথ্যে যে ব্যক্তি, তার সন্ধান আমরা পেয়েছি। কিন্তু অন্নদাদিদির বাস্তব চরিত্রটিকে তেমন নির্দিষ্টভাবে দেখিয়ে দেওয়ার মত তথ্য কেউ তেমন দিতে পারেননি।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অন্নদাদিদি ও শাহজীকে খুঁজে পেয়েছেন শরৎচন্দ্রেরই পিতা-মাতা মতিলাল ও ভুবনমোহিনীর মধ্যে। মতিলালের ছন্নছাড়া জীবনটিকে ভুবনমোহিনী আমরণ প্রেম-ভক্তির অঞ্চলে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ 'শরৎ-পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন, "মতিলাল যেন আকাশের ঘুড়িখানি! নিজের খেয়ালে ওড়ে, লাট খায়, গোঁৎ মেরে মাটি ছুঁতে ছুঁতে আবার গিয়ে ওঠে আকাশের নীলে!

...সংসার-কারখানার বিস্তৃত প্রাঙ্গণে ভুবনমোহিনী ছিলেন নিরন্তর ভ্রাম্যমান চরকির মতোই—সমস্ত সংসারটিকে আপন গতর দিয়ে গুটিয়ে তোলাই ছিল তাঁর দৈনন্দিনের কাজ! শরৎ সাহিত্যে এমন এক আধটি মানুষের সঙ্গে কি আমাদের দেখা হয় না?" (পৃষ্ঠা ৪০) আবার এই গ্রন্থেরই ৩০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "এমন একটি দম্পতির কাহিনী আমরা 'শ্রীকান্তে'র মধ্যেও পাই। তখন মন স্তম্ভিত হয়ে ভাবে শরৎচন্দ্র কোথায় দেখেছিলন এমন একজোড়া অদ্ভুত মানুষ! সেই সাপধরা মানুষ! —সাহ্‌জির সঙ্গে কোথায় যেন একটা অদ্ভুত মিল!"

এছাড়াও, কথা-প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র কালিদাস রায়কে বলেছিলেন যে, অন্নদাদিদি তাঁর দেখা চরিত্র। অনেকেই অনুমান করেন যে, অন্নদাদিদির চরিত্র অঙ্কনের মূলে সাপুড়ে স্বামীর সহচারিণী এক ব্রাহ্মণ কন্যার কথা ব্যক্ত হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথের বক্তব্যটি অবশ্য অনুমানের উপর ভিত্তি করে। শরৎচন্দ্র তাঁর পিতা-মাতাকে দেখে তাঁদের স্বভাব এবং চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের কথা ভেবেই অন্নদা এবং শাহজীর মত চরিত্র সৃষ্টি করেছেন—এ'টি তাঁর কল্পনা। আবার, দেবানন্দ-পুরবাসী দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তমুন্সী মহাশয় এ বিষয়ে যেটুকু আলোকপাত করেছেন তাও গ্রহণযোগ্য।

দত্তমুন্সী লিখেছেন, 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পর্বের যে 'অন্নদাদিদি' ও 'শাহজী' নামক তাঁহার সাপুড়ে স্বামীর কাহিনী আছে তাহাও দেবানন্দপুর গ্রামের প্রান্তবর্তী সরস্বতী নদীর অপর পারের 'মালিসপুর' গ্রামের তখনকার দিনের একটি সত্য ঘটনা। শরৎচন্দ্র ও সতীশচন্দ্র (শরৎচন্দ্রের বাল্য-বন্ধু, বয়সে দুই তিন বছরের বড়) প্রায়ই এই 'অন্নদাদিদির' কুটীরে যাতায়াত করিতেন এবং তাহাকে ফল তরকারী মাছ মাঝে মাঝে দিয়া আসিতেন ও সময়ে সময়ে সামান্য অর্থ সাহায্যও করিতে—একথা শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে উল্লিখিত 'প্রসন্ন ঠাকুরদার' পুত্র শ্রীযুত সন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন, কারণ তিনিও শরৎ-

চন্দ্রের সহিত উক্ত 'অন্নদাদিদির' কুটীরে কয়েকবার গিয়াছেন এবং 'শাহজীর' মৃত্যুর পর যে 'অন্নদাদিদি'র শরৎচন্দ্রের পৈত্রিক ভবনের নিকটবর্তী চৌমাথা রাস্তার মোড়ের গোবিন্দ মুদির দোকানে মাকড়ী দুইটি বিক্রয় করিয়া যান ও প্রাপ্ত টাকা হইতে শরৎচন্দ্রকে দেওয়ার জন্য ঐ মুদির নিকট পাঁচটি টাকা রাখিয়া যান—তাহা তাঁহার স্পষ্টইমনে আছে।"

উদ্ধৃতিটুকুর মধ্যে অন্নদাদিদি এবং শাহজীর অন্য কোন নামের উল্লেখ নেই এবং উপন্যাসের অন্যান্য কিছু ঘটনা—যথা শাহজীর মৃত্যুর পর অন্নদাদিদির মুদির দোকানে মাকড়ী বিক্রয় করা এবং শ্রীকান্তর জন্য পাঁচটি টাকা রেখে যাওয়া—প্রভৃতি সমস্ত মিলে যাচ্ছে বলে এটি বানানো গল্প ভেবে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ-বিবরণীতে' অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল ভূমিকাতেই লিখেছেন যে, রচনাটি 'নির্ভরযোগ্য', 'তথ্যবহুল এবং শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই তাঁর বাল্যজীবনের এই তথ্যগুলি সংগৃহীত। সুতরাং অন্নদাদিদি এবং শাহজী চরিত্র দুটির বাস্তব ভিত্তির সঠিক সন্ধান পেয়েছি বলে মনে করতে পারি। বলাই বাহুল্য, অন্নদাদিদি-শাহজী কাহিনীতে গল্পকার শরৎন্দ্রের কল্পনার প্রশ্রয় পেয়ে তা আর প্রাণবন্ত এবং উজ্জ্বল আকারে প্রতিভাত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের আলোচনায় যে সতীশচন্দ্রের নাম পেয়েছি তাকে কল্পনা করেই ইন্দ্রনাথ ও অন্নদাদিদির মিলন সূত্রের সন্ধান মিলবে। ইতিপূর্বে 'ইন্দ্রনাথ' পর্যায়ে আলোচনা করেছি যে, সতীশচন্দ্রের সঙ্গে ইন্দ্রনাথ চরিত্রটির মিল কোথায় কতটুকু আছে।

আমাদের এই সিদ্ধান্তই প্রশ্রয় পাচ্ছে অধ্যাপক মাখনলাল রায়চৌধুরীর 'বাংলা সাহিত্য ও ভাগলপুর' (১) শীর্ষক প্রবন্ধে। এখানে যে অন্নদার কথা বলা হয়েছে তিনিও দেবানন্দপুর নিবাসী এবং শরৎচন্দ্রের দূর সম্পর্কীয়া একজন ভগ্নী। সুতরাং দত্তমুন্সী লিখিত মালিসপুর গ্রামেরই হোক বা অন্যত্র বসবাসকারী হোক, শরৎচন্দ্র শৈশবে ঠিক এমন একটি পরিবারের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলেই মনে হয়। আর একটি কথা প্রসঙ্গ ক্রমে বলা প্রয়োজন যে দত্তমুন্সী লিখিত মালিসপুর গ্রামটির আসল নাম মালিনপুর বলেই আমি জানি, তিনি নামটির ক্ষেত্রে ভুলও করতে পারেন।

ভাগলপুরের গঙ্গার তীরে অন্নদাদির যদি বাসগৃহ থাকতই তবে সুরেন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই তাঁর শরৎ-বিষয়ক গ্রন্থদ্বয়ে তা উল্লেখ করতেন। তিনি যখন রাজেনের কথা অতি জোর দিয়েই উল্লেখ করেছেন এবং রাজেনকে কেন্দ্র করেই শরৎচন্দ্র ইন্দ্রনাথের সৃষ্টি করেছেন বলে জানতেন তখন শাহজী-অন্নদা

প্রসঙ্গ যে এর সঙ্গে কেমন জড়িত তাও নিশ্চয় লিখতেন। তা যখন লেখেননি তখন দৃঢ়নিশ্চিত যে, অন্নদাদিদি-শাহজী মালিসপুরেরই অধিবাসী ছিলেন, হয়ত ভবিষ্যতে কোনদিন ভাগলপুরের গঙ্গার তীরে কুপ্পাঘাটের নিকটে, যেখানে বর্তমানে মেঁহিদাস বাবাজীর আশ্রম আছে, তার নিকটেই পূর্বদিকে একটা উঁচু জায়গায় বসবাস শুরু করেছিলেন। এবং তখন শরৎচন্দ্র ও রাজেন্দ্রনাথ গঙ্গায় জেলেদের জাল থেকে মাছ চুরি করে সেই মাছ বেচার টাকা তাঁদের সাহায্যও করতেন। যাই হোক, শরৎচন্দ্র উপন্যাসের খাতিরেই গল্পের বাঁধুনী এনেছেন। বহুদিন পর যখন ব্রহ্মদেশে ইরাবতীর তীরে কোন একটি দরিদ্র কুটীরে বসে তাঁর ফেলে আসা দিনলিপিগুলি লিখেছেন তখন মমতাময়ী অন্নদা ও নিষ্ঠুর অত্যাচারী শাহজীর চরিত্র রূপায়ণে তাঁরই মাতা ও পিতাকে বার বার হয়ত মনে পড়েছে। পিতা মতিলাল সাংসারিক ঝামেলা থেকে রেহাই পেতে নিজেকে উদাসীন, ছন্নছাড়া ও নেশাসক্ত করে তুলেছিলেন, পক্ষান্তরে মাতা ভুবনমোহিনী দেবী ধরিত্রীর মত সর্বংসহা হয়ে থেকে অকালে প্রাণ হারিয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের চিন্তাটি তাই নিতান্তই উপেক্ষনীয় নয়। ভুবনমোহিনীর নির্বাক কর্মজীবন, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ত্যাগ-ভিত্তিক সেবাধর্ম শরৎচন্দ্রের মনে একটি মহীয়সী মাতৃমূর্তি সৃষ্টি করেছিল। ভারতীয় ত্যাগধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত সীতা-সাবিত্রীর মত একটি নারীকে শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর মায়ের মধ্যে। তাই শরৎচন্দ্রের চিন্তাধারা বিপ্লবাত্মক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নারী চরিত্রগুলি সনাতন ধর্মের গুণাবলীর অধিকারী। ভুবনমোহিনীর চরিত্র মাধুর্যই তাঁর মনে এই বোধের সৃষ্টি করেছিল বলে মনে হয়। এমন কি সমাজচ্যুতা, ভ্রষ্টা নারীর হৃদয়ের ঐশ্বর্যকেও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে, অপরিসীম কারুণ্য ও দরদের রক্তিমায় মহীয়সী করে তুলেছেন। ঠিক তেমনই, অন্নদাদিদির জীবন কাহিনী ও সতীধর্মের অভিজ্ঞতা দিয়েই শরৎচন্দ রাজলক্ষ্মী, অভয়া ও কমললতার চরিত্র বিচার করতে চেয়েছেন। অন্নদাদিদি উপন্যাসের প্রথমে এসেও সর্বত্রই তাই বিরাজ করেছেন। বাস্তবের অন্নদা এইভাবে কল্পনায় রূপান্তরিত হয়ে শরৎচন্দ্রের আদর্শ অন্নদাদিদিতে পরিণত হয়েছে। তাই এই চরিত্রটির তুলনা নেই। ইন্দ্রনাথের মত, অন্নদাদিদিও শরৎচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টি। অন্নদাদিদির মধ্যে শ্রীকান্ত দেখেছিল এক মহাতপস্বিনীকে; দৈন্য যাঁর ঐশ্বর্য, ত্যাগ যাঁর ভূষণ, শক্তি ও সরলতা যাঁর নিত্যসঙ্গী। হুমায়ুন কবীর ইন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্নদার তুলনামূলক আলোচনা করে অন্নদার স্বরূপটি সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে

দিয়েছেন, ('অন্নদাদিদি হচ্ছেন সংস্কারের প্রতীক, আর ইন্দ্রনাথ সহজ প্রবৃত্তির।) অতীতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস অন্নদাদিদির জীবনের কামনা-বাসনাগুলোকে একেবারে পুড়িয়ে দিয়েছে। ইন্দ্রনাথ যেমন ভবিষ্যতের মধ্যে বাস করে, অন্নদাদিদির অবস্থান তেমনি অতীতের মধ্যে। তাঁর বর্তমান অন্ধকারময়, ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাঁর জীবনের কল্পিত ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে তিনি সমাজে নিন্দিতা। কিন্তু এটা তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে সমাজে সম্মান থেকে বঞ্চিত হলেও, সংস্কারের কাছে তিনি সম্পূর্ণ খাঁটি। তাঁর সমস্ত জীবনটাই সতীত্বের আদর্শের কাছে এক অবিরাম আত্মাহুতি।' (২)

বাস্তবিক, মনোমুগ্ধকর প্রথম পর্বের অন্নদাদিদি সামান্য সময়ের জন্য বিশেষ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিমণ্ডলে ফুটে-ওঠা এক উপমাহীন স্নিগ্ধ রূপবতী সতী নারী। একজন ইংরেজ সাহিত্যিক লিখেছেন "To know her was itself a liberal education." এই কাব্যটি সম্পূর্ণরূপেই অন্নদাদিদি সম্বন্ধে প্রযোজ্য। (৩) বস্তুতঃ অন্নদাদিদির কাছ থেকে শ্রীকান্ত যা লাভ করেছে তা তাকে liberal education ই দান করেছে। কিশোর শ্রীকান্ত যদিও অন্নদাদিদিকে দেবীত্বের আসনে বসিয়েছিল কিন্তু লেখক তাঁকে রক্ত-মাংসের মানবী চরিত্র রূপেই পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। নিয়মচারিণী, তপঃশুদ্ধা ও নিত্য শুভব্রতা অন্নদাদিদি শরৎচন্দ্রের যেমন সত্যই বিস্ময়কর সৃষ্টি, তেমনি অত্যাচারী পাষণ্ড শাহজী চরিত্র-সৃষ্টি হিসাবেও আমাদের কম বিস্ময় সৃষ্টি করে না। প্রথম পর্বে শরৎচন্দ্র যে দুটি সম্পূর্ণ অসদর্থমূলক (negative) চরিত্র এঁকেছেন, তার মধ্যে শাহজী একটি। শ্রীকান্তের চোখে শাহজী দানব, অন্নদাদিদি দেবতা। অনেক রেখে ঢেকে শাহজী চরিত্রকে এমন ভাবে পরিবেশিত করা হয়েছে যাতে সে এক মূর্তিমান অশুভ বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়। শ্রীকান্তের মারফৎ লেখক শাহজী চরিত্রের একটা আবছা ছায়া মাত্র আমাদের দেখিয়েছেন ; এবং সে ছায়াটুকু মনে বিভীষিকা জন্মায়।

উৎস নির্দেশ

(১) প্রভাতী (বিহার), ১ম বর্ষ, শ্রাবণ ১৩৪৭, দ্বিতীয় সংখ্যা।

(২) শরৎ-সাহিত্যের মূলতত্ত্ব—হুমায়ুন কবির। পৃঃ ৩৮

(৩) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ২২৯

সঙ্গীত-প্রিয় কুমার সাহেব

"মজঃফরপুরে শরৎবাবু থাকিতে থাকিতে মজঃফরপুরের একজন জমিদার মহাদেব সাহুর সহিত শরৎচন্দ্রের পরিচয় ঘটে। ...এই মহাদেব সাহুই যে শ্রীকান্তের কুমার বাহাদুর তাহাতে সন্দেহ নাই।"

—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের মত সন্ন্যাসীর বেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এবং এক সময় এক তরুণ রাজবন্ধুর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। এই সময়েই তিনি হয়তো এমন ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হন যা তাঁকে পিয়ারী বাঈজীর প্রসঙ্গ রচনা করতে প্রণোদিত করেছে।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ। শরৎচন্দ্র পড়াশুনা, সাহিত্যচর্চা, গান-বাজনা, অভিনয় এবং রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিশে বেশ দিন কাটাচ্ছিলেন। হঠাৎ একদিন কাকেও না বলে বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হলেন। পিতা মতিলালের তিরস্কারে অভিমানী শরৎচন্দ্র মনের দুঃখে সেদিন গৃহত্যাগ করেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের মিষ্টি কণ্ঠের জন্যেই মজঃফরপুরে নিশানাথের মাধ্যমে লেখিকা অনুরূপা দেবীর স্বামী শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। অল্পদিনের মধ্যেই একজন ভাল গায়ক হিসাবে শরৎচন্দ্রের নাম মজঃফরপুরে ছড়িয়ে পড়ে। এই সঙ্গীতের মধ্যে দিয়েই তাঁর সঙ্গে মজঃফরপুরের জমিদার মহাদেব সাহুর পরিচয় হয়। উভয়ের মধ্যে পরিচয় হলে মহাদেব সাহু শরৎচন্দ্রেক তাঁর বাড়িতে এসে থাকবার জন্য অনুরোধ করেন। শিখরবাবুর বাড়ি থেকে তিনি মহাদেব সাহুর নিকটে গিয়ে উপস্থিত হন। এই মহাদেব সাহুই যে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে কুমার বাহাদুর রূপে অঙ্কিত হয়েছেন তা শরৎ-জীবনীকারগণ স্বীকার করেন। মহাদের সাহু অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় লোক ছিলেন। এই সঙ্গীতের জন্যই তিনি বিশেষভাবে শরৎচন্দ্রকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং কিছুদিন সমাদরে রেখেছিলেন। সাহুর গৃহে থাকবার সময় শরৎচন্দ্র হঠাৎ পিতা মতিলালের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ভাগলপুরে ফিরে যান।

উপন্যাসের ৮৩ পৃষ্ঠায় এই মহাদেব সাহুকেই রাজার ছেলে বলে উল্লেখ

করে লিখেছেন, "এক রাজার ছেলের নিমন্ত্রণে তাঁর শিকার পার্টিতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এঁর সঙ্গে অনেকদিন স্কুলে পড়িয়াছি, গোপনে অনেক আঁক কষিয়া দিয়াছি—তাই তখন ভারি ভাব ছিল। তারপরে এণ্ট্রান্স ক্লাস হইতে ছাড়াছাড়ি। রাজার ছেলেদের স্মৃতিশক্তি কম, তাও জানি। কিন্তু ইনি যে মনে করিয়া চিঠিপত্র লিখিতে শুরু করিবেন, ভাবি নাই।"

এইভাবে মহাদেব সাহুকে স্মরণ করেই রাজার ছেলে বা কুমার সাহেবের তাঁবুতেই প্রথম উপন্যাসের নায়িকা রাজলক্ষ্মীকে পিয়ারী বাঈজী হিসাবে উপস্থিত করেছেন শরৎচন্দ্র। পাটনার পিয়ারী বাঈজীর মাধ্যমেই কুমারের শিকারের তাঁবুতে গান-বাজনার মজলিশ বসিয়েছেন। এখানে শ্রীকান্তকে গায়ক হিসাবে না দেখিয়ে রাজলক্ষ্মীকেই গায়িকা করা হয়েছে। রেঙ্গুনে থাকার সময় সেখানে তাঁর বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতির সঙ্গে মাঝে মাঝে পাখি শিকার করতে যেতেন। এখানে কৌশলে সেই পাখি শিকার প্রসঙ্গও এনেছেন এবং প্রথম যৌবনের প্রধান সঙ্গী রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেক অমাবস্যা রাত্রের অভিজ্ঞতা শ্মশান দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এই অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানে রাত্রি যাপন যে সত্য ঘটনা তা শরৎচন্দ্র কালিদাস রায়কে একবার কথায় কথায় বলেছিলেন ('শরৎচন্দ্র' ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য—গোপালচন্দ্র রায়। পৃঃ ১০৪)

এছাড়াও আর একটি ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথম যৌবনে শরৎচন্দ্র পড়াশুনা ত্যাগ করার কিছুদিন বাদে বনেলী এস্টেটে সামান্য মাইনের একটা চাকরি করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নকে বলেছিলেন :

'আমি কিছুদিন বনেলী এষ্টেটে কাজ করি। সাঁওতাল পরগণায় তখন সেটেলমেণ্টের কাজ চলচে। এষ্টেটের তরফ থেকে একজন বড় কর্মচারী সেই কাজে এষ্টেটের স্বার্থ দেখবার জন্য নিযুক্ত হ'ন। তাঁর সহকারীদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। ডাঙ্গার মাঝে তাঁবুতে থাকতে হ'ত। কখন কখন রাজকুমার সেখানে আসতেন। সেটেলমেণ্টের বড় বড় অফিসারদের তাঁবুতে নেমন্তন্ন করে নাচ-গানের মজলিস্ দিতেন।' —ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩৪৪

আমার অভিমত, এই রাজকুমার, তাঁবু এবং নাচ-গানের মজলিস প্রভৃতির মিলিত অভিজ্ঞতাতেই কুমার সাহেবের ব্যাপারটি গড়ে উঠে থাকবে। মজঃফরপুরের জমিদার মহাদেব সাহু এবং বনেলীর জমিদার (যাঁরা তাঁদের নামের পূর্বে 'কুমার' শব্দটি যোগ করতেন)-এর সংমিশ্রণই শ্রীকান্তের কুমার

সাহেব। সেটেলমেণ্টের বড় বড় অফিসারদের তাঁবুতে নেমন্তন্ন করে নাচ-গানের মজলিস এবং সঙ্গীতপ্রিয় মহাদেব সাহুর জমিদারীর মধ্যে যে মজলিস—এই দুই মজলিসের কথাই শরৎচন্দ্রের স্মরণে এসে থাকবে। রাজার ছেলের উৎপত্তি এইভাবেই হয়েছে। নির্দিষ্টভাবে বনেলী এস্টেটের জমিদার এবং মজঃফরপুরের জমিদারকে কুমার সাহেব হিসাবে চিহ্নিত করা সমুচিত হবে বলে মনে করি না। শরৎচন্দ্রের এই দু' জায়গাকার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই উপন্যাসে একটি নির্দিষ্ট কাহিনী আকারে রূপলাভ করেছে।

দুর্ভাগিনী নিরুদিদি

> "মণিমাণিক্য মহামূল্য বস্তু, কেন-না তাহা দুষ্প্রাপ্য। এই হিসাবে নারীর মূল্য বেশী নয়, কারণ সংসারে ইনি দুষ্প্রাপ্য নহেন। জল জিনিসটি নিত্য প্রয়োজনীয়, অথচ ইহার দাম নাই। কিন্তু যদি কখনও ঐটির একান্ত অভাব হয়, তখন রাজাধিরাজও বোধ করি এক ফোঁটার জন্য মুকুটের শ্রেষ্ঠ রত্নটি খুলিয়া দিতে ইতস্ততঃ করেন না। তেমনি ঈশ্বর না করুন,—যদি কোন দিন সংসারে নারী বিরল হইয়া উঠেন, সেইদিনই ইহার যথার্থ মূল্য কত, সে তর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে—আজ নহে।"
>
> 'নারীর মূল্য'—শরৎচন্দ্র

শ্রীকান্ত যখন শ্মশানে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সেই সময়ে নিরুদিদির কথা ভেবেছে। এই নিরুদিদির ঘটনাটি কেমন সুন্দরভাবে শরৎচন্দ্র উপন্যাসের মধ্যে এনেছেন যা এক সময়ে বাস্তবে ঘটেছিল। শরৎচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে নিরুদিদির সম্পর্কে অনেকের কাছেই গল্প করেছিলেন। ১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মুন্সীগঞ্জ অধিবেশনে সাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়।' এই মনুষ্যত্বপ্রীতি ছিল শরৎচন্দ্রের মানবতাবোধ-সঞ্জাত।

নিরুদিদির কথা শরৎচন্দ্র উপন্যাসের ৯৫-৯৬ পৃষ্ঠায় সংক্ষেপেই প্রসঙ্গক্রমে

এনেছেন। নিরুদিদি মানবিক গুণ সমৃদ্ধা' কিন্তু চরিত্র স্খলনের অপরাধে সে সমাজে নিষ্করুণভাবে লাঞ্ছিতা হয়েছে। শ্রীকান্ত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নিরুদিদির জন্ম গভীর বেদনা বোধ করেছে।

শরৎচন্দ্রের নিজের জীবনে অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল বলে গোপালচন্দ্র রায় তাঁর 'শরৎচন্দ্র' ১ম খণ্ডে ৪৪০-৪১ পৃষ্ঠায় এবং ২য় খণ্ডে ১৯৭-৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। এছাড়া কবি-সমালোচক মোহিতলালও তাঁর 'সাহিত্য-বিতান' গ্রন্থে নিরুদিদির গল্প লিখেছেন। মোহিতলাল মজুমদারের কাছে শরৎচন্দ্র নিরুদিদির গল্প বলেছিলেন ঢাকায়, অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে বসে। প্রশ্নটি ওঠে বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণী চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে।

'বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে রোহিণীর দুর্গতির কথা যখন ভাবি, তখন আমার (শরৎচন্দ্রের) নিরুদির কথা মনে পড়ে।

নিরুদি ছিলেন ব্রাহ্মণের মেয়ে, বাল-বিধবা। বত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর চরিত্রে কোন কলঙ্ক স্পর্শ করেনি। সুশীলা, পরোপকারিণী, ধর্মশীলা ও কর্মিষ্ঠা বলে যথেষ্ট সুনাম ছিল। রোগে সেবা, দুঃখে সান্ত্বনা, অভাবে সাহায্য—এমন কি প্রয়োজন হলে দাসীর মতো পরিচর্যা তাঁর কাছে পায়নি, এমন পরিবার বোধ করি গ্রামে একটিও ছিল না। আমি তখন ছেলেমানুষ। কিন্তু তবুও সেই বয়সেই নিরুদির মধ্যে একটা বড় হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

সেই নিরুদির বত্রিশ বছর বয়সে হঠাৎ একবার পদস্খলন হল। গ্রামের স্টেশনের বিদেশী মাস্টার, নিরুদিকে কলঙ্কের মধ্যে নামিয়ে পাষণ্ডের মতো পালান।

এ সব ব্যাপারে সমাজে নিয়মিত যা ঘটে থাকে, নিরুদির ভাগ্যেও তার অন্যথা হয়নি। পূর্বেকার যত উপকার, সেবা-যত্ন, সব কিছু ভুলে গিয়ে গ্রামের সকলেই তাঁকে নির্মমভাবে বর্জন করল। এমন কি তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ করে দিল।

লজ্জায়, অপমানে, আত্মগ্লানিতে কদিনেই নিরুদির স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। ক্রমে তিনি মরণাপন্ন হয়ে শয্যাশায়ী হলেন। তাঁর সেই মুমূর্ষু অবস্থাতেও তাঁর মুখে জল দিতে কেউ এগিয়ে এল না। তাঁর দুয়ার পর্যন্ত কেউ মাড়াল না।

আমাদের বাড়ীতেও কড়া হুকুম ছিল। নিরুদির কাছে যাবার যো ছিল না। আমি কিন্তু রাত্রিতে লুকিয়ে নিরুদিকে দেখতে যেতাম। গিয়ে তাঁর মাথায়

পায়ে হাত বুলিয়ে দিতাম। দু-একটা ফল সংগ্রহ করে নিয়ে তাঁকে খাইয়ে আসতাম। তখন দেখেছি, সে অবস্থাতেও গ্রামের লোকের কাছে এই পৈশাচিক শাস্তি পেয়েও, নিরুদি কোনদিন কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেন নি। তাঁর নিজেরই লজ্জার সীমা ছিল না। যে অপরাধ তিনি করেছেন, এ শাস্তি যেন তার তুলনায় অতিরিক্ত হয়নি। তখন অবাক ঠেকত, পরে বুঝেছি। নিজের অপরাধের শাস্তি তিনি নিজেই দিয়েছিলেন নিজেকে, গ্রামের লোক ছিল উপলক্ষ মাত্র। গ্রামের লোকদের তিনি ক্ষমা করেছিলেন, কিন্তু নিজেকে ক্ষমা করেন নি।

এইখানেই তাঁর শাস্তির শেষ হয়নি। যখন মারা গেলেন, গ্রামের কেউ তাঁর মৃতদেহ স্পর্শ পর্যন্ত করল না। ডোম দিয়ে সেই মৃতদেহ নদীর তীরে জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হ'ল। শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেল সেই দেহ।

মানুষের মধ্যে যে দেবতা আছে, আমরা এমন করেই তার অপমান করি।'

ঠিক এই গল্পই শরৎচন্দ্র একদিন মেদিনীপুরের বিজয়কৃষ্ণ খাঁ-এর বাড়িতে এক ঘরোয়া সাহিত্য সভায় বলেছিলেন। একজন প্রশ্ন করেছিলেন—আচ্ছা শরৎবাবু, সতীত্বই তো নারীত্ব। আপনি আবার ও দুটোকে আলাদা করলেন কেন?

উত্তরে শরৎচন্দ্র এই নিরুদিদির গল্পটি একটু ভিন্ন প্রকারে যা বলেছিলেন তা তুলে ধরা হল—

'আমাদের পাড়ায় এক বাল-বিধবা বাস করতেন। গ্রাম সম্পর্কে তিনি আমার দিদি হতেন। বিয়ের অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর স্বামী মারা যান। বিধবার বেশে দিদি বাপের বাড়ীতে ফিরে আসেন। সংসারে তাঁর ভাইবোন কেউ ছিল না, শুধু বাপ-মা। তাও আবার দিদি বিধবা হবার পর দুটি বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তাঁর বাপটিও হঠাৎ মারা গেলেন। তারপর দিদির বয়স যখন তিরিশ হ'ল, সেই থেকে বাড়ীতে তিনি একাই থাকতেন।

বাড়ী বলতে একখানা মাত্র মাটির ঘর, চারদিকে উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। যাতায়াতের জন্য উঠানের একদিকে একটি মাত্র দরজা। সন্ধ্যা হলেই দিদির এই বাইরের দরজায় খিল পড়ে যেত।

গ্রামের এমন পরিবার ছিল না, যেখানে দিদির খাতির ভালোবাসার অভাব ছিল। তার কারণ ছিল। লোকের অসুখ-বিসুখে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে প্রাণ দিয়ে দিদি সেবা করতেন। কাজ কর্মের বাড়ীতে দিনরাত তাঁর চেয়ে বেশী খাটতে কাউকে কখনো দেখা যায়নি। গ্রামে এমন বাড়ী একটিও ছিল

না যে, কোন না কোন কারণে, দিদির কাছ থেকে অতিরিক্ত উপকার বা সাহায্য না পেয়েছে।

আমি তখন ছেলেমানুষ, নানারকম দুষ্টুমি করে দিন কাটত। আমার মাথায় হঠাৎ একদিন খেয়াল চাপল—দিদিকে ভয় দেখাতে হবে। বাড়ীতে উনি একা মানুষ, ভয় দেখাবার এমন সুযোগ আর কোথায় পাব!

যেমন ভাবা তেমনি কাজ, এবং সেই রাত্রেই। ঠিক করলাম, দিদির বাড়ীর পাঁচিল লাগাও বাইরের দিকে যে বড় জাম গাছটা আছে, সন্ধ্যার পর অন্ধকারে সেই গাছটায় উঠে ভূতের অনুকরণে শব্দ করে দিদিকে এমন ভয় পাইয়ে দেব যে, তিনি সারা জীবনে ভুলতে পারবেন না।

যথা সময়ে নিঃশব্দে গাছে গিয়ে তো উঠলাম। ঘরে আলো জ্বললে, গাছের উপর দিদির ঘরটা পরিষ্কার দেখা যায়। সুযোগ বুঝে, খোনা গলায় যেমনি ডেকেছি—দিঁ দিঁ—অমনি দেখি একটা লোক তড়াক করে দিদির খাট থেকে নেমে, খাটের তলায় লুকিয়ে পড়ল।

এই যে দৃশ্যটা দেখলাম—এরপর দিদির সম্পর্কে কি ধারণা হ'বে? দিদির হয়তো সতীত্ব বলে কিছু নেই। তা' না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু তাই বলে তাঁর নারীত্বও কি সেই সঙ্গে লোপ পেয়ে গেল নাকি? মানুষের রোগে-শোকে দিবারাত্রি সেবা করে, দীন-দুঃখীকে অকাতরে দান করে, যে মহত্ত্বের পরিচয় তিনি সারা জীবনে দিয়েছেন, তার স্বতন্ত্র কোন মূল্য কি নির্ধারিত হ'বে না? নারীর দেহটাই কি সব, অন্তরটা কি কিছুই নয়? এই বাল-বিধবা যৌবনের দুঃসহ তাগিদে যদি তাঁর দেহটাকে পবিত্র না রাখতেই পেরে থাকেন, তাই বলে কি তাঁর অন্তরের অন্য সব গুণগুলিই মিথ্যে হয়ে যাবে? আমাদের কাছে কোন শ্রদ্ধাই কি তিনি পাবেন না? মানুষের প্রকৃত রূপ আমরা পাই কোত্থেকে? তার দেহের আবরণ থেকে, না তার অন্তরের আচরণ থেকে—আপনারাই বলুন? এই কারণেই আমি সতীত্ব ও নারীত্বকে পৃথক করে দেখাতে বাধ্য হয়েছি।'

এই কারণে শরৎচন্দ্র সংক্ষিপ্ত পরিসরেও উপন্যাসে নিরুদিদিকে আঁকতে চেয়েছেন এবং এই সমাজের উপর কঠিন চাবুক চালাতেও কুণ্ঠিত হননি। উপন্যাসে তাই লিখলেন, "সেই নিরুদিদির ত্রিশ বৎসর বয়সে হঠাৎ যখন পা পিছলাইয়া গেল এবং ভগবান এই সুকঠিন ব্যাধির আঘাতে তাঁহার আজীবন উঁচু মাথাটি একেবারে মাটির সঙ্গে একাকার করিয়া দিলেন, তখন পাড়ার কোন লোকই দুর্ভাগিনীকে তুলিয়া ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল না। দোষস্পর্শলেশ-

হীন নির্মল হিন্দু-সমাজ হতভাগিনীর মুখের উপরেই তাহার সমস্ত দরজা-জানালা আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। সুতরাং সে পাড়ার মধ্যে এমন একটি লোকও বোধ করি ছিল না, যে কোন-না-কোন প্রকারে নিরুদিদির সযত্ন সেবা উপভোগ করে নাই, সেই পাড়ারই একপ্রান্তে অন্তিমশয্যা পাতিয়া এই দুর্ভাগিনী ঘৃণায়, নিঃশব্দে, নতমুখে একাকিনী দিনের পর দিন ধরিয়া এই সুদীর্ঘ ছয় মাসকাল বিনা চিকিৎসায় তাহার পদস্খলনের প্রায়শ্চিত্ত সমাধা করিয়া শ্রাবণের এক গভীর রাত্রে ইহলোক ত্যাগ করিয়া যে লোকে চলিয়া গেলেন তাহার অভ্রান্ত বিবরণ যে-কোন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইতে পারিত। পৃঃ ৯৫

শ্রীকান্তর নিরুদি, রাজলক্ষ্মীর মত সংগ্রাম করতে পারেনি বলেই মৃত্যু তার কাছে অনিবার্যভাবে এসেছে। শরৎচন্দ্র উপন্যাসে এই নিষ্ঠুর-বাস্তব চরিত্রটির ভয়াবহ মৃত্যু-দৃশ্যটি অঙ্কন করে পাঠকের শেষ সহানুভূতিটুকু আকর্ষণ করেছেন। নিতান্তই দুর্ভাগিনী আমাদের নিরুদিদি।

সমাজ বিদ্রোহের অগ্নিশিখা অভয়া

"দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি' রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই; অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি।"

—চিত্রাঙ্গদা, রবীন্দ্রনাথ।

শরৎচন্দ্রের সমাজ বিদ্রোহের অগ্নিশিখা জ্বলে উঠেছে অভয়ার চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে। তাঁর গ্রন্থের মধ্যে সমাজ ও ধর্মসংস্কারের হীন দাসত্বের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক বিদ্রোহ চলেছে অভয়া তার নেতৃবৃন্দের মধ্যে পুরোবর্তিনী।

অভয়া 'চরিত্রহীন'-এর কিরণময়ী নয়। কিরণময়ীর মত অসাধারণ রূপ, বিদ্যাবুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব তার নেই, কিন্তু একটি শান্ত, স্থির ও অকুণ্ঠ বিশ্বাস আছে। অভয়ার বিদ্রোহ ভোগাসক্তিমূলক নয়, হৃদয়বোধই তার চরিত্রের প্রধান দিক। অসহায় দরিদ্র রোহিনীদাদাকে বিদ্রোহিনী অভয়া শেষ পর্যন্ত

আশ্রয় করেছে কেবলমাত্র দৈহিক সুখের জন্য নয়। তার প্রতি অসহায় রোহিনীর প্রেম অনুভব করে রোহিনীর প্রতি সহানুভূতি থেকে তার ভালবাসা জন্মেছে। সতীত্বের চেয়ে একনিষ্ঠ প্রেম যে শ্রেষ্ঠ এই মত শরৎচন্দ্র স্পষ্টভাবে দেখালেন অভয়া চরিত্র সৃষ্টি করে।

এই অভয়া চরিত্রটির বাস্তব ভিত্তি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র শৈলেশ বিশীকে যা বলেছিলেন তা বিশী মহাশয় 'বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবনপ্রশ্ন' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন—"ঐ রকমই মিস্ত্রী শ্রেণীর একজনের স্ত্রী ছিল অভয়ার মতই—সেই রকম সুন্দরী ও মার্জিত রুচি। লোকটি ছিল মাতাল, অন্য রমণীতে আসক্ত ও স্ত্রীকে ধরে মারত। এই রকম মেয়ের চাহিদা আছে। জুটে গেল তার একজন পূজারী। সে তাকে ভালবাসতো ও এই দুশ্চরিত্র ও অত্যাচারী স্বামীর হাত থেকে সব সময়ই বাঁচাবার চেষ্টা করতো। তার স্বামী যখন মদ খাবার টাকার জন্য তাঁর স্ত্রীকে মারধোর করতো, এই লোকটি তার বন্ধুকে টাকা দিয়ে মার থেকে বাঁচাতো। সেই মেয়েটির সর্বাঙ্গে নিষ্ঠুর মারের ক্ষত চিহ্ন। শত গ্রন্থি ছিন্ন মলিন বসন, এই ছিল তার আজীবন রূপসজ্জার প্রসাধন। হাতে দু'গাছি শাঁখা, কপালে সিঁদুরের রক্ত তিলক।

তায় স্বামীর এত অত্যাচার উৎপীডনেও তার বন্ধুর শত অনুনয়, বিনয়, মান, অভিমান, চোখের জল কিছুতেই সে ঐ স্বামী ছেড়ে তার সাথে স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাসের জন্য রাজী হয়নি। তাদের দুজনের মধ্যে সত্যিকার ভালবাসা ছিল। দুঃখের নিকষে তাদের ভালবাসা পরখ দুজনের মনেই হয়েছিল —সেটা তারা খাঁটি সোনা বলেই জানতো। কারণ পুরুষের পক্ষে ত্যাগ ছিল, দুঃখ বরণ ছিল, শুধু টাকা গহনা দিয়ে প্রলুব্ধ করার মতলব ছিল না। এইভাবে তারা অনেকদিন দুজনে দুজনেব মুখ চেয়ে ছিল। শেষে অনিয়ম, অত্যাচারে ঐ স্বামী মহাশয়ের ক্যানসার বা গ্যাংগীরেনের মতই একটা কিছু হয়।

দাদাকে (শরৎচন্দ্রকে) বলতে শুনেছি, রোগীর ঘরে মানুষ ঢুকতে পাবে না দুর্গন্ধে। সর্বাঙ্গ খসে পডছে তার নিদারুণ ক্ষততে, কিন্তু ঐ নারী কি নিষ্ঠার সাথেই না তার সেবা শুশ্রূষা করল। পরে সে মারা গেলে, এলো তার প্রণয়ীর কাছে—যে এতদিন তার আশাপথ চেয়ে বসেছিল।

অভয়াও ঠিক এই ছাঁচে ঢালা।"

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, শৈলেশ বিশীর গ্রন্থের বহু আলোচনায় সত্য অপেক্ষা কল্পনার স্থান অত্যন্ত বেশী, তবু এই ঘটনা সত্য বলেই আমার মনে হয়। কারণ অভয়ার বিদ্রোহীভাবের আশ্রয়স্থল যেমন রেঙ্গুন, তেমনি

বিশী মহাশয়কে কথিত শরৎচন্দ্রের উক্ত ঘটনার কথায়ও রেঙ্গুনে ঠিক এই ধরণের ঘটনার সক্রিয় প্রতিবাদ জানানোর লোকের অভাব, সেখানে বাঙালী সমাজ তেমন শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ যে ছিল না তা এই গ্রন্থেরই অন্যান্য ঘটনার মধ্যে দিয়েও প্রকাশ পেয়েছে।

বাস্তবিকই, এই অভয়ার চরিত্র-চিত্রণে কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের আধুনিকতার সুস্পষ্ট ছাপ আছে। যদিও, রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের প্রেম-জীবনে অভয়ার প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই, কিন্তু তার আত্মমর্যাদাশীল জীবনবোধ ও সমাজ সম্পর্কে সাহসী চেতনা রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তকে অসামাজিক ভালবাসার বন্ধুর পথে অগ্রসর হবার প্রেরণা যুগিয়েছে। এ ছাড়াও, সমাজের প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অভয়ার যে সংগ্রামী রূপ ফুটে উঠেছে, বাঙলা সাহিত্যে নারী চরিত্রে সে দৃঢ়তা অতি দুর্লভ। এই বলিষ্ঠ চরিত্রটিকে শরৎচন্দ্র আকাঙ্ক্ষিত পঞ্চম পর্বে আরও ফুটিয়ে তুলবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু ভবিষ্যতে তা আর সম্ভব হয়নি।

প্রেমিক কবি গহর

'...Love, a gracious and beautiful erotic art.'
—Havelock Ellis

শরৎচন্দ্র হিন্দু ও মুসলমানকে সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও জাতীয়তার ক্ষেত্রে সমদৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি সাম্প্রদায়িক, হীন-মনোভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। তাঁর লেখা 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' প্রবন্ধটি পড়লেই আমরা জানতে পারি যে, তিনি ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে গুণী ও সৎ ব্যক্তিকে কতটা শ্রদ্ধা করতেন। এই প্রবন্ধেই আছে, 'যে গুণী, যে মহৎ, যে বড়—সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, কৃশ্চান হোক, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য যা-ই হোক, স্বচ্ছন্দে সবিনয়ে তার যোগ্য আসন তা'কে দিতে পারতাম?...বাংলা সাহিত্যের সেবা করে মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা আমার অপরিসীম।'

এ ছাড়াও কাজী আবদুল ওদুদকে হাওড়া, বাজেশিবপুর থেকে ২০শে মার্চ

১৯১৮ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে আছে, 'সকল জাতির মধ্যেই ভালমন্দ লোক আছে। হিন্দুর মধ্যেও আছে, মুসলমানের মধ্যেও আছে। এই সত্যটি বিস্মৃত হইবেন না। আর একটি কথা মনে রাখিবেন যে, গ্রন্থকার কোন বিশেষ জাতি সম্প্রদায় বা ধর্মের লোক নয়। সে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদি সমস্তই।' শরৎচন্দ্রের উদার মতবাদই হচ্ছে, লেখক কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের লোক হতে পারে না, লেখক মানব সমাজের শাশ্বত প্রতিনিধি।

কবি গহর অনেকটা এই ছাঁচেই গড়া। অর্থাৎ সে কবি মানুষ, হিন্দুও নয় মুসলমানও নয়। গহর সত্যই সমস্ত জাতের ঊর্ধ্বে, সে কবি এবং প্রেমিক। প্রেমেরও কোন জাত বিচার নেই, তাই সে কমললতার মত বিধর্মী নারীকেও ভালবেসেছিল—কোন জাত-বিচার করেনি। আসলে শরৎচন্দ্র কবি গহরকে দেখিয়েছেন ; মুসলমান গহরকে দেখানো তাঁর উদ্দেশ্য নয়। শরৎচন্দ্রের এমন কোন মুসলমান বন্ধু থেকে থাকলেও ঢাকায় 'মিলন পরিষদে'র একটি ঘরোয়া বৈঠকে আলোচনাকালে বলেছিলেন, 'শ্রীকান্তে'র গহর কিন্তু আমার দেখা চরিত্র, রিয়েল ক্যারেকটার।' তিনি কল্পনার আশ্রয় নিয়ে তাকে প্রেমিক করে তুলেছেন। গহর তাই মুসলমান চরিত্র হয়ে দেখা দেয়নি, একটি প্রেমিক চরিত্র হিসাবেই ফুটে উঠেছে।

শরৎচন্দ্র বৈষ্ণব ধর্ম পছন্দ করতেন এবং তাঁর মনও ছিল অত্যন্ত কোমল। তিনি হৃদয়বাদী সাহিত্যিক, প্রেম তাঁর সাহিত্যে সর্বপ্রধান উপজীব্য। তাই গহর মুসলমান হয়েও কমললতাকে এমন করে ভালবাসতে পেরেছিল।

শরৎচন্দ্র বাঙলার পল্লী-প্রকৃতির গাছপালা, লতা-গুল্ম, ফুল-ফল অত্যন্ত ভালবাসতেন। চতুর্থ পর্বে তাই তিনি আবার নিজ জন্মস্থান দেবানন্দপুরে যেন ফিরে এসেছিলেন। চতুর্থ পর্বটি যেন একটি কাব্যগ্রন্থ—গদ্যকাব্য। গহরের মাধ্যমে তিনি গ্রামের বসন্ত প্রকৃতির শোভাকে ফুটিয়ে তুললেন। উপন্যাসে তাই প্রকৃতির সঙ্গে এক নিবিড় প্রাণের সম্পর্ক ফুটে উঠল। এখানে গাছের সঙ্গে প্রাণের যে বিশুদ্ধ সুর বেজে উঠেছে তার তুলনা একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের উপন্যাসে (বা গল্পে) ছাড়া বাংলা সাহিত্যের অন্যত্র দুর্লভ।

'মহেশ' গল্পের গফুরের মধ্যে যেমন একান্তভাবে পশুপ্রীতি ছিল, গহরের মধ্যে তেমনি একান্তভাবে প্রকৃতি-প্রীতিই ফুটে উঠেছে। শরৎচন্দ্রের কবি মানসই গহরকে সৃষ্টি করে। শরৎচন্দ্রের শেষ জীবন যখন সুখ ও স্বাচ্ছন্দে ভরপুর তখনও তিনি কলকাতার জনারণ্যে বসবাস করতে চাইতেন না, সুযোগ পেলেই

চলে যেতেন রূপনারায়ণের তীরে নিরালা পরিবেশে। গ্রামের নিরালা শান্ত পরিবেশ শরৎচন্দ্র পছন্দ করতেন। তিনি প্রকৃতি-পন্থী, সহজিয়া।

গহর শ্রীকান্তের মতই নিঃসঙ্গ। সে কবি, ভাব সাধনাই তার ধর্ম। গহরের সমাজ মুসলমান-সমাজ হলেও সে খাঁটি বাঙালী, তার সাধনাও বাঙালী-সাধনা অর্থাৎ সে-ও প্রকৃতি-পন্থী, সহজিয়া; সে শাক্ত নয়, সে বৈষ্ণব—সে মাধুরীর সাধনা করে। গহরের কবি-জীবনেও যেমন, তেমনি তার প্রেমিক-জীবনেও আকাশের মত একটা নির্মলতা আছে। গহর তাই উপন্যাসে সন্ধ্যাতারার মত দীপ্তি পাচ্ছে।

গহর ছাড়া সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে আর যে কটি মুসলমান চরিত্র প্রাধান্য লাভ করেছে তার মধ্যে 'মহেশ' গল্পের গফুর ও 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের আকবর লাঠিয়ালই প্রধান, অপর একজন 'দেনাপাওনার ফকির সাহেব। আকবর, গফুর এবং ফকির সাহেবের চরিত্রের পরিকল্পনা যতই সার্থক ও সহানুভূতিপূর্ণ হোক না কেন, এদের ভিতর দিয়ে বাংলার বৃহত্তর মুসলমান সমাজের সামগ্রিক পরিচয়ের একাংশও প্রকাশ পায়নি। মুসলমান বলে কিন্তু গফুরের প্রতি অত্যাচার হয়নি, হয়েছে দরিদ্র ও অসহায় বলে। সমাজের এমন অত্যাচারের কথা তাঁর অন্যান্য গল্প-উপন্যাসেও আছে। আর, মুসলমান নারী চরিত্র বলতে ঐ একমাত্র আমিনা—যা উল্লেখযোগ্য এমন কিছুই নয়।

সুতরাং বাঙলার মুসলমান সমাজের সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের সুগভীর বাস্তব জ্ঞান ছিল এ কথা বলা যায় না। গফুর, আকবর লাঠিয়াল, ফকির সাহেব, আমিনা অথবা গহর প্রভৃতি চরিত্রগুলি যদি হিন্দু বাঙালী হত তাহলেও চরিত্রগুলির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হত না। সুতরাং মনে হয়, গহর চরিত্রটিও শরৎচন্দ্রের একটি কল্পনা-প্রসূত সৃষ্টি।

তবে, গহর চরিত্রটি যে একেবারেই কল্পিত চরিত্র নয়, এর যে সামান্য বাস্তব ভিত্তি আছে তার কিছুটা পরিচয় মিলবে দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তমুন্সীর 'দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধ থেকে এবং কালিদাস রায়ের সঙ্গে আলোচনার অংশে। দত্তমুন্সী মহাশয় তাঁর প্রবন্ধের এক স্থানে লিখেছেন, "সময়ে সময়ে দুই বন্ধুতে (শরৎচন্দ্র ও সতীশচন্দ্র) মিলিয়া সন্ধ্যার পর জেলের ডিঙ্গি চড়িয়া গ্রাম হইতে তিন চার মাইল দূরবর্তী কৃষ্ণপুর গ্রামের শ্রীশ্রী৺রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আখড়া বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইতেন। এই আখড়া বাড়ীর নিকটে তাহাদের সমবয়স্ক 'গফুর' নামে এক মুসলমান বন্ধু ছিল এবং সে আখড়া বাড়ীতে কীর্ত্তনেও যোগদান করিত। এই 'গফুরে'র পিতামাতাও অনেকটা

হিন্দু ভাবাপন্ন ছিলেন। কৃষ্ণপুরের এই আখড়া বাড়ী শ্রীকান্ত উপন্যাসের ৪র্থ পর্বে 'মুরারিপুরের আখড়া বাড়ী' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই আখড়া বাড়ী আজিও রহিয়াছে এবং মাঘ মাসের প্রথম দিবসে উক্ত কায়স্থ বংশোদ্ভব রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর মহোৎসব সম্পন্ন হয় ও একটি ছোটখাট মেলাও বসে।"

উপরিল্লিখিত উদ্ধৃতিটুকু বিশ্বাসযোগ্য এই কারণে যে, আখড়া বাড়ীর সত্যতা বর্তমান লেখকের যাচাই করা আছে তবে, বর্তমানে মহোৎসবের প্রশ্নটি আর আসে না বটে, কিন্তু ছোটখাট মেলা আজও প্রতি বৎসর মাঘ মাসের প্রথম দিনে বসে। শরৎচন্দ্র গফুর নামধেয় ব্যক্তিটির নাম পরিবর্তন করে 'গহর' নামটি উপন্যাসে ব্যবহার করতে পারেন এবং ছেলেবেলার ঐ মুসলমান বন্ধুটিকে স্মৃতির পাতায় রেখে দিতে পারেন। চতুর্থ পর্বটিতে শরৎচন্দ্র নিজ জন্মভূমি দেবানন্দপুরের বহু কথাই উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন। উক্ত 'গফুরে'র পিতামাতা অনেকটা হিন্দু ভাবাপন্ন হতে পারেন এবং তাঁদের আখড়া বাড়ির কীর্তনে অংশগ্রহণ করাও অসম্ভব কিছুই নয়। তবে ছেলেবেলার এই বন্ধুটিকে হুবহু উপন্যাসে চিত্রিত করা মোটেই সম্ভব নয়, কারণ শ্রীকান্তের সঙ্গে গহরের বন্ধুত্বের যে চিত্র দেওয়া হয়েছে তা মোহের নিবিড়তায় ও দুঃসাহসের উদ্দীপনায় ইন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রীতি-সম্পর্কের কাছাকাছিও যেতে পারে না। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রাজেন্দ্রনাথের যেরূপ যোগাযোগ ও অন্তরের গভীর হৃদ্যতার পরিচয় ঘটেছিল, নিশ্চয়ই 'গফুর' নামধেয় বন্ধুটির সঙ্গে তেমন নিবিড় এবং দীর্ঘকালীন বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি। এবং শৈশব-স্মৃতি ও কৈশোর-স্মৃতি এক হতে পারে না, তাই গহর চরিত্রের রূপায়ণের মধ্যে কল্পনার মাত্রাধিক্য ঘটেছে। কবিশেখর কালিদাস রায়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের যে কথোপকথন ঘটে তা থেকেই আমাদের বক্তব্যের প্রমাণ মিলবে।

কালিদাস বাবু বললেন—আচ্ছা দাদা, শ্রীকান্তে সম্পূর্ণ কল্পিত চরিত্র কি একেবারে নেই?

শরৎচন্দ্র বললেন—তা আবার নেই! তা না থাকলে অত বড় একখানা বই গড়ে ওঠে? কোন্ চরিত্রগুলো কল্পিত, তা তুমি নিজেই বুঝতে পারবে।

কালিদাসবাবু বললেন—পিয়ারী, সুনন্দা, কমল, রোহিণী, বজ্রানন্দ এ সবই কল্পিত। একটি মুসলমান চরিত্র ইচ্ছা করেই বই-এ সন্নিবিষ্ট করেছেন। এর একটা কারণও ছিল।

শরৎচন্দ্র বললেন—যেমন, গহর।

শরৎচন্দ্র পরে বললেন—গহর পুরা কল্পিত নয়—প্রত্যক্ষ দৃষ্ট চরিত্রের উপর রঙ চড়ানো ও রসান দেওয়া। কমললতাও তাই।

* * * * *

কালিদাস বাবু বললেন—৪র্থ পর্বে কি কবিত্বেরই না ছড়াছড়ি করেছেন। আমার তো মনে হয়, আপনি যে একজন প্রথম শ্রেণীর বড় কবি, তাই জানাবার জন্যই ৪র্থ পর্ব লিখেছেন। ছন্দে না লিখলে কি কবি হওয়া যায় না? ৪র্থ পর্বে বৈষ্ণবের আখড়ার চিত্রটি তো একখানি অপূর্ব কাব্য। কমললতাকে তো রূপ গোস্বামীর নাটকের চরিত্র বললেই হয়। শুধু গদ্যে কবিতা লেখেন নি, একটি কবিকেও আমদানি করেছেন। গহর তো জীবন্ত কবিতা। —আর আউশফুলের গন্ধে ভরা যশোদা বৈষ্ণবীর পড়োভিটের কথা?"

গহর যে একটি 'জীবন্ত কবিতা' হয়ে উপন্যাসে সন্ধ্যাতারার মত দীপ্তি পাচ্ছে তা দেখান হল; পরে কমললতা যে 'রূপ গোস্বামীর নাটকের চরিত্র' তা দেখাবার চেষ্টা করব। তবে গহর চরিত্রটির মধ্যে একজন, কবি নজরুল ইসলামের স্বভাবের অনেকটা মিল খুঁজে পেয়েছিলেন এবং দুজনেরই চালচলনে একটা উপচে-পড়া ভাব লক্ষ্য করে শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করায় শরৎচন্দ্র নাকি বলেছিলেন, 'ঐ তোমাদের বড় দোষ। কোন চরিত্রকে তার দিক থেকে তোমরা বুঝতে চাও না, তাকে কারুর সঙ্গে জুড়ে দিতে পারলেই তোমাদের মনে শান্তি হয়। যেমন, 'পথের দাবী'র সব্যসাচীকে কেউ বলে সুভায, কেউ বলে রাসবিহারী বোস……।"

গহরকে শরৎচন্দ্র এমন হৃদয়বান পল্লীকবি করে এঁকেছেন যে তার মানবিক রূপ অনবধানী পাঠকেরও অন্তর স্পর্শ করবে। এই প্রেমিক কবি-স্বভাব বিশিষ্ট মানুষটির মৃত্যুতে পাঠক অন্তরও কেঁদে ওঠে।

উৎস নির্দেশ

(১) শরৎচন্দ্র, ২য় খণ্ড—গোপালচন্দ্র রায়। পৃঃ ১০৫-৬

মুক্তপুরুষ বজ্রানন্দ

'নির্জন পথে জ্যোৎস্না-আলোতে সন্ন্যাসী একা যাত্রী।'

—রবীন্দ্রনাথ

এই বজ্রানন্দ কি স্বামী বেদানন্দ? তৃতীয় পর্বের এই আনন্দ-র চরিত্রটি কি শরৎচন্দ্রের মেজভাই সন্ন্যাসী প্রভাসচন্দ্রেরই প্রতিকৃতি? অসম্ভব কিছুই নয়। বড় ভালবাসতেন শরৎচন্দ্র, তাঁর এই মেজ ভাইটিকে। তাই হয়তো এমন করে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে প্রভাসচন্দ্রকে ধরে রেখেছেন। প্রভাসচন্দ্রের নামই স্বামী বেদানন্দ। বেদানন্দ ছিলেন সন্ন্যাসী। তৃতীয় পর্বটি অবশ্য ১৩২৭ সালের পৌষ-ফাল্গুন ও ১৩২৮ সালের বৈশাখ, আষাঢ়, ভাদ্র-আশ্বিন ও পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রথম আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় চৈত্র ১৩৩৩ সাল, ইং ১৮ই এপ্রিল ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে। আর, প্রভাসচন্দ্রের মৃত্যু সম্পর্কে আমরা জানতে পারি শরৎচন্দ্রেরই লেখা একটি পত্র থেকে। লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে সামতাবেড় থেকে ১৩ই কার্তিক, ১৩৩৩ সালের লেখা একটি চিঠিতে আছে, "আমার মেজ ভাই প্রভাস সন্ন্যাসী ছিলেন; বোধ করি শুনিয়া থাকিবে। তিনি দিন কয়েক পূর্বে বর্মা হইতে ফিরিয়া মঙ্গলবার রাত্রে অসুখে পড়েন। ক্রমাগতই বলিতে লাগিলেন, বারম্বার অসুখে এ দেহ অপটু হইয়া পড়িয়াছে, ইহা পরিত্যাগ করাই প্রয়োজন। পরের দিন বেলা একটায় ঘর ও বিছানা ছাড়িয়া নিজে বাহিরে আসিলেন এবং আমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন। দিদি, আমি, বৌ ও প্রকাশ আমরাই শুধু ছিলাম।" অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে প্রভাসচন্দ্র ওরফে বেদানন্দের মৃত্যু হয় ১০ই কার্তিক, ইং ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ। প্রায় মাস ছ'য়েক পর 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্ব পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং সন্ন্যাসী বজ্রানন্দর কথা এই পর্বের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। আনন্দ প্রসঙ্গ চতুর্থ পর্বতেও তাই শেষ হয়নি। প্রভাসচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় পাঁচ বৎসর পর শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্ব লেখেন। সুতরাং আমাদের মনে এই ধারণা হওয়াটাই স্বাভাবিক যে, উপন্যাসে এই সন্ন্যাসী চরিত্রটির পরিকল্পনা খুব সম্ভবত শরৎচন্দ্রের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী মেজ ভাই প্রভাসচন্দ্রকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

সৎ সন্ন্যাসীদের প্রতি শরৎচন্দ্রের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। এই অনুরাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'দেনা-পাওনা'র ফকির সাহেব ও 'শ্রীকান্তর' বজ্রানন্দ। সত্যাশ্রয়ী কর্মী সন্ন্যাসীদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার প্রকাশ পাই নিম্নোদ্ধৃত পত্রে। প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায়কে ২৭শে বৈশাখ, ১৩৪১ তারিখে লেখা পত্রে আছে, "আপনার সঙ্গে আমার না আছে দেখা সাক্ষাৎ না আছে পত্র ব্যবহার, তবু একথা সত্য যে আপনাকে আমি গভীর শ্রদ্ধা করি কর্মী বলে, সত্যাশ্রয়ী সন্ন্যাসী বলে।" শরৎচন্দ্রের মেজ ভাই প্রভাসচন্দ্রও এমনি কর্মী ও সত্যাশ্রয়ী সন্ন্যাসী ছিলেন।

অনিলা দেবী মতিলালের প্রথম সন্তান; শরৎচন্দ্রই প্রথম পুত্র সন্তান। মতিলালের তৃতীয় ও চতুর্থ সন্তান শিশুকালেই মারা যায়। পঞ্চম সন্তান প্রভাসচন্দ্র এবং তার ছোট দুই ভাই বোন প্রকাশচন্দ্র ও সুশীলা দেবী। এক দিন শরৎচন্দ্র পিতা মতিলালের মৃত্যুর পর নাবালক ভাই বোনদের নিয়ে চোখে অন্ধকার দেখেছিলেন। প্রভাসচন্দ্রের বয়স তখন ১৪।১৫ বৎসর; ভাগলপুর স্টেশন মাস্টারের কাছে তিনি কাজ শেখবার জন্য গিয়েছিলেন। ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্রের বয়স তখন সাত কি আট, তার পর ছোট বোন। পিতৃ-মাতৃহারা ভাইবোন। এদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে রেখে নিঃস্ব ও দুর্দশাগ্রস্ত শরৎচন্দ্রকে ভাগ্যান্বেষণে সুদূর ব্রহ্মদেশে রোজগারের উদ্দেশ্যে যেতে হয়েছিল। তারপর তিনি যখন প্রতিষ্ঠার স্বর্ণ-শিখরে তখনই এই ভাইদের প্রতি তাঁর প্রীতি ও স্নেহের ধারা বয়ে গিয়েছিল।

প্রভাসচন্দ্র স্বামী বেদানন্দ নামে বহু বৎসর বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-শ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসী হলেও মাঝে মাঝে দাদার কাছে এসে থাকতেন। প্রভাসচন্দ্রের শরীর বড় ভাল ছিল না তাই মাঝে মাঝেই অসুখে ভুগতেন। আর অসুস্থ হলেই দাদার স্মরণ নিতেন এবং সুস্থ হয়েই নিজের আশ্রমে ফিরে যেতেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র কংগ্রেস অধিবেশনে দিল্লী যাওয়ার পর প্রভাসচন্দ্রকে দেখবার জন্য বৃন্দাবন গিয়েছিলেন এবং তাঁর আশ্রমে কয়েকদিন কাটিয়েও এসেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন দিলীপ কুমার রায়। শরৎচন্দ্র তাঁর 'দিন-কয়েকের ভ্রমণ-কাহিনী' প্রবন্ধে তাঁর এই বৃন্দাবন ভ্রমণের কথা লিখেছেন।

প্রভাসচন্দ্র সন্ন্যাসী মানুষ বলে শরৎচন্দ্রের কাছে এলে তাঁর আদর যত্নের আর সীমা থাকত না। এই চিত্রটি 'শ্রীকান্তে'র চতুর্থ পর্বে ৬৮১ পৃষ্ঠায় সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন আনন্দ, রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের মাধ্যমে। শরৎচন্দ্রের

স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীও প্রভাসচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাই বুঝি উপন্যাসের এই স্থানে আছে, "তাঁর অনুরোধেই ত এতদূরে এলে।

আনন্দ কহিল, নেহাৎ মিথ্যে নয় দাদা। ওঁর অনুরোধ ত অনুরোধ নয় যেন মায়ের ডাক। পা আপনি চলতে সুরু করে। কত ঘরেই ত আশ্রয় নিই কিন্তু ঠিক এমনিই আর দেখিনি।"

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কাজে প্রভাসচন্দ্রকে মাঝে মাঝে ভারতের বাইরেও যেতে হত। ১৩৩৩ সালে তিনি একবার রেঙ্গুনে গিয়েছিলেন। রেঙ্গুন থেকে ফিরে তিনি সামতাবেড়ে দাদার কাছে কয়েকদিন ছিলেন। সেই সময়েই তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং একদিন শরৎচন্দ্রের বুকের উপর মাথা রেখে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

স্নেহাস্পদ ভাই-এর আকস্মিক মৃত্যুতে শরৎচন্দ্র শোকে অতিশয় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তারই প্রকাশ পাই শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন জনকে লেখা কয়েকটি পত্র থেকে। প্রভাসচন্দ্রের মৃত্যুর তিন দিন পরই (১৩ই কার্তিক) লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে পূর্বোল্লিখিত পত্রটি দেন এবং ২২শে কার্তিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন, "কেদারবাবু, বলিবার কিছু আর নাই। বাড়ীর একটা পশুপক্ষীর মৃত্যুও যাহার সহে না তাহার বলিবার আছেই বা কি। একবার আপনাদের কাছে গিয়া বসিবার বড় ইচ্ছা করে, আর ভাবি ভিতরে ভিতরে আমি যে এতবড় দুর্বল ছিলাম একথা তো জানিতাম না। এ ব্যথা (ভ্রাতৃ বিয়োগের) আমার সহিবে কি করিয়া?"

ঐ একই তারিখে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কেও যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতেও তাঁর শোকের কাতরতা প্রায় একই ভাষায় প্রকাশ পেয়েছিল, 'এই আকস্মিক ছোট ভাইয়ের শোক আমাকে যেন প্রতিনিয়ত দগ্ধ করিতেছে।' আবার এক সপ্তাহ পরেই ১৮ই কার্তিকে শরৎচন্দ্র উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এই মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে পত্র দেন।

প্রভাসচন্দ্রের মৃতদেহ সৎকার করে শরৎচন্দ্র রূপনারায়ণের তীরে বাড়ির উঠানের পাশেই তাই একটি সমাধি-বেদী নির্মাণ করেছিলেন। প্রতি সন্ধ্যায় নিজের হাতে প্রদীপ জেলে তিনি সমাধি স্থানে রেখে আসতেন। শুধু তাই নয়, তিনি প্রতি বৎসর প্রভাসচন্দ্রের মৃত্যু দিবসে তাঁর সমাধি বেদীর কাছে কীর্তন গানের আয়োজন করতেন এবং কীর্তন শেষে সেই উপলক্ষে গ্রামের লোকজনকে খাওয়াতেন।

প্রভাসচন্দ্রের মৃত্যুর আট বৎসর পরে শরৎচন্দ্র উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে

যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে এই মৃত্যু-দিবস পালনের কথা উল্লিখিত আছে। শরৎচন্দ্র উক্ত পত্রে লিখেছিলেন, "………কালিয়া (যশোর) থেকে পরশু রাত্রে ফিরেচি, আজ বাড়ী যাচ্চি। কাল আমার লোকান্তরিত মেজ ভাই বেদানন্দর মৃত্যুর দিন, তার সমাধির কাছে দু-পাঁচজনকে নিয়ে বসতে হয়। দেশের দশজন খায় দায়, কীর্তন করে। এই জন্যে যাওয়া।" (৯ই কার্ত্তিক, ১৩৪১)

শরৎচন্দ্র ব্রাহ্মণ সন্তান। সাধারণ ভাবে তাঁর মনে ধর্ম সংস্কারের স্থান ছিল। দেবতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল। ধর্মস্থানের প্রতিও তাঁর স্বাভাবিক ভাবে একটা মোহ ছিল। তাই তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি বার বার কাশী-বৃন্দাবনের মত পবিত্র তীর্থে গিয়ে জীবনে শান্তি খুঁজেছে, কারণ এই তীর্থস্থানগুলির প্রতি তাঁরও যথেষ্ট শ্রদ্ধাভাব ছিল। প্রভাসচন্দ্র বৃন্দাবনে থাকতেন। শরৎ-সাহিত্যে কাশীর মত বৃন্দাবনও অনুরূপভাবে সন্তপদের আশ্রয়স্থল। 'পণ্ডিতমশাই'-এ চরণ ও মাকে হারিয়ে বৃন্দাবন কুসুমকে নিয়ে বৃন্দাবনের পথে পা বাড়িয়েছে, 'বামুনের মেয়ে'-তে অভাগিনী সন্ধ্যা নিরীহ ভাগ্যহীন পিতা প্রিয়বাবুকে নিয়ে বৃন্দাবনের জন্য ট্রেন ধরেছে, তাদের সঙ্গী হিসাবে স্টেশনে জুটে গিয়েছে আর এক দুর্ভাগিনী, দুর্বৃত্ত গোলক চাটুয্যের পদস্খলিতা শ্যালিকা জ্ঞানদা। 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বে বৈষ্ণবী কমললতা সব ছেড়ে রাধামাধবের চরণে আশ্রয় নিতে মুরারিপুর আখড়া থেকে বৃন্দাবনের পথে বার হয়েছে।

এই প্রভাসচন্দ্রের যেমন স্বভাব-চরিত্র ছিল শরৎচন্দ্র তাই বজ্রানন্দর মধ্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। শরৎচন্দ্রের লেখায় ধর্মের শুষ্ক আচার অনুষ্ঠানের দিকটি বারংবার নিন্দিত হয়েছে, ভণ্ডামি ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বহু মন্তব্য আছে এবং ভগবানের মহিমা নিয়েও তিনি কমই লিখেছেন। শ্রীকান্তের সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গলাভের বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল (শরৎচন্দ্রেরও ছিল)। কিন্তু বজ্রানন্দ শ্রীকান্তের কাছে এক নতুন মানুষ হিসাবে দেখা দিয়েছিল। সন্ন্যাসীর এই নব মূল্যায়ণ শরৎচন্দ্রের বিচিত্র ধর্ম-চেতনার অবদান।

নির্বিকার নির্লিপ্ততার মধুরতম পরিচয় আছে স্বামী বজ্রানন্দর চরিত্রে। সে ধনীর ছেলে, কিন্তু সংসারের কোন আকর্ষণই তাকে ধরে রাখতে পারেনি। প্রথম যৌবনে—মানুষের ভোগের আকাঙ্ক্ষা যখন সব থেকে উগ্র থাকে—বজ্রানন্দ অতি সহজে সকল বন্ধন ছিন্ন করে দেশের ও দশের কাজে অনিশ্চিতের আহ্বানে বার হয়ে এসেছে। অথচ সংসারের প্রতি তার কোন বিরূপতা নেই।

সে ঈশ্বরোপাসক সন্ন্যাসীও নয়। ভোজনের প্রতি তার বিশেষ দৃষ্টি ; রাজলক্ষ্মীর একান্ত নিভৃত ঘরকন্নার মধ্যে সে নিজেকে অতি সহজেই সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। অথচ কারও জন্য তার বন্ধন নেই ; সকলের জন্য মমতা আছে কিন্তু বিশেষ কারও জন্য মায়া নেই। সে যেমন অনায়াসে আসে তেমনি অনায়াসে সরে যায়। বীরভূমের পল্লীতে গিয়ে ইস্কুল করে, চিকিৎসা করে, নানা উপায়ে দেশের উন্নতি করতে সে আত্মনিয়োগ করে, কিন্তু সেখানেও সেই নির্লিপ্ততা। যেদিন কাজ শেষ হল, অমনি চলে এল ; সকলের সপ্রশংস কৃতজ্ঞতা একদিনের জন্যও তাকে ধরে রাখতে পারেনি। সকলকে ভালবাসে বলেই কোন বিশেষ লোককে নিয়ে সে আবদ্ধ থাকতে পারে না ; সংসারকে ছেড়েই সে সংসারকে নিবিড় ভাবে পেয়েছে। তার মধ্যে অতিথির ক্ষণিকতা, গৃহীর আসক্তি ও সন্ন্যাসীর নির্লিপ্ততার সমন্বয় হয়েছে।

বজ্রানন্দ নিজের দেশকে আন্তরিক ভাবেই ভালবাসত। শরৎচন্দ্র লিখেছেন, 'সাধুজী, তুমি যেই হও, এই অল্প বয়সেই আমার এই কাঙাল দেশটিকে তুমি ভাল করিয়াই দেখিয়াছ।' আনন্দ সন্ন্যাসী, কিন্তু তার ধর্মাচরণ অনেকখানি কর্তব্যতন্ত্রের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে, ভগবদ্ভক্তি ভগবানের সৃষ্টির সেবায় এবং আপন জীবনের নিঃস্বার্থ পবিত্র কল্যাণধর্মে মিশে গেছে। অথচ সাধারণ ভাবে শরৎচন্দ্র সাধু-সন্ন্যাসী, আশ্রম প্রভৃতির সততা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত না হলে সেগুলির প্রতি সরাসরি প্রসন্ন মনোভাব দেখাতেন না মোটেই। কারণ, সাধু-সন্ন্যাসী আশ্রম সম্পর্কে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। তাই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বজ্রানন্দের মত চরিত্র সৃষ্টি, বোধ করি, বেদানন্দ স্বামীকে না দেখলে বা না জানলে সৃষ্টি হত না। মহৎ মানুষকে তিনি যথার্থই শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। 'দেনাপাওনা'র মহৎ মানুষ ফকির সাহেব, চরিত্র হিসাবে যেমন উজ্জ্বল, তেমনি শ্রদ্ধার্হ। বেদানন্দ, উপরন্তু, শরৎচন্দ্রের আপন ছোট ভাই, যিনি অকালেই শরৎচন্দ্রেরই কোলে মাথা রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হন। শরৎচন্দ্র যথার্থই এই ভাইটিকে ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন।

বেদানন্দের মত বজ্রানন্দও সংসার সম্পর্ক মুক্ত, অথচ বৃহত্তর সংসারের সকল মা-বোনের স্নেহের বাঁধন সে অস্বীকার করতে পারে না। সে এসেই রাজলক্ষ্মীর স্নেহ-যত্নের একটি মোটা অংশের উপরে যখন দাবী জানিয়ে বসে তখন শ্রীকান্ত এই সরস, উদার, প্রাণ-খোলা নবীন সন্ন্যাসীটিকে পছন্দ না করে থাকতে পারে না। মেজ ভাই বেদানন্দের স্মৃতিই এমন মহৎ চরিত্রের উৎপত্তি বলে মনে হয়। শরৎচন্দ্র নিজের মনমত এমন চরিত্র সৃষ্টি করেছেন

যা আমাদের স্বামী বিবেকানন্দকেও স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই সন্ন্যাসী বজ্রানন্দ যেন ততটা সাধারণ মানুষ নন, যতটা দেশপ্রীতির নিবিড় বেদনা-বোধের মূর্ত প্রকাশ। বাঙলা দেশের গ্রামবাসীদের চোখে বজ্রানন্দ সত্যই দেবতা। বজ্রানন্দ দ্বারা উপকৃত এক গ্রাম্য-বৃদ্ধ তাঁর সম্পর্কে তাই উক্তি করেন, 'মশাই, আমি গরীব, যা পারি তাঁর সেবা করি। কিন্তু এ যেন বিদুরের গৃহে শ্রীকৃষ্ণ। মানুষ ত নয়, মানুষের আকৃতিতে দেবতা।' কিন্তু এই আনন্দ চরিত্রটির পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করল না। পরবর্তী পঞ্চম পর্বে (পঞ্চম পর্ব লিখবেন বলে শরৎচন্দ্র দিলীপ কুমার রায়কে পত্র দিয়েছিলেন) শরৎচন্দ্র কি লিখতেন কে জানে ! তবে একথা ঠিক যে, বেদানন্দ ও বজ্রানন্দ নামে ও স্বভাবে বড় মিল।

পুরাতন ভৃত্য রতন

"হেরি তার মুখ ভরে ওঠে বুক, সে যেন পরম বিত্ত—
নিশিদিন ধ'রে দাঁড়ায়ে শিয়রে মোর পুরাতন ভৃত্য ॥
—রবীন্দ্রনাথ

রতন রাজলক্ষ্মীর বিশ্বস্ত ভৃত্য। মূলে রাজলক্ষ্মীর ভৃত্য হলেও শেষ পর্যন্ত শ্রীকান্তের সেবকে অর্থাৎ পুরাতন ভৃত্যে পরিণত হয়েছে। এই রতনকে উপন্যাসের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে সামান্যই পাওয়া গেছে। পিয়ারী বাইজী যখন শ্রীকান্তকে প্রথম ডেকে পাঠায় তখন রতন শ্রীকান্তকে তার পরিচয় দিয়েছিল এইভাবে :

'জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন সাক্ষাৎ করিতে চায় ?

তা জানিনে।

তুমি কে ?

আমি বাইজীর খানসামা।

তুমি বাঙ্গালী ?

আজ্ঞে হাঁ—পরামাণিক। নাম রতন।

বাইজী হিন্দু ?

রতন হাসিয়া বলিল, নইলে থাকব কেন বাবু?' (পৃঃ ৮৭)

১৫৭ পৃষ্ঠায় 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র দু'একবার আমরা রতনের সন্ধান পেয়েছি। একবার তাকে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের খোঁজে শ্মশানে পাঠিয়েছিল এবং তারপর রাজলক্ষ্মীর ফিরে যাবার সময়ে রতনের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং শেষে শ্রীকান্ত যখন রাজলক্ষ্মীর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে তখন রতন প্রসঙ্গ এসেছে। এই পর্ব-তে রতনকে তেমন গুরুত্বই দেওয়া হয়নি।

শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে ছিলেন তখন কোন ভৃত্য তাঁর ছিল বলে জানা যায় না। হয়তো ছিল না। কিন্তু হাওড়ায় বাজে শিবপুর এবং সামতাবেড়ে থাকাকালীন কয়েকজন ভৃত্যের সন্ধান আমরা পাই। এদের মধ্যে একজন ভোলা অপরজন ননী। এই ভোলা ও ননী উভয়েই শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং তারা ছিল তাঁর নিত্য সহচর। বাজে শিবপুর ও শিবপুরে শরৎচন্দ্র সাকুল্যে প্রায় দশ বৎসর অতিবাহিত করেন এবং সামতাবেড়ে প্রায় নয় বৎসর। এর মধ্যে প্রায় ১২।১৩ বৎসর ভোলা শরৎচন্দ্রের বিশ্বস্ত ভৃত্য হিসাবে ছিল। ভোলা ছিল উড়িষ্যাবাসী। দেশে তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা থাকাতে তাকে মাঝে মধ্যে ছুটি নিয়ে বাড়ি যেতে হত। কিন্তু ভোলার কাজে শরৎচন্দ্র খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। যেখানেই যেতেন তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। আমরা জানি শরৎচন্দ্রের দিল্লী ও বৃন্দাবন ভ্রমণ প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা 'দিন কয়েকের ভ্রমণ কাহিনী'তে ভোলাকে স্পষ্টভাবে 'বাহন' বলে গেছেন। শরৎচন্দ্রের কৈশোর জীবনের লীলাভূমি ভাগলপুরেও ভোলাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভোলাও সেই কারণে শরৎচন্দ্রের সমস্ত বন্ধু-বান্ধব এবং তাঁদের বাড়ির ঠিকানাও জানত। তাই এই ভোলাকে দিয়ে তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় বহু কাজই সারতেন। ভোলা শেষ পর্যন্ত তার দেশের বাড়ির প্রয়োজনে শরৎচন্দ্রকে ছেড়ে চলে যায়। শরৎচন্দ্র তাকে সেই সময় যথেষ্ট বকশিস দিয়েছিলেন।

এরপর ননী তাঁর সামতাবেড়ের বাড়িতে কাজ করত এবং ভোলার মত সে-ও শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয় ভৃত্যে পরিণত হয়েছিল। ননীকে ছাড়াও শরৎচন্দ্রের চলত না। ভোলার অভাব এই ননীই পূরণ করেছিল বটে কিন্তু ননী হঠাৎ একদিন সাপের কামড়ে মারা যায়। ননীর ঐভাবে মৃত্যু হওয়ায় শরৎচন্দ্র খুবই আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি তাই যতদিন জীবিত ছিলেন, ননীর পরিবারবর্গকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করেছিলেন, এমন কি তাঁর মৃত্যুর পর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীও তাদের ঐ বরাদ্দ অর্থ দিয়ে যেতেন।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব প্রকাশিত হয়। এই তুজন বিশ্বস্ত ভৃত্যের ছায়া তাই স্বভাবতই উপন্যাসের রতন চরিত্রে এসে থাকবে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের থেকেও তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব-তে রতন আধিক্য লাভ করেছে। আধিক্য লাভের প্রধান কারণ এই সময়ে তাঁর ভৃত্য সম্পর্কে বেশ অভিজ্ঞতা লাভও ঘটেছে। তাই আমরাও একটি বিশ্বস্ত ভৃত্যের সন্ধান পেয়েছি। এমন বিশ্বস্ত ভৃত্যের চিত্র আর কোথাও নেই। শরৎ সাহিত্যেও এমন তুই একজন ভৃত্যের সন্ধান আমরা পেয়েছি। সতীশের বিহারী, দেবদাসের ধর্মদাস এবং শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর রতন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। 'সৃষ্টির অন্তরালে শরৎচন্দ্র' আলোচনায় আমি দেখিয়েছি শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথের পরিবারের মুশাই চাকরকে শরৎচন্দ্র অমর করে রাখবার জন্য 'দেবদাসে' ধর্মদাসকে এঁকেছিলেন। ঠিক তেমনি রতনেরও একটি বাস্তব ভিত্তি নিশ্চয়ই আছে এবং সেটি ভোলা ও ননীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কারণ শরৎচন্দ্র অধিকাংশ দেখা চরিত্রকেই তাঁর সাহিত্যে স্থান দিতেন। অবশ্য শরৎচন্দ্র কৌশলে উপন্যাসের খাতিরে রতনকে রাজলক্ষ্মীর ভৃত্যে পরিণত করেছেন। উপন্যাসের চতুর্থ পর্বের একস্থানে আছে :

'আমি কিন্তু অনেক কালের চাকর, জাতে নাপ্‌তে—রত্নাকে অত সহজে ভোলানো যায় না বাবু। তাই ত সেদিন ইষ্টিশানে চোখের জল সামলাতে পারি নি, প্রার্থনা জানিয়েছিলাম বিদেশে চাকরের অভাব হলে রতনকে একটা খবর পাঠাবেন। জানি আপনার সেবা করলেও সেই মায়ের সেবাই করা হবে। ধর্মে পতিত হবো না।'

* * * * *

অবস্থা মন্দ নয় রাগ করে চলে গেলেও পারি, কিন্তু যাই নে কেন? পারি নে। ......ঘরে যা কিছু ছিল খুড়োরা ঠকিয়ে নিলে, একঘর যজমান পর্য্যন্ত দিলে না। ছোট তুটি ছেলেমেয়ে আর তাদের মাকে ফেলে পেটের দায়ে একদিন গাঁ ছেড়ে বা'র হলাম, কিন্তু পূর্বজন্মের তপিস্তে ছিল, আমার এই মায়ের ঘরেই চাকরী জুটে গেল। ......বছর খানেক পরে একদিন নিবেদন জানালাম, মা, ছেলেমেয়ে তুটোকে দেখতে একবার সাধ হয়, যদি দিনকয়েকের ছুটি দেন। হেসে বললেন, আবার আসবি ত? যাবার দিনে হাতে একটি পুঁটলি গুঁজে দিয়ে বললেন, রতন, খুড়োদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করিস্ নে বাবা, যা তোর গেছে এই দিয়ে ফিরিয়ে নিগে যা। খুলে দেখি পাঁচশো টাকা।' (পৃঃ ৫১০-১১)

উপরের উদ্ধৃতির মধ্যে দিয়ে শরৎচন্দ্রের তো বটেই, তাঁর স্নেহময়ী স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীর কথাও আমাদের মনে আসছে। শরৎচন্দ্রের ভৃত্য ভোলাও মাঝে মাঝে দেশের বাড়িতে ছেলে-মেয়েদের দেখতে যেত। হিরণ্ময়ী দেবীও ঐ ধরণের কথা বলতে পারেন। রাজলক্ষ্মীর চরিত্রে যে হিরণ্ময়ী দেবীর সাংসারিক জীবনের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে পড়েছে তা আমরা পরে দেখাবার চেষ্টা করব।

শ্রীকান্ত, সতীশ ও দেবদাস তিনজনেই চরম ভবঘুরে আর তাদের সেবকত্রয় একাধারে ভবঘুরে-বৃত্তির কার্য ও কারণ। এদের মত এমন সেবক তাদের মিলেছে বলেই ভবঘুরে-বৃত্তি অবাধে চলতে পেরেছে। এই রতন চরিত্রটি উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্র-শ্রেণীভুক্ত হয়েও অত্যন্ত প্রধান হয়ে উঠেছে। রতন যেন রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের আত্মীয়ের অধিক, তাদের পরিবারের একজন। শ্রীকান্ত ভবঘুরে উপরন্তু রাজলক্ষ্মীর প্রিয়জন, তাই রতনের প্রভু-প্রীতি যেন শ্রীকান্তের উপর প্রবল। ভবঘুরের দল এক হিসাবে শিশু। শিশু-সন্তানের প্রতি যে আকর্ষণ, শ্রীকান্তের প্রতি সেই আকর্ষণ রতনের। রতন তাই শ্রীকান্তের কাছে একাধারে ভৃত্য, সখা, জননী ও পরিচালক। শ্রীকান্তের কাছে তাই রাজলক্ষ্মী অপেক্ষাও রতন বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। রতন যেন শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর মাঝখানে বসে আছে।

কৃষ্ণপ্রেমী কমললতা কৃষ্ণপ্রিয়া

'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ? · ···
····· সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত ? হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে ?······
—রবীন্দ্রনাথ।

শরৎচন্দ্র ভগবদ্বিশ্বাসী ও বৈষ্ণবভাবাপন্ন মানুষ বলে শেষ জীবনে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ভক্তের মত দিন যাপন করতেন, তাছাড়া প্রায় সারা জীবনই বৈষ্ণব ধর্ম

ও বৈষ্ণব পদাবলীর অনুরাগী ছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ প্রদত্ত 'রাধাকৃষ্ণ' বিগ্রহের পূজা করা, নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবের মত গলায় তুলসীর মালা ধারণ করা, ভাই বেদানন্দ স্বামীর মৃত্যু দিবসে প্রতি বৎসর হরি-সংকীর্তন করা এবং বহু বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ পাঠ করাও তাঁর বৈষ্ণব প্রীতির পরিচয় বহন করে।

চতুর্থ পর্বের মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী। সেই কারণে মুরারিপুরের আখড়ার পটভূমি কাহিনীর একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে। বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি এই শ্রদ্ধা ও অনুরাগের ফলে শরৎচন্দ্রের বহু গ্রন্থের নায়ক বৈষ্ণবভাবাপন্ন, যেমন, বৃন্দাবন, নীলাম্বর, সৌদামিনীর স্বামী প্রভৃতি। বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি এমন প্রগাঢ় অনুরাগ না থাকলে এমন শ্রদ্ধার সঙ্গে কমললতাকেও সৃষ্টি করতে তিনি সক্ষম হতেন না।

কমললতা হল শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বের একটি প্রধান চরিত্র। এই নারী চরিত্রটিই এই পর্বে বাকী তিন পর্বের সর্বপ্রধানা ও চির আকাঙ্খিতা চরিত্র রাজলক্ষ্মীকে বেশী মাত্রায় ম্লান করে দিয়েছে। হয়তো জগতের মাঝে কমললতা বিচিত্র ব্যক্তি নয়—তার রূপলাবণ্য রাজলক্ষ্মীর কাছে ম্লান। তবু কমললতার চরিত্র আঁকতে গিয়ে লেখক যেন নিজের অজ্ঞাতসারে একটা বিশেষ মতাদর্শকে ব্যক্ত করে ফেলেছেন। কমললতার চালচলন ও কথাবার্তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বৈষ্ণব ধর্মবাদ।, সে যেন এক শক্তিশালী শিল্পীর নিপুণ তুলিতে আঁকা।

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকেই বাংলা উপন্যাসে বৈষ্ণব চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে আসছে। বঙ্কিমের 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ' এবং রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' ও 'বোষ্টুমী' গল্পে বৈষ্ণবী চরিত্রের সমাগম ঘটেছে। কিন্তু বৈষ্ণব আখড়ার প্রত্যক্ষ চিত্র পাওয়া গেল 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বে। শরৎচন্দ্রের কৈশোর অভিজ্ঞাতার স্মৃতিচিত্র এই মুরারিপুরের আখড়ায় বর্ণিত। বাঙলা দেশের বৈষ্ণব আখড়া সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের আবাল্য পরিচয় এবং বৈষ্ণব ধর্মাচার ও বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের ফলই এই মুরারিপুরের আখড়া চিত্রাঙ্কন। তবে, কৈশোরের অভিজ্ঞতা পরিণত বয়সে অঙ্কিত হয়েছে বলে বাস্তব অপেক্ষা সেখানে কল্পনা প্রশ্রয় পেয়েছে বেশী।

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বটি লেখার কয়েক বৎসর পূর্বেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈষ্ণব সমাজের প্রণয়স্বাধীন জীবনাবলম্বনে বৈষ্ণবজীবনকেন্দ্রিক গল্প 'রসকলি' ও 'রাইকমল' রচনা প্রকাশ পায়। 'রাইকমল' ১৩৩৬-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, 'রসকলি' তারও পূর্বে রচিত।

শরৎচন্দ্রের কমললতা-কাহিনী প্রকাশ পেয়েছে ‘বিচিত্রা’য়, ১৩৩৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে। কমললতা সৃষ্টির পূর্বে শরৎচন্দ্র খুব সম্ভবত তারাশঙ্করের উক্ত লেখা দুটি পড়ে থাকবেন এবং তাঁর বৈষ্ণব-প্রীতি প্রকাশের ইচ্ছা জেগে থাকবে। মনে হয়, শরৎচন্দ্র সেই সময়ে কৃষ্ণপুরের রঘুনাথ গোস্বামীর আখড়ার কথা বিশেষ করে মনে স্থান দিয়েছেন এবং কমললতার মত এমন একটি চরিত্র-সৃষ্টির কথা ভেবেছেন। কিন্তু তারাশঙ্করের উপন্যাসে ও গল্পে বৈষ্ণব সাধনা ও সহজিয়া বৈষ্ণবতন্ত্রের যে বাস্তব চিত্র পাওয়া গেছে শরৎচন্দ্রের স্মৃতিচারণ-মূলক উপন্যাসে তা দুর্লভ হয়ে দেখা দিয়েছে। মুরারিপুরের বৈষ্ণব আখড়ায় তাই পদাবলী কীর্তন ও সারাদিনব্যাপী ঠাকুরের গার্হস্থ্য সেবা সাধনা ছাড়া বৈষ্ণব সাধনতন্ত্রের বা সাম্প্রদায়িক জীবনাচরণের সুস্পষ্ট তথ্যচিত্র আমরা পাইনি। তারাশঙ্করের গল্পে ও উপন্যাসে বৈষ্ণব জীবন ও বৈষ্ণব সমাজের চিত্র অনেক স্পষ্ট ও বৈষ্ণব চরিত্রের সংখ্যাও অধিক। ‘শ্রীকান্ত’ চতুর্থ পর্বের তুলনায় ‘রাইকমলে’র বৈষ্ণব সমাজ অনেক বাস্তব হয়েছে। মুরারিপুরের আখড়ার চিত্র কেবলমাত্র শরৎচন্দ্রের কৈশোর স্মৃতিচিত্র হিসাবেই উপর উপর বর্ণিত হয়েছে, বৈষ্ণব সমাজের ও সাধনতন্ত্রের নিখুঁত বাস্তব চিত্র স্থান পায়নি। লেখকের হয়ত সে অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই, যে কমললতা পূর্বে ঊষা ছিল তার একটি পঙ্কিল জীবন-চিত্র শরৎচন্দ্র তুলে ধরেছেন। তিনি কয়েকশত পতিতা নারীর ইতিহাস একসময়ে সংগ্রহ করেছিলেন এবং কমললতা চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে এমন একজনের কথাই হয়ত এসে থাকবে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের বৈষ্ণব ধর্মাচার এবং বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগই কমললতা সৃষ্টির মূলে। এই চরিত্র সৃষ্টিতে প্রধানতঃ কল্পনাই প্রশ্রয় পেয়েছে।

শ্রীকান্তের সঙ্গে কমললতার প্রথম সাক্ষাৎকারই এই কথার প্রমাণ দেবে। শরৎচন্দ্রের অন্য কোন উপন্যাসে এমন ইঙ্গিত-বহুল ‘সন্ধ্যা-ভাষা’র ব্যবহার আমরা দেখি না। উপন্যাসের ৫৩৭ পৃষ্ঠায় আছে, “ইহার মুখের দিকে চাহিয়া কিন্তু ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। সবিস্ময়ে মনে হইল এই চোখ-মুখের ভাবটা যেন পরিচিত এবং চলার ধরণটাও যেন পূর্বের কোথাও দেখিয়াছি।” —অর্থাৎ শ্রীকান্ত পূর্ব থেকেই যেন একে চেনে অথচ সত্যই এদের পূর্ব-পরিচয় ছিল না।

‘বৈষ্ণবী কথা কহিল।···সে কিছুমাত্র ভূমিকা করিল না, সোজা আমার প্রতি চাহিয়া কহিল, কি গোঁসাই, চিনতে পারো?

বলিলাম, না; কিন্তু কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে।

বৈষ্ণবী কহিল, দেখেচো বৃন্দাবনে।'…

বৃন্দাবনে মহাসৌভাগ্যবান প্রেমিক নর-নারীই বাস করতে পারে। সেখানে প্রেমের আলোকে কেউ কারও অপরিচিত নয়।

'…কিন্তু বৃন্দাবনে আমি ত কখনো জন্মেও যাইনি। বৈষ্ণবী কহিল, গ্যাছো বইকি। অনেক কালের কথা হঠাৎ স্মরণ হ'চ্ছে না। সেখানে গরু চরাতে, ফল পেড়ে আনতে, বনফুলের মালা গেঁথে আমাদের গলায় পরাতে—সব ভুলে গেলে?'

—বৈষ্ণবী শ্রীকান্তকে দেখেই বুঝেছে, সে তারই সতীর্থ। যেন সে জন্ম-জন্মান্তর-পরিচিত প্রিয়জনকে দেখেছে। আধুনিক পাঠক হয়তো এ ধরণের কথোপকথনে বিস্মিত হবেন। কিন্তু কমললতা যে ভাষায় কথা বলেছে তা 'সন্ধ্যা ভাষা' সাধন মার্গের ভাষা। মনে হয়েছে যেন কমললতা শ্রীকান্তকে ঠাট্টা করেছে। কিন্তু কমললতার হৃদয়-যমুনার গভীরে অবগাহন করলে বোঝা যাবে এ ব্যঙ্গ বা ঠাট্টা বা কৌতুক নয়—এ যেন সম্পূর্ণ সত্য। কমললতার চোখে শ্রীকান্ত—যেন বৃন্দাবনের সখা কৃষ্ণ।

শরৎচন্দ্র প্রেমিক, ভক্ত প্রেমিক। তিনি বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে গোবিন্দজীর মন্দিরে সাশ্রু-নেত্রে গড়াগড়ি দিতে দেখে তাঁর সঙ্গীদের অনেকেরই নয়ন সিক্ত হয়েছিল। কমললতা চরিত্রটি সৃষ্টি হয়েছে তাই সমাজ-সংসার বহির্ভূত চরিত্ররূপে। তার পিছনের সামাজিক ও পারিবারিক কাহিনীটি এই চরিত্রে তেমন প্রাধান্য পায়নি। তাই শ্রীকান্ত কমললতাকে যাঁর হাত থেকে পেয়েছে আবার তাঁর উদ্দেশ্যেই তাকে ছেড়েছে।

পূর্বেই বলেছি, 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্ব, অতীতের স্মৃতিরোমন্থনে, অতিক্রান্ত জীবনের স্নিগ্ধ-করুণ মাধুর্য রস আস্বাদনায় পরিপূর্ণ। শরৎচন্দ্রের বাল্যকালের অনেক ঘটনা ও চরিত্র স্মৃতিরসে সিক্ত হয়ে এই পর্বের মধ্যে ফুটে উঠেছে। কিন্তু বাস্তবে কমললতার মত কোন চরিত্রের সম্মুখীন তিনি হয়েছিলেন, এ কথা কোন শরৎ-জীবনীকারই বলেননি, তিনি নিজেও গল্পের ছলেও কোনদিন তা কাউকে বলেননি। বরং শরৎচন্দ্র উপন্যাসে কমললতার জীবন ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখলেন, 'ওর জীবনটা যেন প্রাচীন বৈষ্ণব কবিচিত্তের অশ্রুজলের গান। ওর ছন্দের মিল নেই, ব্যাকরণে ভুল আছে, ভাষার ত্রুটি অনেক, কিন্তু ওর বিচার ত সেদিক দিয়া নয়। ও যেন তাঁহাদেরই দেওয়া কীর্তনের সুর—মর্মে যাহার পশে সে-ই শুধু তাহার খবর পায়। ও যেন গোধূলি আকাশে নানা রঙের ছবি। ওর নাম নাই, সংজ্ঞা নাই—কলাশাস্ত্রের সূত্র মিলাইয়া

ওর পরিচয় দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।' (পৃঃ ৬০১-২)

এই উক্তিতেই প্রকাশ পাচ্ছে শরৎচন্দ্রের কি মনোভাব ছিল কমললতা চরিত্রটির সৃষ্টিকার্যে। রাজলক্ষ্মী পতিতা হলেও সমাজ সম্পর্কহীন নয়। কমললতার সাধনা পরম-সুন্দরের সাধনা। তাতে প্রেম ভিন্ন আর কোন ভাবের ভেজাল নেই। তা এককথায় মুক্ত প্রেম। এই মুক্ত প্রেমের জন্যই কমললতা শ্রীকান্তকে প্রথম দর্শনেই চিনেছিল কিন্তু প্রথম দর্শনেই শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে যেমন করে যত সহজে বুঝে নিয়েছিল, কমললতাকে তেমন পারেনি। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে চিনেছিল—নারী পুরুষকে যেমন চেনে তেমনই, কিন্তু কমললতা শ্রীকান্তের মধ্যে দিয়ে তার আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণের পায়েই নিজেকে নিবেদন করে দিতে চেয়েছে। শ্রীকান্তকে রাজলক্ষ্মী একজন সম্ভ্রমপ্রিয়, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, বন্ধন-ভীরু ও উদাসীন পুরুষ হিসাবেই চিনেছে এবং তার মঙ্গলামঙ্গলের জন্য চিন্তিত থেকেছে, কিন্তু কমললতার উৎকণ্ঠা অন্য রূপ, সে শ্রীকান্তের অমঙ্গল-ভয় করে না; তার প্রেম নির্লিপ্ত, নিশ্চিন্ত, মুক্ত/ কোন দ্বিধা বা আবিলতা কমললতাকে বিচলিত করে না। তার ভালবাসা কামন-বাসনাহীন, 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা'রই নামান্তব। এবং ঠিক সেই কারণেই শ্রীকান্তের সঙ্গে রাজলক্ষ্মীকে সে যখন দেখেছে তখন অতি সাধারণ প্রণয়িনীর মত কোন ঈর্ষা বা অভিমানের স্পর্শ অনুভব করেনি।

আসলে কমললতা পদাবলী সাহিত্যের সেই রাধা। সে রাজলক্ষ্মী নয়, তাই তার কাহিনীতে নাটকীয় উত্থান পতনের অবস্থান্তর বা চরিত্রের ক্রমবিকাশ নেই। এর কাহিনী একেবারে খাঁটি লিরিক, সেই বৈষ্ণব কবিদের গান। বৈষ্ণব রস ছেঁকে কমললতার মূর্তিটি নির্মিত। রাধার মত সেও তাই কলঙ্কিনী। সে তার সমস্ত কলঙ্কের ডালি শ্রীকৃষ্ণ চরণে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত। কৃষ্ণপ্রেমে নিজেকে সে নিঃশেষে উৎসর্গ করেছিল বলেই কোন মানুষী শাসন কিম্বা সাম্প্রদায়িক নিয়ম তাকে বেঁধে রাখতে পারেনি। একে একে সব ছেড়ে সে বৃন্দাবনের পথে অভিসারে চলেছে। কমললতার প্রেম তার ইষ্টদেবতারই আরাধনা; যেদিন সে তার প্রাণ বঁধূর সন্ধান পাবে কেবল সেইদিনই তার চিরদুঃখ দূর হবে।

শ্রীকান্তের সঙ্গে কমললতার সাক্ষাৎ ও শেষে বৃন্দাবনে যাত্রা এই ঘটনার মধ্যে আমরা পেয়েছি—কমললতা তার প্রখর আত্মসম্মান ও একটা স্বতন্ত্র মতবাদের উপর ভিত্তি করে সর্বস্ব ত্যাগ করে গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণের মোহন বাঁশীর আহ্বানে চলেছে; আর শ্রীকান্ত সেখানে থেকেছে ভাব-বিহ্বল।

সুতরাং কমললতার চরিত্র সৃষ্টির নেপথ্যে কোন বাস্তব চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না—এটাই এর সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বর্তমান। এতক্ষণ দেখানো হয়েছে যে, শ্রীকান্তের প্রতি কমললতার অকুণ্ঠ প্রেম এবং মুমূর্ষু গহরের প্রতি তার সেবা সমস্তই পদাবলী গীতির মত কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সমর্পিত। পরিশেষে তাই মুরারিপুরের বৈষ্ণব আখড়া ত্যাগ করে কৃষ্ণপদাশ্রয় লাভের জন্য বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে।

শরৎচন্দ্রের বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি যে কিরূপ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল, ভগবদ্বিশ্বাস যে কিরূপ সুদৃঢ় ছিল কমললতা পর্বের শেষ দৃশ্যটিই তার প্রমাণ দিয়েছে। কমললতা এখানে শূন্য হাতে চিরবিদায় নিচ্ছে শুধু ভগবানের উপর একান্ত ভরসা রেখে। শ্রীকান্তের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে শান্ত মনে নিঃস্ব অবস্থায় সে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়িয়েছে। পরম প্রিয়জনকে শুধুমাত্র ভগবানের ভরসায় অজানা পথে ছেড়ে দিয়ে, চতুর্থ পর্বের শেষে শ্রীকান্তরূপী শরৎচন্দ্র লিখেছেন, 'গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তাহার সেই হাতটা হাতের মধ্যে লইয়া কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া বলিলাম, তোমাকে তাঁকেই দিলাম কমললতা, তিনিই তোমার ভার নিন। তোমার পথ, তোমার সাধনা নিরাপদ হোক—আমার বলে আর তোমাকে অসম্মান করবো না।'

তার পূর্বে কমললতা শ্রীকান্তের হাত ধরে বলেছে, 'আমি জানি, আমি তোমার কত আদরের। আজ বিশ্বাস করে আমাকে তুমি তাঁর পাদপদ্মে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও—নির্ভয় হও।'—কারণ কমললতা জানতে পেরেছে সম্মুখে অনন্তলোক, সেখানে তাকে যেতে হবে। গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণের বাঁশীর স্বর যে তার কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করেছে। কৃষ্ণের মোহন বাঁশীর আহ্বানে শ্রীরাধা তন্ময়।

রাজলক্ষ্মী হৃদয়লক্ষ্মী

'চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনী, পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে পিরীতি মিলয়ে তথা॥'

এতটা আলোচনার পর পাঠক-পাঠিকাগণ নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে, শরৎচন্দ্রের জীবনটি ছিল যন্ত্রণাময়, ক্রন্দনময়। তিনি যে রুদ্ধ বেদনাকে সারা জীবন অন্তরে বহন করেছেন, সে বেদনা জীবনে কোন একজনকে না পাওয়ার বেদনা। তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী তার কিছুটা পূরণ করেছিলেন কিন্তু তাতে পুরানো ক্ষত সারেনি। প্রথম যৌবনের সূত্রপাতেই একটি ভালবাসার অঙ্কুর ফুটে উঠেছিল কিন্তু তা তৎকালীন সমাজ-জীবনের অবহেলায়-অবিচারে ধ্বংসের পথে গিয়েছিল। না-পাওয়ার যন্ত্রণায় শরৎচন্দ্র নিজেকে সংযত রাখতে পারেননি, আরও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছিলেন। তাই, 'দেবদাস', 'অনুপমার প্রেম', 'বড়দিদি', 'শুভদা', 'চরিত্রহীন', 'আঁধারে আলো', 'দেনাপাওনা' প্রভৃতি গল্প-উপন্যাসে এই উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিষাদ-করুণ চিত্র বার বার ফুটে উঠেছে। তাঁর চঞ্চল চিত্ত তাঁকে জীবনে বহু স্থানে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। আবার পিতার উদাসীনতা ও গৃহের দারিদ্রও তাঁর গৃহ-জীবনকে মোটেই সুখী করেনি। সমস্ত ছন্নছাড়া কাজের মধ্যে তাঁর অন্তর তাই পরিতৃপ্তি পেতে পারেনি। 'কোন্ বন্ধুহীন লক্ষ্যহীন প্রবাসে' পাড়ি দেওয়ার প্রধান কারণই হচ্ছে হৃদয়ের যন্ত্রণা ও ক্রন্দন।

শরৎচন্দ্র তাঁর পূর্বজীবন সম্পর্কে একেবারেই নির্বাক থাকতেন, এমন কি, তাঁর অন্তরঙ্গ আত্মীয়দের পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিগত কথা মোটেই বলতে চাইতেন না। কেউ এ ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করলে তিনি নানা রকমের কাল্পনিক গল্প নিজের নামেই প্রকাশ করতেন এবং ঐ ধরণের কৌতূহলকে তিনি ঘৃণাও করতেন; ফলে, যাঁরাই তার পূর্বজীবন জানতে চেয়েছেন তাঁদের প্রতি তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন। তিনি যে কতটুকু আত্ম-গোপন-প্রিয় ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর সাহিত্যিক জীবনেও পাওয়া গেছে। তিনি যখন প্রতিষ্ঠার স্বর্ণ-শিখরে তখনও পল্লীগ্রামে দরিদ্র নিম্নসম্প্রদায়ের মানুষদের সাথে মিলে মিশে থেকেছেন; এমন কি, তাঁকে সাহিত্যিক হিসাবে পরিচিত করেছেন প্রথমে তাঁর মাতুল গোষ্ঠী। প্রথম গল্প 'মন্দির' প্রকাশ পায় মামার নামে এবং

'বড়দিদি' প্রকাশে প্রথমে তাঁর নামই প্রকাশ পায়নি।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কোন দিক দিয়ে কাকেও প্রবেশাধিকার না দেওয়া সত্ত্বেও কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকা, ভক্তজন, নিকটাত্মীয় অথবা বন্ধু-ব্যক্তিরা তাঁর অন্তর্জীবনের অনেক গোপন তথ্য যখন সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেন তখন তাঁর সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের কৌশলটিও ধরা পড়ল। বিশেষ করে, শরৎচন্দ্র যখন উপন্যাসের আকারে, যতদূর সম্ভব আত্মগোপন করে, 'শ্রীকান্ত' নামে আত্মকাহিনী লিখলেন এবং গল্পের রোমান্স ভেদ করে তার মধ্যেও বাস্তব ব্যক্তির জীবন ও চরিত্রের সঙ্গে লেখক এবং লেখকের দেখা অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য ফুটিয়ে তুললেন, তখন বোঝা গেল শরৎচন্দ্রেব জীবনটি সত্যই নিঃসঙ্গ, যন্ত্রণাময় ও ক্রন্দনময় ছিল।

শরৎচন্দ্র যখন শ্রীকান্তের ছদ্মবেশে নিজেকে অনেকটা ধরা দিলেন তখন উপন্যাসের একমাত্র প্রেমময়ী নায়িকা রাজলক্ষ্মীর উৎসে বা নেপথ্যে কে, তা জানবার জন্য অনেকেই কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। এই বিপদে শরৎচন্দ্র নানা বকমের কৈফিয়ৎ দিয়ে, এমন কি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েও নিজের জীবনের সেই অতি-নিভৃত এবং অতি-পবিত্র প্রেম-সংবাদ প্রকাশে অনিচ্ছুক হয়েছিলেন। আমি শরৎচন্দ্রের ঐ দুর্বল চিত্তের নমুনা হিসাবে কেবলমাত্র দুজনকে লেখা চিঠির অংশ এখানে প্রকাশ করছি। জীবনের যে ব্যথা বড গভীর, না-পাওয়ার এবং পেয়ে হারানোর যে হাহাকার, তা তিনিই উপলব্ধি করবেন যাঁর হৃদয়ের গভীরতা আছে এবং চিত্তের দৃঢ়তা আছে।

রাজলক্ষ্মী চরিত্রটি সৃষ্টির মূলে যে দুটি বাস্তব চরিত্রের নাম আমি দিতে চাচ্ছি তা অবশ্য আমার পূর্ববর্তী একজন চিন্তাশীল কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে বলেননি, কিন্তু তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছেন, 'ঐ চরিত্র যদি বাস্তব না হয়, তবে সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্বই মিথ্যা; কোন কবি, এমন কি শেক্সপীয়ারও বোধ হয়, এতখানি কল্পনাশক্তির অধিকারী ছিলেন না যে, চোখে না দেখিয়া এইরূপ একটা চরিত্র সৃষ্টি করেন। (পৃঃ ১৩৫)

তবে, শরৎচন্দ্রকে যদি জিজ্ঞাসা করা যেত, রাজলক্ষ্মী কে? ঐ চরিত্র কি একটা বাস্তব চরিত্র?—তবে তিনি অত্যন্ত চটে যেতেন, যেখানে চটতে পারতেন না সেখানে প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাইতেন; আবার কখনও কদাচিৎ হৃষ্টমন প্রফুল্লচিত্ত অবস্থায় আত্মকথা প্রকাশ হয়ে পড়ত। ১৪ ৮. ১৯ তারিখে বাজেশিবপুর থেকে লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে একখানি পত্রে লিখেছিলেন, 'রাজলক্ষ্মীকে কোথায় পাবে? ও-সব বানানো মিছে গল্প। শ্রীকান্ত একটা

উপন্যাস বই ত নয়; ও-সব মিছে জনরবে কান দিতে নেই।' এঁকেই, ২৪. ৮. ১৯ তারিখের আর একটি পত্রে লিখেছিলেন, '... আমার একটু পরিচয় চাই নাকি? কিন্তু রাজলক্ষ্মী আবার কে? কেউ নেই। ......সব কল্পনা, সব কল্পনা, বেবাক মিথ্যে।' চিঠিতে জানা যাচ্ছে যে, সে সময়ে একটা জনরব উঠেছিল শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর নেপথ্য চরিত্র জানতে। কিন্তু উপায় কী শরৎচন্দ্রের? মিথ্যা কথা ছাড়া আর কোন্ ভদ্র উপায়ে ঐ রকমের কৌতূহলকে সম্মানিত বা নিরস্ত করা যায়? আরও মজা এই যে অন্যান্য চরিত্রগুলির কিছু বাস্তব-ভিত্তি আছে বটে, কিন্তু রাজলক্ষ্মী চরিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক —এই কথাই শরৎচন্দ্র বলতে চাইতেন। না বললে, নিজের জীবনের সেই অন্তরতম স্থানটিকে বাইরের কৌতূহলী চোখের সামনে যে উন্মুক্ত করতে হয়। তাই কালিদাস রায়কে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন যে, শ্রীকান্তের ঐ কাহিনী এক অর্থে, এবং কতক অংশে, তাঁর আত্ম-কাহিনীই বটে; কিন্তু আসল প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বলেছিলেন যে, রাজলক্ষ্মী, কমললতা ও গহর চরিত্র কাল্পনিক। তবে রাজলক্ষ্মী সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং গহর-কমললতা পুরা কল্পিত নয়—প্রত্যক্ষদৃষ্ট চরিত্রের উপর রঙ চড়ানো ও রসান দেওয়া। পাঠক-পাঠিকাগণ ভাবুন, ইন্দ্রনাথ-অন্নদাদিদি চরিত্রে একটু 'এম্ফাসিস্' দেওয়া আছে শুনলে, যে শরৎচন্দ্র কুপিত হতেন, সেই শরৎচন্দ্রই বলতে চাইতেন রাজলক্ষ্মী পুরা কাল্পনিক চরিত্র।

এবার শরৎচন্দ্রেরই কতকগুলি উক্তি উদ্ধৃত করি, যা দেখে পাঠক-পাঠিকা অনেকটা স্থির নিশ্চয় হবেন যে, শরৎচন্দ্রের হৃদয়ে কোন ক্ষতস্থান ছিল। ১১. ১১. ১৯ তারিখে রাধারাণী দেবীকে লেখা, 'এক একটা কথা মানুষে কোনকালেই সম্পূর্ণ ভুলে যেতে পারে না—অথচ ভোলা ছাড়া আর কি?' অপর একটিতে, 'তোমরা—এই মেয়েরা—তোমাদের আজও ঠিক চিনে উঠতে পারলুম না। ......আমরাই যে শুধু তোমাদের চিনে উঠতে পারলাম না তা নয়, তোমরা নিজেরাও বোধ হয় নিজেদের ঠিক চিনে উঠতে পারো না, অথবা নিজেকে চিনতে ভয় পাও। হয়তো এমন হতে পারে, চিনেও সহজে তাকে স্বীকার করে নিতে চাও না। এও কিন্তু আমার কাল্পনিক ধারণা নয়, সত্যিকারের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত ধারণা।' আরেকটিতে, 'আর কদিনই বা বাকি আছে বোন—একটু আগে থেকেই না হয় ভাবলে। কি এমন ক্ষতি? আরও তো কেউ কেউ এইটাই স্বীকার করে নিয়ে একেবারে নিরুদ্দেশের আড়ালে মিলিয়ে গেচেন।' লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে ৯. ৮. ২০ তারিখে

শিবপুর থেকে লিখেছিলেন, 'জগতে মানুষের এমন কথাও থাকিতে পারে যাহা কাহারও কাছে ব্যক্ত করা যায় না। গেলেও তাহাতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের মাত্রাই বাড়ে। অথচ, এই নীরবতার শাস্তি অতিশয় কঠিন। .. ...পৃথিবীতে কৌতূহল বস্তুটার মূল্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়া যত বড়ই হোক, তাহাকে দমন করার পুণ্যও সংসারে অল্প নয়। ......যে বেদনার প্রতিকার নাই, নালিশ করিতে গেলে যাহার নীচেকার পঙ্ক জেরায় জেরায় একেবারে উপর পর্যন্ত ঘুলাইয়া উঠিতে পারে, সে যদি থিতাইয়া থাকে ত, থাক না। কি সেখানে আছে নাই-বা জানা গেল। কি এমন ক্ষতি?'

শরৎচন্দ্র নিজেই যে এই গভীর এবং মর্মান্তিক কথা গূঢ় অক্ষরে লিখে গিয়েছেন তাতে নিজেকে অতি গোপনেই ধরা দিয়েছেন। সারা জীবনে নিজের অন্তর্বেদনার কথা এইভাবেই কখনও কখনও প্রকাশ পেয়েছে এবং এইটুকুতেই আমরা শরৎচন্দ্রকে অনেকটাই বুঝে ফেলেছি। সারা জীবন বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়ানো, বহু ব্যাপারেই—এমন কি নিজের খ্যাতির সব থেকে বড় দিক, সেই সাহিত্য-জীবনেও উদাসীন, নির্লিপ্তভাব ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন অতিবাহিত করার কারণই হচ্ছে প্রথম যৌবনের ভালবাসার বিফলতা। সুতরাং রাজলক্ষ্মী যে কত সত্য, কত বাস্তব তা আর অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কেন নেই, তা আর একটু তলিয়ে দেখারও প্রয়োজন আছে; তাই আমাদের সেই শরৎ-জীবনের প্রথম পর্বের দিকে একটু দৃষ্টি ফেরাতে হবে।

প্রথম যৌবনে শরৎচন্দ্র যে মেয়েটিকে ভালবেসেছিলেন, তিনি ছিলেন বাল-বিধবা। ভাগলপুরে অবস্থানকালে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং তিনি তাঁকে নিজে হাতে সাহিত্য-চর্চাও করিয়েছিলেন। এই বিধবা মহিলা অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী ও ধর্মপরায়ণা ছিলেন বলে অকাল-বৈধব্যের পর তিনি ধর্ম-কর্ম ও সাহিত্য-সাধনাকেই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের স্নেহধন্যা এই বিধবা মহিলাই বঙ্গ-সাহিত্যের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক নিরুপমা দেবী (১৮৮৩-১৯৫১ খ্রীঃ)। বিচার বিভাগের কৃতী কর্মচারী পিতা নফরচন্দ্র ভট্টের এই কন্যা ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ বৎসর বয়সে অকাল বৈধব্যের পরই সাহিত্যব্রতী হয়েছিলেন। ভাগলপুরে অবস্থানকালেই ভ্রাতা বিভূতিভূষণ ভট্ট মারফত নিরুপমার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সংযোগ ঘটে।

তখনকার সংস্কারাচ্ছন্ন ভাগলপুরের বাঙালী সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এই ভট্ট-পরিবার অনেকটা প্রগতিশীল ও উদারপন্থী ছিলেন।

পরিবারের এই উদার চিন্তাধারাই অপরিচিত দরিদ্র শরৎচন্দ্রকে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ এনে দিয়েছিল। শরৎচন্দ্রও এঁদের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন যে, এঁদের 'পূর্ণমাত্রায় অবরোধ প্রথা বিশিষ্ট গৃহান্তঃপুরের মধ্যে আত্মজনের মত প্রবিষ্ট' হয়েছিলেন। বিভূতিভূষণ ও নিরুপমার (পুঁটু ও বুড়ি) লেখা শরৎচন্দ্র পড়ে সংশোধন করে দিতেন, মাঝে মাঝে মন্তব্যও করতেন। অনুরূপভাবে শরৎচন্দ্রের লেখাও অন্দরমহলে প্রবেশ করত নিরুপমার হাতে এবং নিরুপমা অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর মতামত প্রকাশ করতেন। নিরুপমার তীক্ষ্ণ তিরস্কারে শরৎচন্দ্র আলস্যের অবকাশ পেতেন না। দুজনের মনের মিল এর থেকেই প্রকাশ পেত, লেখাকে উপলক্ষ্য করেই ভাবের আদান প্রদানের মধ্য দিয়েই দুটি হৃদয়ের সঙ্গে অজান্তে পরিচয় ঘটত। এইভাবেই একজন দরিদ্র উচ্ছৃঙ্খল বাউণ্ডুলে স্বভাবের যুবক, রুচিবতী সংস্কৃতিসম্পন্না বিধবার হৃদয়ের সান্নিধ্য পেয়ে দু'দণ্ড শান্তি পেতে চেয়েছিল ; অপরদিকে গোঁড়া সমাজের মধ্যে বসবাস করেও একটি অপ্রস্ফুটিত সুন্দর ফুল তার পাপড়ি মেলে ধরার সুযোগ পেয়েছিল, তার অন্তরের সকল রূপ-সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটিয়ে। যেন গভীর নিশীথে একটি পবিত্র জ্যোতির্ময় প্রেমের আলো তাঁদের উভয়ের মন ছুঁয়ে গিয়েছিল। তাঁদের হৃদয়ের এই নীরব-নিভৃত আলাপনের মধ্য দিয়ে হয়েছিল হৃদয়-বিনিময়।

দূর যমুনীয়ার তীরে খঞ্জরী বেগ মার্কওয়ারার ছাদের উপর থেকে জ্যোৎস্না রাতে করুণ সুরেলা কণ্ঠস্বর অথবা বংশীধ্বনি ত্রিলোকধারী লালের কাছারি বাড়িতে ভেসে এসে বারবার চঞ্চল করে তুলত একটি যুবতী মনকে। মসজিদের কাছ থেকে সমস্ত হৃদয় উজাড় করা সুরের সঙ্গীত নিরুপমাকে বিনিদ্র করে রাখত, কাঁদাত, যমুনিয়ার ঢেউয়ের তালে তালে হৃদয়কে দোলাত। কিন্তু এ ভালবাসা শরৎচন্দ্রের জীবনে ভালো বাসা নির্মানে সাহায্য করেনি, করেছে ঘর ছাড়া, দেশছাড়া। নিরুপমা হয়ত নিঃশব্দে মনপ্রাণ দিয়ে শরৎচন্দ্রকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন, ভক্তি প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তৎকালীন সমাজের কঠিন চাপে একজনের কাছে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ করতে সাহসী হননি। নিরুপমা বিধবা। নিষ্ঠুর সমাজের কঠোর শাসনকে তিনি ভয় পান, তাই সংস্কারের শৃঙ্খলে নিজেকে বন্দী করে মনকে ভরিয়ে তুলেছিলেন ঈশ্বরের চিন্তায়, সাহিত্য চর্চায়। যেন আর বাইরে থেকে কোন বসন্ত রাতে দখিনা বায়ে কোন বাঁশির সুরে তাঁকে আর সাড়া দিতে না হয়, তাই কঠিন মনে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন শরৎচন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাবকে। প্রিয়জনের কাছ

থেকে সরে আসতে হয়েছিল শুধু সামাজিক অনুশাসনের কারণে নয়, সংস্কার সেই নারীর কাছে এত বড় ছিল যে এ ভালবাসা গ্রহণ করা তাঁর কাছে ধর্মত্যাগের মতই সর্বনেশে ব্যাপার ছিল।

যে গানের সুর একদিন একটি অবুঝ মনকে সবুজ করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিল তা তারপর হয়ে গিয়েছিল স্তব্ধ। শরৎচন্দ্র স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। আর এ দেশে নয়, সুদূর বর্মায় পাড়ি দিয়েছিলেন, যেখানে সমাজের এমন নির্মম পেষণ নেই। ভালবেসে না-পাওয়ার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। তাঁর অভিমানী মন আরও উচ্ছৃঙ্খলতায় ভরে গিয়েছিল। রেঙ্গুনে গিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে তিনি ভেসে বেড়াতে লাগলেন। পড়াশুনায় মন নিবদ্ধ করলেন বটে, কিন্তু লেখা বন্ধ। ভদ্র-শিক্ষিত সমাজে আর নয়। বেশ্যা-পল্লীতে, নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র মিস্ত্রী পল্লীতে বসবাস শুরু করলেন। বিজ্ঞান দৃষ্টি নিয়ে পতিতাদের ইতিহাস সংগ্রহে মেতে উঠলেন, বিধবার দুঃখ, পতিতার বেদনা ও নারীর যন্ত্রণার ইতিহাস সংগ্রহে মেতে উঠলেন, কিন্তু প্রায় পাঁচ শতাধিক নারীর ইতিহাস একদিন আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেল। আর ঐ প্রেমের আগুনে পোড়া খাঁটি মানুষটি অন্য কোনও নারীকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারলেন না। তাঁর সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে নিরুপমা এসে বার বার দাঁড়িয়েছেন তাঁর সামনে। তাই যাকে ভালবাসতে পারেন নি তাকে যৌবনের উন্মাদনায়, লালসায় মত্ত হয়ে, ভোগ করতেও প্রবৃত্ত হননি।

মনে পড়ে, কৌতূহল বশে শরৎচন্দ্রকে একদিন হরিদাস শাস্ত্রী মহাশয় নানা কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, উত্তরে শরৎচন্দ্র নাকি তাঁকে বলেছিলেন, 'নারী জাতি সম্বন্ধে আমার চরিত্র কোনকালেই উচ্ছৃঙ্খল ছিল না, এখনও নয়। নেশার চূড়ান্ত করেছি, অনেক অস্থানে কুস্থানে গিয়েছি, কিন্তু তুমি সে সব জায়গায় খবর নিয়ে জানতে পার, তারা সকলেই আমায় শ্রদ্ধা করতো। কেউ দাদাঠাকুর, কেউ বাবাঠাকুর বলতো। কারণ অত্যন্ত মাতাল অবস্থায়ও তাদের দেহের উপর আমার কখনো লালসা হয়নি। তার কারণ এই যে, ওটা চিরদিনই আমার রুচিতে ঠেকেছে। যাকে ভালবাসতে পারিনে তাকে উপভোগ করবার লালসা আমার দেহে জেগে ওঠেনি কখনও। আরও কিছু—বলিয়া দাদা চুপ করিলেন। প্রশ্ন করিলাম—আর কিছু, কি ?

—বিশ্বকবির গানটা তোমার মনে আছে কি ?

কখনো কুপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও সুখ স্মরি সরমেতে হই হারা।

আপন করে কাছে টেনে নিয়েছে।

'শ্রীকান্ত' যদি শরৎচন্দ্রের ছদ্ম আত্মজীবন, অর্থাৎ শ্রীকান্ত যদি অনেকাংশেই শরৎচন্দ্র তবে শ্রীকান্তের প্রেয়সী শরৎচন্দ্রেরও প্রেয়সী। অতএব, নিরুপমার ছায়াতেই যদি রাজলক্ষ্মীর সৃষ্টি তবে শরৎচন্দ্র প্রথমেই রাজলক্ষ্মীকে পিয়ারী বাইজী হিসাবে উপন্যাসে প্রবেশ করালেন কেন? এর উত্তরে প্রথমেই বলা যেতে পারে যে, নিরুপমার ছায়াতেই যে রাজলক্ষ্মীর চরিত্রটি গঠিত, এ কথা শরৎচন্দ্র প্রমাণ করার জন্য লেখনী ধারণ করেননি; দ্বিতীয়ত', পতিতা চরিত্রগুলির পরিস্ফুটন ঘটানো শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলা থেকেই একটা প্রবণতা ছিল। প্রথম জীবনের উপন্যাস 'শুভদা' থেকেই বারাঙ্গনাদের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন; 'দেবদাসে'ও পতিতা চরিত্র আছে। কিন্তু নিছক বারাঙ্গনা পল্লীর চিত্র অথবা বারাঙ্গনাদের জীবন নিয়ে উপন্যাস বা গল্প তিনি একটিও রচনা করেননি। পুশকিন, মোপাসাঁ বা এমিল জোলার মত পতিতা চরিত্র তিনি আঁকেননি। শরৎচন্দ্র সাময়িকভাবে পাঁকে নেমে পঙ্কজ তুলে আনতে চেয়েছেন। সমাজচ্যুতা বা কুলত্যাগী যারা, যারা সমাজে ফিরে আসতে চায়, যাদের সমাজ গ্রহণ করেননি, তাদের জন্যই শরৎ-সাহিত্যে খোলা অঙ্গনের আয়োজন, গোড়া থেকেই।

শরৎচন্দ্রের পতিতা নারীরা ভালবেসে, প্রেমের অমৃতেই পুনর্জন্ম লাভ করেছে। প্রেম যে সর্বদোষহর এই সত্য স্বীকারের সাধনা শরৎচন্দ্রের কতখানি ছিল তা জানা যায় এই রাজলক্ষ্মীর জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করলে। কলকাতায়, গঙ্গামাটিতে, পাটনায়, কাশীতে, এমন কি কমললতার বৈষ্ণব আখড়াতে কেউই তাকে ভুলেও একবার বারাঙ্গনা বা বাইজী বলে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বা ঘৃণা দেখায়নি, নেপথ্যেও অপবাদ দেয়নি। রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের প্রেম দেখে একবারও কেউ কখনও প্রশ্ন তোলেনি এ প্রেম বৈধ না অবৈধ। এমন কি সুনন্দার মত প্রখর নীতিবাদী আচারশীলা মেয়েও এ প্রশ্নের ধারে কাছে যায়নি।

এর কারণ, রাজলক্ষ্মীর কথাবার্তা, রুচি ও ভাবভঙ্গিতে এবং গভীর প্রেমের গতি-প্রকৃতিতে তার সঙ্গে বড় ঘরের নায়িকা হবার মত মেয়ের খুব তফাৎ নেই। তার কোথাও বাস্তব বাইজী জীবনের কালো দিকটি প্রকাশ পাইনি। ধনী বিলাসীদের বাগানে-শিবিরে থেকে তাদের মুঠোর মধ্যে দেখা যায়নি এবং এই বৃত্তির আনুষঙ্গিক অপরিহার্যতা হিসাবে তাকে দেহ-বিক্রয় করতেও দেখা যায়নি। অথচ রাজলক্ষ্মী সুন্দরী যুবতী।

কুমার সাহেবের শিকার দলের সে যেন এক আনুষঙ্গিক মাত্র। কিন্তু

পিয়ারী বাইজীর বাইজী-জীবনটা যেন একটা কথার কথা। শরৎচন্দ্র যে তাঁর পরিচিত কাউকে এই চরিত্রে রূপ দিতে সচেষ্ট এবং তাকে বাইজী হিসাবে দেখিয়ে বিধবা করে রেখে নায়কের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ ঘটানোর চেষ্টা করবেন এবং তার জন্যই পিয়ারীকে সাধারণ স্তরের বাইজীতে পরিণত করবেন না, তা যেন ধরা পড়ে যাচ্ছে। তিনি ইচ্ছা করেই রাজলক্ষ্মীকে একখণ্ড মূল্যবান কার্পেটের উপর গরদের শাড়ি পরিয়ে বসিয়ে দিয়েছেন এবং হাতের কাছে পানের সাজ-সরঞ্জাম ও সুমুখে গুড়গুড়িতে তামাক সাজিয়ে দিয়েছেন। শ্রীকান্ত তার সম্মুখে এসে উপস্থিত হলে রাজলক্ষ্মীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, 'তোমার সুমুখে তামাকটা খাবো না আর—ওরে রতন গুড়গুড়িটা নিয়ে যা।' রতনের গুড়গুড়িটা নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে যেন পিয়ারী বাইজীর বাইজী-জীবনটাও বিদায় নিল। উপন্যাসের এই অংশটুকু দুর্বল। উপন্যাসের নায়িকাকে পতিতা এবং বাইজী হিসাবে দেখানো শরৎচন্দ্রের কৌশল মাত্র।

সুতরাং আমরা এটুকু জানি যে, অধিকাংশ নারী চরিত্রের সৃষ্টির পিছনে তাদের কলুষিত জীবনের কিঞ্চিৎ ইতিহাস দেখানো শরৎচন্দ্রের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। 'দেবদাস' উপন্যাসের চন্দ্রমুখী ও 'আঁধারে আলো' গল্পের বিজলী—উভয়েই বারাঙ্গনা। চন্দ্রমুখী ও বিজলী উভয়ের মধ্যকার বারাঙ্গনা অবশেষে মরেছে। তাদের বুকের মধ্যে শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে প্রেম। প্রেমের বৈদূর্যমণির আলোকে উভয়েরই চিত্ততল উদ্ভাসিত ; কিন্তু তবুও এদের সঙ্গে রাজলক্ষ্মীকে পাশাপাশি মোটেই বসানো উচিত হবে না। কারণ রাজলক্ষ্মীকে অনেকটা ছকে বাঁধা চরিত্রের মতই পতিতা হিসাবে উপন্যাসে আনা হয়েছে। কল্পনার আশ্রয় নিতে গিয়ে এখানেই শরৎচন্দ্র রাজলক্ষ্মীকে অসম্ভব ও দুর্বল করে ফেলেছেন। রাজলক্ষ্মীর প্রথম জীবনের ঘটনাকে সীমিত কল্পনার মধ্যে ফেলে তাকে কলুষিত করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন। তাকে কেবলমাত্র বিধবা হিসাবে দেখালেও কোন ক্ষতি ছিল না।

শরৎচন্দ্র রাজলক্ষ্মীকে তার ধর্মভাব ও শুচিবায়গ্রস্ত হিসাবেই চিত্রিত করতে বাধ্য হয়েছেন। একজন ক্ষমতাসম্পন্ন লেখকের কাছে এ সেই দুর্বলতা—হৃদয়ের দুর্বলতা বার বার প্রশ্রয় পেয়েছে বুদ্ধির কাছে। Puritanism-এর আড়ালেই চিরকাল নিজেকে লুকিয়ে রাখলেন। 'শেষপ্রশ্নে'র কমলের মত মেয়েও তাই কঠিন নিয়ম-সংযম ও উপবাস করেছে ; সেক্ষেত্রে রাজলক্ষ্মী তো কমলেরও পূর্বের সৃষ্টি। রাজলক্ষ্মীকে শ্রীকান্তের বিছানায়ও গভীর রাত্রে যেতে দেখা গেছে, কিন্তু গভীর সংযমী হয়ে। প্রেমিকের প্রতি গভীর ভালবাসা

থাকা সত্ত্বেও তার ভালবাসা দেহজ বা কামজ প্রেমে রূপান্তরিত হয়নি। এইখানেই কী নিরুপমার মৌল নির্দেশ কাজ করেনি? এইখানেই কী নিরুপমা লেখকের সম্মুখে এসে উপস্থিত হননি?

অথচ, প্রথাবিরুদ্ধ বৈপ্লবিক কাজ শরৎচন্দ্র বহু করেছেন; কিন্তু লিখেছেন কম। এবং তা লিখতেন না তার একমাত্র কারণ ঐ বনিতার সংস্কারকে আঘাত করবে তাই। তাই বলছি, প্রথম প্রেমের ফুলই রাজলক্ষ্মী সৃষ্টির মূলে এবং এর সঙ্গে মিলে মিশে আছে হিরণ্ময়ী দেবী ও অন্যান্য নারী চরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতার প্রলেপ। অথচ শরৎচন্দ্রকে যাঁরা progressive ভাবেন না, সাহসের অভাব শক্তির দৈন্য ছিল বলে সমালোচনা করেন, তাঁরা ভুল করেন। শরৎ-জীবনের এই দুর্বল দিকটি যাঁরা জানেন না, সাহিত্য সমালোচনায় তাঁরা তাঁকে ভুল বুঝবেনই।

রাজলক্ষ্মী চরিত্রটির আলোচনায় মোহিতলাল লিখেছেন, 'এই যে চরিত্র, ইহার একটা রক্ত-মাংসময় বাস্তব সত্তা আছে। শ্রীকান্ত এই নারীকে দেখিয়াছে ও দেখাইয়াছে, তাহাতে কল্পনা অপেক্ষা বাস্তবের অংশই অধিক, ইহার প্রমাণ—এইরূপ নারী চরিত্র কোন পুরুষের নিছক কল্পনায় এতখানি বাস্তব হইয়া উঠিতে পারে না, নারী প্রকৃতির যে বিশিষ্ট লক্ষণগুলি উহাতে আছে তাহা কোন পুরুষের বুদ্ধিগম্য নহে, তাই শ্রীকান্তের বুদ্ধিও বার বার পরাস্ত হইয়াছে।'—একথা যদি সম্পূর্ণভাবে মেনে নেওয়া যায়, তবে স্বভাবতই প্রশ্ন দেখা দেবে শরৎচন্দ্র কী নিরুপমাকে তেমন করে জানতে পেরেছিলেন, আপন করে কাছে পেয়েছিলেন, যে অতটা বাস্তবাকারে গার্হস্থ্য চিত্রগুলি ফুটিয়ে তুলবেন? উত্তরে স্পষ্টই বলা যেতে পারে,—না; অত কাছ থেকে শরৎচন্দ্র নিরুপমা-সান্নিধ্য লাভ করেননি। তবে 'নারী প্রকৃতির বিশিষ্ট লক্ষণগুলি' শরৎচন্দ্র কাকে দেখে লিখলেন? লিখেছেন হিরণ্ময়ী দেবীকে দেখে।

'শ্রীকান্ত' লেখার অনেক পূর্বেই শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে (মোক্ষদা) বিবাহ (মতান্তর আছে) করেছিলেন। হিরণ্ময়ী দেবী শান্তস্বভাবা, সেবা-পরায়ণা ও ধর্মশীলা মহিলা ছিলেন। লেখাপড়া জানতেন না বটে কিন্তু তাঁর মত ধর্মশীলা ও পতিপরায়ণা স্ত্রী শরৎচন্দ্রের ছিল বলেই তিনি ছন্নছাড়া, উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেও একেবারে সর্বনাশের পথে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাননি। একথা একান্তই সত্য যে, হিরন্ময়ী দেবী সেবা দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, ভক্তি দিয়ে শরৎচন্দ্রের উদাসীন পলাতক জীবনকে আজীবন ঘিরে রেখেছিলেন বলেই তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্য সাধনায় নিজেকে নিরত রাখতে পেরেছিলেন।

এই চিরনেপথ্যবাসিনী পতিপ্রাণা অশিক্ষিতা মহিলাটি তার চিররুগ্ন, অপটু স্বামীর সেবা যত্নের প্রতি অত্যন্ত দৃষ্টি রাখতেন। যদি এই সদাজাগ্রত সেবা-পরায়ণ দৃষ্টি তাঁর উপর সর্বদা নিবদ্ধ না থাকত তবে শরৎচন্দ্রের অত্যাচারক্লিষ্ট, রোগজীর্ণ দেহটি বেশিদিন টিঁকতই না। শরৎচন্দ্রও অসুস্থকালে যখন নিজেকে একান্তই শয্যাশায়ী করে তুলতেন তখন হিরন্ময়ী দেবীর সেবাপরিচর্যার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে পরম সুখলাভ করতেন। শরৎচন্দ্রের গুরুতর অন্তিম পীড়ার সময় হিরন্ময়ী অত্যন্ত অস্থির ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন। পূজা অর্চনা, আচার-ব্রত প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তিনি স্বামীর একান্ত মঙ্গল বিধানের ফলটিই আকাঙ্খা করতেন। নিরক্ষর বাঙালী নারীর স্বাভাবিক অজ্ঞতা ও কুসংস্কার হিরন্ময়ী দেবীর মনকেও আচ্ছন্ন করেছিল, কিন্তু স্বামীর প্রতি একাগ্র প্রেম ও নিষ্ঠার ফলে এমন দৃঢ়তা তাঁর মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল যে তাঁর বিপ্লবী স্বামীকেও বহু সময়ে তাঁর প্রবল সংস্কারের কাছে মাথা নত করতে হত। সমগ্র শরৎ-সাহিত্যেও এমন চিত্র খুঁজে পাওয়া যাবে এবং বিশেষ করে রাজলক্ষ্মী চরিত্রে তো যাবেই। বাঙালী নারীর আত্মনিবেদনের একনিষ্ঠতা রাজলক্ষ্মী চরিত্রকে তাই সার্থক করে তুলেছে। রাজলক্ষ্মীও সেবাপরায়ণা, বিশেষ করে খাওয়ানোর ব্যাপারে তার যত্নের তুলনা নেই। বাঙালী গৃহজীবনের কেন্দ্রে রাজলক্ষ্মীর যে স্নেহমধুর ব্যক্তিত্বটি বিরাজমান, তা শরৎচন্দ্রের মত নারীর মর্যাদা কে আর এমন করে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

নমুনা হিসাবে আমি এখানে পর পর কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃতি দেব; তাতেই প্রমাণ পাবে শরৎচন্দ্র এমন বাঙালী নারীর সংসার-জীবনের লৌকিক চিত্র কোথা থেকে পেয়েছিলেন। প্রথমে প্রিয়জনকে আহার করানোর কতকগুলি খণ্ড চিত্র তুলে ধরি। হিরণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রকে যেমন যত্নসহকারে পরিপাটি করে আহার করাতেন তার সঙ্গে এর কতটুকু মিল তা লক্ষ্য করুন।

"ওকি, খাচ্চো না যে? সব দুধই পড়ে রইলো যে!

আর পারি নে।

তবে কিছু ফল নিয়ে আসি?

না, তাও না।

কিন্তু বড় রোগা হয়ে গেছ যে!

যদি হয়ে থাকি সে অনেক দিনের অবহেলায়। একদিনে সংশোধন করতে চাইলেই মারা যাবো।

* * * * *

আনি গে ছুটো ফল? বঁটি নিয়ে কাছে বসে নিজের হাতে বানিয়ে, অনেকদিন তোমায় খেতে দিইনি—যাই? কেমন?

যাও।

রাজলক্ষ্মী তেমনই দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।' (পৃঃ ৬২৩-২৪)

এর ঠিক বিপরীত চিত্র; অর্থাৎ শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে তার সামনে বসিয়ে খাওয়াতে চায়—

'কিন্তু সারাদিন ধরে আজ তুমি কি শুধু স্বপ্ন দেখেই কাটাবে? এইবার কিছু খাও।

খাই।

রতনকে বলে দিই ঠাকুর এইখানে তোমার খাবার দিয়ে যাক।

এইখানে? বেশ যাহোক। তোমার সামনে বসে আমি খাবো কেন? কখনো দেখেচো খেতে?

দেখিনি, কিন্তু দেখলে দোষ কি?

তা কি হয়! মেয়েদের রাক্ষুসে খাওয়া তোমাদের আমরা দেখতেই বা দেবো কেন?

ও ফন্দি আজ খাটবে না, লক্ষ্মী। তোমাকে অকারণ উপোস করতে আমি কিছুতেই দেবো না। না খেলে তোমার সঙ্গে আমি কথা কবো না।

নাই বা কইলে।

আমিও খাবো না।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল, বলিল, এইবার জিতেছো। এ আমার সইবে না। (পৃঃ ৬২৫)

এইবার রাজলক্ষ্মী প্রেম-নিবেদনে আত্মসম্মান ফিরে পেয়ে কিরূপ আশ্বস্ত ও আত্মস্থ হয়েছে এবং দেবতার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে নারীর যে পূর্ণ প্রেয়সী মূর্তিটি প্রকাশ পেয়েছে, তার মাত্র দুটি নমুনা তুলে ধরছি—হিরণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী নয় বলে যখন শরৎচন্দ্রকে গ্রামের মোড়লেরা একঘরে করেছিল তখন হিরন্ময়ী দেবীর মনের অবস্থাই বা কেমন হয়েছিল, একটি উদ্ধৃতিতে তারও আভাস মিলবে—

'খবর পেলাম তুমি এখুনি নাকি কালীঘাটে যাবে?

রাজলক্ষ্মী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—এখুনি? সে কি করে হবে? তোমাকে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তবে ত ছুটি পাবো।

......তোমার খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে, শুধু কাল, দুটিখানি

খেয়েছিলে, আবার আজ থেকে সুরু হয়েছে উপবাস। ......আজ তুমি কালীঘাটে যেতে পাবে না।

রাজলক্ষ্মী হাতজোড় করিয়া বলিল, তোমার পায়ে পড়ি, শুধু আজকের দিনটি আমাকে ভিক্ষে দাও, ...বলিলাম, না হয় কাল যেয়ো। নিজেই বললে সারারাত জেগে বসে আমার সেবা করেচো—আজ তুমি বড় শ্রান্ত।

না, আমার কোন শ্রান্তি নেই। শুধু আজ বলে নয়, কত অসুখেই দেখেচি রাতের পর রাত জেগেও তোমার সেবায় আমার কষ্ট হয় না।...

তবে চলো, দুজনে একসঙ্গে যাই।

রাজলক্ষ্মীর দুই চক্ষু উল্লাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিল, তাই চলো।...

প্রশ্ন করিলাম, বলো ত লক্ষ্মী, কি আমার জন্যে তুমি চাইবে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, চাইবো আয়ু, চাইবো স্বাস্থ্য, আর চাইবো আমার ওপর এখন থেকে যেন তুমি কঠিন হতে পারো।' (পৃঃ ৬২০)

* * * *

'আমার সমস্ত মনটি এখন আনন্দে ডুবে আছে, সব সময়েই মনে হয়, এ জীবনে সমস্ত পেয়েছি, আর আমার কিছু চাই নে। এ যদি ভগবানের নির্দেশ না হয় ত আর কি হবে বলো ত? প্রতিদিন পূজো করে ঠাকুরের চরণে নিজের জন্যে আর কিছু কামনা করিনে, কেবল প্রার্থনা করি এমনি আনন্দ যেন সংসারে সবাই পায়।' (পৃঃ ৬৭২)

এই কথাটুকুতে যেন হিরণ্ময়ী দেবীর মনের কথাই প্রকাশ পেয়েছে; শরৎচন্দ্রের প্রতি তাঁর প্রেম-ভক্তিপূর্ণ আত্মনিবেদনের অকুণ্ঠ প্রকাশ। কথাগুলি নিজের স্ত্রী ছাড়াও নিরুপমা দেবীকেও স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৯১২ খ্রীঃ শরৎচন্দ্র তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে রেঙ্গুন থেকে এক পত্রে লিখেছিলেন 'ইনি (হিরণ্ময়ী) ত দিনরাত জপতপ-পুজো-আচ্চা নিয়েই থাকেন।' ঠিক অনুরূপ চিঠি নিরুপমা সম্পর্কে লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা—'বুড়ির ওপর আমার ভারি আশা ছিল, কিন্তু সে ঐ একটি 'দিদি' ছাড়া আর কিছুই লিখতে পারলো না। কেন জানো? বার-ব্রত, জপ-তপ ইত্যাদি জ্যাঠামির আগুনে ভিতরে যা কিছু মধু ছিল, সব বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেল। অবশ্য আতিশয্যের জন্যই, না হলে আমাদের ঘরের কোন্ মেয়ে আর এ-সব ব্যাপারে কিছু কিছু না করে?'

হিরণ্ময়ী দেবীও জপতপের বাড়াবাড়ি করতেন কিন্তু শরৎচন্দ্রের সেবা-শুশ্রূষাতে তাঁর কোনরূপ অবহেলা ছিল না। রাজলক্ষ্মীর মুখে যেন তাই

হিরণ্ময়ী দেবীর মুখের ভাষাই প্রকাশ পেয়েছে। রাজলক্ষ্মীরও ধর্মচেতনা যখনই মানবিক দাবী অস্বীকার করতে চলেছে, শ্রীকান্ত তখনই মনে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করেছে। তাই শরৎচন্দ্রেরও ব্যথাহত ভাষা, 'মনে মনে রাজলক্ষ্মীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলাম, তোমার পুণ্যজীবন উন্নত হইতে উন্নততর হোক, তোমার মধ্য দিয়া ধর্মের মহিমা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হোক, আমি আর ক্ষোভ করিব না।'

ভগবানকে পাওয়া সর্বোত্তম পাওয়া। কিন্তু তার জন্য কেউই স্বামীকে হারাতে চায় না। তাই রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তর কানে কানে বলে, 'বেশ ত, সেই আশীর্ব্বাদই করনা তুমি। তোমার বড় আর ত আমার কিছুই নেই, তোমাকেও যাঁর বদলে অনায়াসে দিতে পারি আমাকে সেই আশীর্বাদই কর তুমি।'

এরপর আরও কটি অন্তরঙ্গ-প্রসঙ্গের উদ্ধৃতি দিয়ে হিরণ্ময়ী প্রসঙ্গ শেষ করব।

'অনেক রাত্রে হঠাৎ একসময়ে তন্দ্রা ভাঙিয়া চোখ মেলিলাম। দেখিলাম, রাজলক্ষ্মী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া, টেবিলের উপর হইতে আলোটা সরাইয়া ওদিকে দরজার কোণে সম্পূর্ণ আড়াল করিয়া রাখিয়া দিল। সুমুখের জানালাটা খোলা ছিল—তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া আমার শয্যার কাছে আসিয়া একমুহূর্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিয়া লইল। তারপরে মশারির ভিতরে হাত দিয়া প্রথমে আমার কপালের উত্তাপ অনুভব করিতে লাগিল। ……তাহার পরে সে বোতাম বন্ধ করিল; গায়ের কাপড়টা সরিয়া গিয়াছিল, গলা পর্য্যন্ত টানিয়া দিল; শেষে মশারির ধারগুলা ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া অত্যন্ত সাবধানে কপাট বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল।' (পৃঃ ১৫৭)

'রাজলক্ষ্মী আমার কানের উপর মুখ রাখিয়া চুপি-চুপি কি একটা কথা বলিল, ভালো বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম, আর একটু চেঁচিয়ে বলো শুনি।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না।

তারপরে অসাড়ের মতো তেমনি ভাবেই পড়িয়া রহিল। শুধু তাহার উষ্ণ ঘন নিঃশ্বাস আমার গলার উপরে, আমার গালের উপরে আসিয়া পড়িতে লাগিল।'……

* * * *

'ওগো, ওঠো? কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধোও—রতন চা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে।

আমার সাড়া না পাইয়া রাজলক্ষ্মী পুনরায় ডাকিল, বেলা হলো—কত ঘুমোবে?

পাশ ফিরিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিলাম, ঘুমোতে দিলে কই? এই ত সবে শুয়েছি।

কানে গেল টেবিলের উপর চায়ের বাটিটা রতন ঠক্ করিয়া রাখিয়া দিয়া বোধ হয় লজ্জায় পলায়ন করিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, ছি ছি, কি বেহায়া তুমি! মানুষকে মিথ্যে কি অপ্রতিভ করতেই পারো! নিজে সারারাত কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোলে, বরঞ্চ আমিই জেগে বসে পাখার বাতাস করলুম পাছে গরমে তোমার ঘুম ভেঙে যায়। আবার আমাকেই এই কথা। ওঠো বলছি, নইলে গায়ে জল ঢেলে দেবো।' (পৃঃ ৬১৫)

আর অধিক উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই। পাঠক-পাঠিকাগণ এখানে একবার কল্পনা করে নিন শ্রীকান্তকে শরৎচন্দ্র, রাজলক্ষ্মীকে হিরণ্ময়ী এবং রতনকে ভোলা চাকর হিসাবে। এইবার বোধ করি মোহিতলালের সেই উক্তিটিই সত্য বলে মনে হবে যে, 'ঐ চরিত্র যদি বাস্তব না হয়, তবে সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্বই মিথ্যা।'

এবার রাজলক্ষ্মী চরিত্রে নিরুপমা দেবীর ছায়া আর কতটুকু পড়েছে দেখিয়ে আলোচনা সীমিত পরিসরে আনতে চেষ্টা করে এই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি ঘটাবো। প্রথমেই দেখবো শ্রীকান্তের সঙ্গে রাজলক্ষ্মীব প্রথম কথোপকথন কেমনভাবে হয় এবং তার সঙ্গে শরৎ-জীবনের সত্য ঘটনা কতটুকু মেলে।

রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে প্রশ্ন করছে, 'বাবা ভাল আছেন?

বাবা মারা গেছেন।

মারা গেছেন! মা?

তিনি আগেই গেছেন।

ওঃ—তাইতেই, বলিয়া বাইজী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া রহিল। একবার মনে হইল, তাহার চোখ দুটি যেন ছলছল করিয়া উঠিল। কিন্তু সে হয়ত আমার মনের ভুল। ····· কহিল, তা হলে যত্ন-টত্ন করবার আর কেউ নেই বলো। পিসীমার ওখানেই আছ ত? তাহলে আর থাকবেই বা কোথায়? বিয়ে হয়নি, সে ত দেখতেই পাচ্ছি। পড়াশুনা করছ কি না, তাও ঐ-সঙ্গে শেষ করে দিয়েচ?' (পৃঃ ৮৮)

পাঠক শরৎচন্দ্রের প্রথম যৌবনকালটা একবার ভেবে দেখুন। মামার বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করেন। প্রথমে মায়ের মৃত্যু ঘটে, পরে পিতা মারা যান। পড়াশুনা ছেড়ে তিনি সত্যই বাউণ্ডুলে হয়ে পড়েছিলেন। রাজলক্ষ্মীর

সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে এই বাস্তব চিত্রটিই শরৎচন্দ্র তুলে ধরেছেন। খঞ্জরপুরে যেখানে মতিলাল শেষজীবন অতিবাহিত করেন তার অনতিদূরেই ত্রিলোকধারী লালের কাছারি বাড়িতে তখন পিতার সঙ্গে নিরুপমাদেবী বসবাস করতেন। শরৎচন্দ্র পিতার মৃত্যুর পূর্ব থেকেই ছন্নছাড়া জীবন যাপন করছেন এবং ঐ বয়সেই শরৎচন্দ্র বনেলি এস্টেটে চাকরি করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ও করেছেন। সুতরাং এহেন পরিবেশেও শরৎচন্দ্র নিরুপমাকেই স্মরণ করে রাজলক্ষ্মীকে দিয়ে উপরিউক্ত প্রশ্নগুলি করিয়েছেন। এবং নিরুপমা-সঙ্গ পরিপূর্ণভাবে ত্যাগ করার চিত্র 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের শেষ অনুচ্ছেদটিতেও ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্রীকান্ত প্রথম রাজলক্ষ্মীর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে—'দেখিলাম বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না—ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে। ছোট-খাটো প্রেমের সাধ্যও ছিল না—এই সুখৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্নেহ-স্বর্গ হইতে মঙ্গলের জন্য কল্যাণের জন্য আমাকে আজ একপদও নড়াইতে পারিত। বাহকেরা পাল্কি লইয়া ষ্টেশন-অভিমুখে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। মনে মনে বারম্বার বলিতে লাগিলাম, লক্ষ্মী, দুঃখ করিয়ো না ভাই, এ ভালই হইল যে, আমি চলিলাম। তোমার ঋণ ইহ-জীবনে শোধ করিবার শক্তি আমার নাই। কিন্তু যে-জীবন তুমি দান করিলে, সে-জীবনের অপব্যবহার করিয়া আর না তোমার অপমান করি—দূরে থাকিলেও এ সঙ্কল্প আমি চিরদিন অক্ষুণ্ন রাখিব।'

পরবর্তী জীবনেও দূরে থেকে সত্যই শরৎচন্দ্র তাঁর মনের লক্ষ্মীকে ভোলেন নি। সেজন্য শরৎচন্দ্র রাজলক্ষ্মী চরিত্র এমনভাবে এঁকেছেন যে, সে অন্তরের ব্যাপারে প্রেমময়ী নারী কিন্তু সমাজ ব্যাপারে ধর্মানুসারিণী। শ্রীকান্ত ছাড়া আর কাউকে সে মনে প্রাণে ভাবতেও পারে না, আবার নীতিধর্ম বিসর্জন দিয়ে দাম্পত্য জীবনের সুখ-সম্ভোগে নিজেকে ভাসিয়ে দিতেও পারে না। সমাজের নীতি ও বিধিগুলি তাকে বিদ্রোহিনী করে না যে, তা নয়, কিন্তু অভয়ার মত বাহ্যতঃ সে তা প্রকাশ করাটাকে সঙ্গত মনে করে না। সে কারণে অভয়ার প্রতি তার বিনয় ও শ্রদ্ধাভাব আছে। সমাজ-বাধার বেদনাটিকে চিরপ্রেমের ভূমিকায় শিল্পায়িত করার নৈপুণ্যই শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-কীর্তি।

প্রথম যৌবনের প্রেম মানবচিত্তকে উদ্বেলিত মথিত করে তাকে পরিণত করে দেয়—অথচ এই মানসিক প্রেম সর্বদাই বিয়োগান্ত। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন অনুভব করেছেন, 'বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে।' যে সুখ কালপ্রবাহে ভেসে যায় কেবল মধুর স্মৃতিটুকু থাকে মাত্র. এবং এটাও মনে হয় যে, বাল্য-প্রণয়ের মত মধুর আর কিছু নেই—তেমনি শরৎচন্দ্রও অনুভব করেছেন। তাই

শরৎচন্দ্রও দেবদাসের মাঝে বলেছেন, 'বাল্যপ্রেমে অভিশাপ আছে।' ভাগলপুরের এমনি একটা প্রেম-জীবনেই যেন অভিশাপ ছিল। শরৎচন্দ্রের উন্মুখ হৃদয় বার বার সতীত্ববোধের প্রাচীরে আঘাত পেয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু ভুবনমোহিনীর প্রভাবপুষ্ট তাঁর মন হিন্দু নারী সতীত্ব বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছিল। প্রথম জীবনের এই প্রেম ছিল খণ্ডিত, দ্বিধা ও বাধায় বেদনাময়। তাঁর এই উন্মুখ ব্যর্থ প্রেম ও সতীত্ব সম্বন্ধে একটা সশ্রদ্ধ সংস্কারই তাঁর সৃষ্ট বালবিধবা চরিত্রগুলিকে সহানুভূতি ও করুণায় আর্দ্র করে, ত্যাগগত সেবাধর্মে দীক্ষিত করে মহৎ ও সুন্দর রূপে উপস্থাপিত করেছে। শুধু তাই নয়, এই বালবিধবা চরিত্রগুলি যেন তাঁর হৃদয়রক্তে সঞ্জীবিত। শরৎচন্দ্রের জীবনে এই প্রেমানুভূতি ও ব্যর্থতাই সম্বল হয়ে থেকেছে বলে, ব্যক্তিজীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বই সত্য হয়ে রইল বলে, রাজলক্ষ্মী এই ছাঁচেই গঠিত হয়েছে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের আবির্ভাব লগ্ন থেকেই রাজলক্ষ্মী শ্রীময়ী ও মহিমময়ী। সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সে রূপে গুণে সর্বেশ্বরী, মমতায় ভালবাসায় সর্বমঙ্গলা, রুচিতে বুদ্ধিতে অনন্যা। তাই তার 'পিয়ারী' নামটা আমাদের মনে থাকে না। আমরা সেই রাজলক্ষ্মীকেই স্মরণে রাখি, যে রাজলক্ষ্মী একাধারে রাজ্ঞী ও লক্ষ্মী। সে যখন পিয়ারী বাইজী থেকে হয়ে উঠেছে রাজলক্ষ্মী তখন তার অনিন্দ্যসুন্দর রূপ আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। এই অনিন্দ্যনীয় নারী হয়ে উঠেছে অনিন্দিতা।

রাজলক্ষ্মীর সত্তা স্বভাব ত্রিধারা-সমন্বিত। তার পিয়ারী, রাজলক্ষ্মী ও লক্ষ্মী এই তিনটি নামে সেই দিকগুলি নির্দেশিত হয়েছে। পিয়ারী—প্রিয়া, রসিকা, সঙ্গীতনিপুণা, সুন্দরী ও রহস্যময়ী; যৌবনের সমস্ত আবেগ নিয়ে সে পরিপূর্ণা। সে ধনবতী। কিন্তু তার রাজলক্ষ্মী সত্তা বাঙালী তথা ভারতীয় রমণীর প্রকৃত পরিচয় বহন করতে চায়। সে দরদী, কল্যাণী, সুধীরা অথচ প্রগাঢ় প্রাণের অধিষ্ঠান তার আত্মায়। সেখানে বাঙালী নারীর সর্বপ্রকার সংস্কারও বিদ্যমান। বারব্রত, নিশিপালন, পূজা, পবিত্রতা, দানধ্যান প্রভৃতি তার জীবনের নিত্যকর্মের তালিকা রচনা করেছে। উপরন্তু সে লক্ষ্মী। শ্রীকান্ত মাঝে মাঝে গভীর ভালবাসার কণ্ঠে তাকে 'লক্ষ্মী' নামে সম্বোধন করেছে। লক্ষ্মী চায় সতী সাধ্বীর মত ঘর, স্বামী, সন্তান। সে তখন নায়িকা নয়, জননী। আনন্দময়ী পিয়ারী নয়, ঐশ্বর্যময়ী রাজলক্ষ্মী নয়, সে তখন কপোতীর মত ভীরু, গোধূলির মত বিষণ্ণ, নদীর মত অনুগত।

রাজলক্ষ্মীর এই ত্রিধারা-সমন্বিত সত্তা স্বভাবের মধ্যেই আমরা নিরুপমা-

হিরণ্ময়ী দেবীর সত্তা স্বভাবের অনেকটা সাযুজ্য লক্ষ্য করি। শরৎচন্দ্রের কাছে নিরুপমা দেবী রহস্যময়ীও বটে আবার প্রিয়াও বটে। বারব্রত- নিশিপালন, সংস্কার, পূজা, পবিত্রতা আবার উভয়কেই স্মরনে আনে। দানধ্যানে হিরন্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের উপযুক্ত সহধর্মিনী। আর লক্ষী হচ্ছে শরৎচন্দ্রেরই হৃদয়লক্ষ্মী। রাজলক্ষ্মী শরৎচন্দ্রের তাই প্রেম মানস। তার চরিত্রের একমাত্র দিকই হচ্ছে প্রেম। সে সর্বকালের, সর্বদেশের।

রাজলক্ষ্মী শান্ত থেকেও চঞ্চলা। কারণ সে বুঝেছে শ্রীকান্তকে কারও হাতে স'পে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে না। পেয়েও সে নিতে পারেনি, ছেড়ে দিয়েও সে পরিপূর্ণভাবে ছাড়তে পারেনি। এ-ও এক প্রকারের ট্রাজেডি।

নিত্য-না-পাওয়ার দুঃখ 'শ্রীকান্ত'র রস-বৈশিষ্ট। শরৎচন্দ্র তাই এই অপ্রাপনীয়াকে নিয়েই গান রচনা করতে পেরেছেন, শিল্প সৃষ্টি করতে পেরেছেন। যাঁকে ভালবেসেছেন, তাঁকে ফুরোতে দেননি। উপন্যাসে এটির স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে; তাই চার পর্বেও এর শেষ হয় না। 'শ্রীকান্ত' তাই অপ্রাপ্তি, সমাপ্তি নয়। চিরন্তন জীবনগতির দুঃখ-রসই এর শিল্প সান্তনা। শ্রীকান্তের আত্ম-কথাকে রাজলক্ষ্মীই একটা গল্পের গাঁথুনি দিয়েছে। সুতরাং রাজলক্ষ্মীর জীবনের পরিণাম, কিম্বা সেই পরিণামের একটা স্পষ্ট আভাস এতে থাকবার কথা; কিন্তু তা নেই। নেই বলেই তা অসমাপ্ত মনে হয়। উপন্যাসের পর্ব-গুলি এমনভাবে পর পর প্রকাশিত হয়েছে যে, প্রত্যেক পর্বের পর আরও আছে, এটাই মনে করা স্বাভাবিক। চতুর্থ পর্বেও সমাপ্তির কোন চিহ্ন নেই। যেন ঘাটে এসে তরী ভেড়েনি। রাজলক্ষ্মীর পরিণামটি তখনও অপূর্ণ, হয়তো মৃত্যুই এই কাহিনীর সীমা। মৃত্যুর অমৃত-রশ্মির আলোতেই শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে দেখতে পারত; অতি আদরের প্রিয়জনকে ঐ ভাবেই কেবল দেখা যায়।

'সর্বপ্রকার হাস্য-পরিহাসের অন্তরালে কি একটা অজানা কঠিন দণ্ডের আশঙ্কা তাহার (রাজলক্ষ্মীর) মন হইতে কিছুতে ঘুচিতেছে না। সেইটা শান্ত করার অভিপ্রায়ে বলিলাম, আগে তুমি না মরলে আমি মরচি নে, এ নিশ্চয়—

কথাটা সে শেষ করিতে দিল না, খপ্ করিয়া আমার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, আমাকে ছুঁয়ে এঁদের সামনে তুমি তিন সত্যি করো। বলো, একথা কখনো মিথ্যে হবে না। বলিতে বলিতে উদগত অশ্রুতে তাহার দুই চক্ষু উপচাইয়া উঠিল।'

'রাজলক্ষীর এই প্রাণময় প্রার্থনা পূর্ণ হবারই কথা। আর একস্থানে রাজলক্ষী শ্রীকান্তের কাছে একটি ভিক্ষা চাচ্ছে—'এবার যেদিন সত্যি সত্যিই মরব, সেদিন কিন্তু দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলো। বোলো পৃথিবীতে অনেক বর-বধূ অনেক মালা বদল করেছে, তাদের প্রেমে জগৎ পবিত্র, পরিপূর্ণ হয়ে আছে; কিন্তু তোমার কুলটা রাজলক্ষী তার ন' বছর বয়সের সেই কিশোর বরটিকে একমনে যত ভালবেসেছে, এ সংসারে তত ভালো কেউ কোনদিন বাসেনি।' আমার কানে কানে তখন বলবে বলো এই কথাগুলি? আমি মরেও শুনতে পাবো।'

তাই বলছি, এ কাহিনীতে রাজলক্ষীর কথাটা শেষ হয়নি। রাজলক্ষীর জীবনের ঐ শেষ ঘটনার ইঙ্গিত এই শেষ পর্বেই যেন পাওয়া যাচ্ছে।

বাস্তবে অবশ্য তা ঘটেনি। নিরুপমা দেবীর মৃত্যুর প্রায় ১২ বৎসর পূর্বেই শরৎচন্দ্রের মৃত্যু ঘটে। শরৎচন্দ্রের মাত্র ৬২ বৎসর বয়সে কলিকাতায় মৃত্যু ঘটে এবং ৬৭ বৎসব বয়সে নিরুপমা দেবীর মৃত্যু ঘটে বৃন্দাবনে। যে বৈষ্ণব ধর্ম শরৎচন্দ্র অত্যন্ত পছন্দ করতেন, শেষ জীবনে নিরুপমা সেই বৈষ্ণব মতেই বিশ্বাসী হয়েছিলেন। তবে, উপন্যাসের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের কতকগুলি মিল খুঁজে পাই। যেমন, নিরুপমা দেবী যেমন শরৎচন্দ্রকে শরৎ-দা বা শরৎদাদা বলতেন তেমনি শরৎচন্দ্র রাজলক্ষীকে দিয়ে শ্রীকান্তদা বলিয়েছেন (রাজলক্ষীর পত্রে আছে, 'শ্রীকান্ত-দা তোমার চিঠি পড়িয়া আজ আমার গুরুদেবের সেই অন্তরের আগুনের কথাই মনে পড়িতেছে।') এছাড়া বয়সের দিক দিয়েও উভয়ের মিল লক্ষণীয়। নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রের চেয়ে ৫ বৎসরের ছোট ছিলেন; চতুর্থ পর্বে ৫১৪ পৃষ্ঠায় শ্রীকান্তকে লেখা রাজলক্ষীর চিঠিতে আছে, 'আমার চেয়ে তুমি চার-পাঁচ বছরের বড়।' উপরন্তু পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি দেখিয়েছি যে, লেখকের অন্তরও অনেকাংশে তাঁর প্রধান চরিত্রের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে বা পক্ষান্তরে বলা যেতে পারে তাঁরই অন্তরানুভূতি ও অভিজ্ঞতা নায়কের জীবনের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে এবং তাঁরই অতৃপ্তিকর চিত্ত নায়ককে সৃষ্টি করেছে।

আমি গ্রন্থের প্রথম দিকেই বলতে চেয়েছি যে, শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রের স্বপ্নদৃষ্ট আত্ম-প্রতিমূর্তি। এখন দেখাব শ্রীকান্তের ইচ্ছা এবং স্বপ্ন যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তা শরৎচন্দ্রের ঐ স্বপ্নদৃষ্ট আত্ম-প্রতিমূর্তি কি না।

শ্রীকান্তের সাধ, সে মুরারিপুরের আখড়াতেই তার শেষ জীবনটি অতিবাহিত করবে। সে রাজলক্ষীকে তার এই স্বপ্নের কথা বলেছে যে, সেই

আখড়ায় তার মৃত্যু হলে বকুলতলায় যে স্থানটিতে তার সমাধি হবে, তার নিকটে কমললতা ঘুরে বেড়াবে; সে সেই সমাধির উপর প্রতিদিন ফুল সাজিয়ে দেবে আর যদি রাজলক্ষ্মী কোনদিন সেখানে যায় তবে কমললতা বলবে—'ঐখানে থাকে আমাদের নতুন গোঁসাই। ঐ যে একটু উঁচু—ঐ যেখানটায় শুকনো মল্লিকা কুঁদ-করবীর সঙ্গে মিশে ঝরা-বকুল সব ছেয়ে আছে—ঐখানে।

রাজলক্ষ্মীর চোখ জলে ভরিয়া আসিল, জিজ্ঞাসা করিল, আর সেই পরিচিত লোকটি কি করবে তখন?

বলিলাম, সে আমি জানি নে। হয়ত অনেক টাকা খরচ করে মন্দির বানিয়ে দিয়ে যাবে—

রাজলক্ষ্মী কহিল, না, হলো না। সে বকুলতলা ছেড়ে আর যাবে না। গাছের ডালে ডালে করবে পাখীরা কলরব, গাইবে গান, করবে লড়াই—কত ঝরিয়ে ফেলবে শুকনো পাতা, শুকনো ডাল, সে-সব মুক্ত করার কাজ থাকবে তার। সকালে নিকিয়ে মুছিয়ে দেবে ফুলের মালা গেঁথে, রাত্রে সবাই ঘুমোলে শোনাবে তাঁকে বৈষ্ণব-কবিদের গান, তারপর সময় হলে ডেকে বলবে, কমললতাদিদি, আমাদের এক করে দিয়ো সমাধি, যেন ফাঁক না থাকে, যেন আলাদা বলে চেনা না যায়। আর এই নাও টাকা, দিও মন্দির গড়িয়ে, করো রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, কিন্তু লিখো না কোন নাম, রেখো না কোন চিহ্ন— কেউ না জানে কে-ই বা এরা, কোথা থেকেই বা এলো।' (পৃঃ ৬৬৯-৭০)

এ কি স্বপ্ন নয়! যদি স্বপ্ন, তবে এ কার স্বপ্ন এবং কাকে কেন্দ্র করেই বা এ স্বপ্ন! এ কেবল শরৎচন্দ্রেরই স্বপ্ন। আপন ইচ্ছাকে তিনি আরোপ করেছেন প্রণয়ের পাত্রে। বাংলা-গদ্যের এমন লিরিক-মূর্চ্ছনা কাব্য-সাহিত্যেও বিরল; আবার প্রেমের ও প্রাণের এমন মর্মস্পর্শী আত্মনিবেদন এই চতুর্থ পর্বের মত এই উপন্যাসে আর কোথাও উদ্বেল হয়ে ওঠেনি। রাজলক্ষ্মীর এই কথাগুলি হৃদয়ের রস মূর্চ্ছনায় প্রেমের নক্ষত্রলোক স্পর্শ করেছে। কোথায় যেন একটু খেদ, একটু অভিমান, একটু অনুশোচনা, এই উক্তির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। সেই 'বন্ধুহীন, লক্ষ্যহীন' জীবনের গান। সেই না-পাওয়ার বেদনা পাওয়ার কল্পনায় এইখানেই যেন ভরপুর হয়ে গেছে। বিরহের নামে মহা-মিলনের রোমাঞ্চ জেগেছে। **Saddest thought, Sweetest song** হয়েছে। অন্তর্বেদনার এমন পরম অভিজ্ঞতা না থাকলে এ রকমের গভীর রসসৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। শরৎচন্দ্রের বিশেষত্বই হচ্ছে, জীবনের কঠোর বাস্তবতার সাথে সুষমা-স্নিগ্ধ কল্পনায় অপূর্ব সুসঙ্গতি ঘটানো।

১৯৩৮ সালে ৬২ বৎসর বয়সে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর মাত্র ৫ বৎসর পূর্বেও তিনি লিখতে পেরেছেন, 'দিও মন্দির গড়িয়ে, করো রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা, কিন্তু লিখো না কোন নাম, রেখ না কোন চিহ্ন—কেউ না জানে কে-ই বা এরা, কোথা থেকেই বা এলো?' আমৃত্যু তিনি প্রথম জীবনের প্রেমিকাকে স্মরণ করেছেন। যে মিলন পূর্ণ-মিলন হবে, যে সমাধি পূর্ণ-মিলনের সমাধি হবে, উভয়ের মধ্যে ফাঁক যেন না থাকে সে মিলন সমাধিতে।

শ্রীকান্তের ঘুমন্ত মুখ দেখে তাই রাজলক্ষ্মী বলে, 'এ যে এত সুন্দর এর আগে কেন চোখে পড়েনি? এতদিন কি কানা হয়ে ছিলুম।' তাই সে কামনা করে মরণের পরে আবার যেন এসে জন্মাতে পারে। যেন ব্যর্থ প্রেমের জন্য যে জীবন মিলিত হতে পারেনি পরজীবনে তাঁদের মিলন ঘটবে। শরৎচন্দ্রের ব্যর্থ প্রেমের অতৃপ্তি কেমন করে নারীর কথার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তা কেবলমাত্র 'শ্রীকান্ত' পড়লেই উপলব্ধি করা যায়। তাই রাজলক্ষ্মী শরৎচন্দ্রের প্রেমমানস, তাঁর শিল্প প্রকৃতির সরল ব্যাখ্যা।

শরৎচন্দ্রের অন্তর ব্যথিত হয়েছে, দুঃখ পেয়েছে, অন্তরাত্মা বেদনায় হাহাকার করেছে। পৃথিবী তাঁকে দেয়নি কাম্য, মানুষ তাঁকে দেয়নি প্রীতি, সমাজ দেয়নি স্বীকৃতি, প্রেম দেয়নি প্রতিদান—তাঁর অন্তর তাই বেদনায় ক্রন্দন করেছে। কিন্তু এই মানুষের জন্যই কী অসীম মমতা ও প্রীতি তিনি অন্তরে পোষণ করেছেন। ৫৩ তম জন্মদিনে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে (১৩৩৫) অভিনন্দনের উত্তরে তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'ক্রটি, বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তাঁর যে বস্তুটি আসল মানুষ, তাঁকে আত্মা বলাও যেতে পারে—সে তার সকল অভাব, সকল অপরাধের চেয়েও বড়। আমার সাহিত্য রচনায় তাকে অপমান যেন না করি। হেতু যত বড়ই হোক, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়, আমার লেখা কোনদিন যেন এত বড় প্রশ্রয় না পায়।'

মানবপ্রেম, হৃদয়ধর্মই শরৎ-সাহিত্যের মূলীভূত শক্তি। এই শক্তিই পাঠকচিত্তকে উদ্বেলিত করে মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে।

এই প্রেমিককে বিশ্বকবি চিনেছিলেন। শরৎচন্দ্রের মহাপ্রয়াণ মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কানে যেতেই, এই দরদী প্রেমিকের বিয়োগ-বেদনা প্রকাশ পেল তাঁর শোকাকুল স্তবকে। সেদিন রবীন্দ্রনাথের শোক ভাষা পেয়েছিল একটি ক্ষুদ্র চতুষ্পদী কবিতার মধ্য দিয়ে—

'যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি।'

প্রিয় শিষ্যের প্রতি গুরুর এটি অন্তিম আশীর্বাদ এবং অন্তরের শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন।